বাঙলার বিপ্লব সাধনা

শ্রীপুলকেশ দে সরকার



দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স
এম. টি. ৭৩, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
২১শে ফেব্রুয়ারী—১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

শ্রীসঞ্জীব দত্তচৌধুরী কর্তৃক দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স এম. টি. ৭২এ, কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীগৌরাঙ্গ কুণ্ডু কর্তৃক ডায়নামিক প্রিণ্টার্স ১৮, মুরারী পুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০০৬৭ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার পরিকল্পিত মহাভারতের যে অশেষ উপকরণ আমি অবিশ্রান্ত সংগ্রহ করে চলেছি তা কবে শেষ হবে জানি নে। আয়ুর নির্দিষ্ট শেষ তারিখটির খবর আজও পাইনি কিন্তু সে যে খুব দূরবর্তী নয় পরিণত বয়সে অন্তত ততটুকু বুঝি। সুতরাং, সে মহাভারতের উপলখণ্ড কুড়োনোর কাজ শেষ করে যেতে পারব কিনা এবিষয়ে আমার গভীর সংশয় আছে। পারিও যদি, অতবড় গ্রন্থ কে ছাপবার ভার নেবেন? তাই, তারই একটা অতি-অতি সংক্ষেপিত ছোট্ট সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা হয়েছিল; আমার বইয়ের প্রকাশক সে ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। অনেক-অনেক জিনিস বাদ পড়ল, ক্ষমা চাই।

এই ছোট্ট বইখানি আমি তাঁদেরই স্মৃতিবেদীমূলে নিবেদন করলাম, স্বাধীনতালাভের পর যাঁদের নাম কেউ জানে না, কোন ছলে কোন কারণেই যাঁদের নাম কেউ উচ্চারণ করে না, যাঁদের আলেখ্য কোন গৃহের শোভা বর্ধন করে না, যাঁদের নামে কেউ গান বাঁধেনি, গান গায় না, যাঁদের স্মৃতিসৌধ নেই, যাঁদের স্মৃতিসভা হয় না, রাস্তা বা ভবন যাঁদের নামে উৎসর্গ করা হয় না, বনে-জঙ্গলে-কারাগারে, পুলিশ-নির্যাতনে-রোগে অনাদরে-অবহেলায় যাঁরা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, যাঁদের স্মৃতিভারে অশ্রুপাত করবার কেউ নেই—অথচ একদিন যাঁদের অস্থিতে বজ্র হয়েছিল, জমাট রক্তের তর্পণে দীর্ঘ সাধনার স্বাধীনতা-সূর্যোদয় হয়েছে।

আর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাঁদের হাতে তুলে দিলাম যাঁরা দিশেহারা হয়ে জন্মান্ধর মতো পরদেশে অর্ঘ্য নিবেদনের নায়ক হাতড়ে বেড়ান, পৌত্তলিকতার নিন্দা ক'রেও পরদেশী নেতার পটে কক্ষ সজ্জা করেন। জীবন-সায়াহ্নে বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি, একদা "বাঙলাদেশের হৃদয় হতে কি অপরূপ রূপে" বেরিয়ে এসেছিলেন মা, যে মূর্তি দেখে দেখে চোখ আর ফেরানো যায়নি। তারপর একদা এসেছে ঘন ঘোর অন্ধকার ছাপিয়ে; সে-বাঙলাকে দিয়েছে ঢেকে; বাঙলার বিপ্লবীরা হয়েছেন বিদেশী শাসকদের ভাষায় 'এনার্কিষ্ট', 'ক্রিমিন্যাল', তাদের সুরে সুর মিলিয়ে দেশী সাধু সন্তেরা আর আন্তর্জাতিক বিদেশী রাষ্ট্রচরেরা তাঁদের ঘৃণাভরে বলেছেন 'সন্ত্রাসবাদী', 'ডাকাত', অথবা 'গুণ্ডা'।

তাঁদের ইতিহাস লিখবে কে? সেই বহু পর্বের মহাভারত? অর্থই বা জোগাবে কে? তাই, বাঙলার বর্তমান প্রজন্মের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন, একবার মুক্ত মনে সেই সব বহু-নিন্দিত হৃদয়গুলোকে তাঁরা যেন তাঁদের হৃদয়ের আদালতে বিচার করে রায় দেন। বর্তমান প্রজন্ম যদি বাঙলার বিপ্লবীদের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকেন, স্বাধীনতালাভে ঐ দেশপ্রেমিকদের দান স্বীকারে কৃপণতা করেন, তার দায়িত্ব জ্যেষ্ঠদের। তাঁরা উত্তরপুরুষকে প্রকৃত ইতিহাস উপহার দেন নি, বাঙলার বিপ্লব-সাধকদের নিন্দায় নিন্দায় দৃষ্টির আড়ালে আবর্জনায় নিক্ষেপ করেছেন; মিথ্যা ইতিহাসের কথামালায় হয় বিভ্রান্ত করেছেন, না-হয় আদর্শ-পুত্তলী সন্ধানের জন্য বিশেষ বিশেষ দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। তার নীট ফল হয়েছে এই, দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ আজকের প্রজন্মে এক বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন, নেই, নেই, ওসবের চিহ্নমাত্র নেই।

বাঙলার এক দধীচি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদা হৃদয়াবেগে বলেছিলেন, হোক্ হিংসাশ্রয়ী, ওদের দেশপ্রেমকে অস্বীকার করব কি করে? তাঁরই উত্তরসাধক এবং স্বেচ্ছানির্বাসিত অপর এক বাঙালি বিপ্লবীর উত্তরাধিকারী দুর্গম পথ পরিক্রমা-শেষে ব্রহ্মদেশে প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন, 'রক্ত দাও, স্বাধীনতা দেব', দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্গ-তারুণ্যের অক্ষয় আদর্শ। যদি বর্তমান প্রজন্ম ভুলেও একবার তাঁদের দিকে এবং তাঁদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী বাঙলার বিপ্লবী সাধকদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন আমার শ্রম সার্থক হবে।

বইখানি যথাসাধ্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও প্রামাণিক করতে প্রয়াসের কার্পণ্য করিনি; তবু যদি কোন তথ্যগত ভুল কারও চোখে পড়ে, এবং আমার গোচরে আনেন আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকব। নামোল্লেখ বা নামোচ্চারণের অশুদ্ধতায় আমার অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করি। কোন ঘটনা বা মানুষের অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত নয়, গ্রন্থের সীমাবদ্ধতাই তার কারণ। আর, কার কাছ থেকে কি নিয়ে এই গ্রন্থ সাজিয়েছি তা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছি; তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।—ইতি

পুলকেশ দে সরকার

॥ জবার বদলে ছিন্নশির ॥

স্থির হয়ে গেল, আবেদন-নিবেদনের কুসুমাস্তীর্ণ রাজসড়কপথে আর নয়। বাঙলার তারুণ্যে শপথ জাগল মরণ-মারণের। স্থির হয়ে গেল, ধ্রুব মরণের সহস্রমুখ অগ্নিনালিকার উদ্যত মুখে ভ্রূক্ষেপহীন ওরা পায়ের নীচে কাঁটা-ছড়ানো আরণ্যক অপথেই মোকাবিলা করবে দেশমাতার নির্দয় কারাধ্যক্ষদের। দুর্জয় সঙ্কল্পে বলিষ্ঠ কব্জিতে তুলে নেবে মারণাস্ত্র, শত্রুর বক্ষে লক্ষ্য স্থির।

উল্লাস। উল্লাস। বাঙলা বাঙালীর নিন্দা অসহ্য। করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের লজিকের প্রফেসর রাসেল। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র উল্লাস। ১৯০৫। উল্লাসের হাতের জুতো এসে পড়ল রাসেলের বুকে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে থরথর কাঁপতে লাগল কলেজের দেওয়ালগুলো, ওর আকাশ, বাতাস। রইল পড়ে কলেজের পড়া।

উল্লাস বললেন বারীন্দ্রকুমারকে, হয়েছে তাঁর ল্যাবরেটরির কাজ শেষ। দেওঘরের ল্যাবরেটরি। বোমা প্রস্তুত।

দিঘিরিয়া পাহাড়টা খুব উঁচু নয়; লতা-ঝোপের চমৎকার আড়াল। পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড এক পাথর; একটা দিক বুক সমান খাড়া আর একটা দিক নেমেছে সমতলের দিকে। বোমা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চমৎকার পটভূমি। উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে পুরাণদহ অঞ্চলে মণি বসুর বাড়ির গোপন আড্ডা থেকে বেরিয়ে এলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, নলিনী গুপ্ত, বিভূতিভূষণ সরকার—আর রঙপুরের জজকোর্টের পেস্কার ঈশান চক্রবর্তীর ছেলে প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। কথা ছিল, বোমা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আড়ালে বসে পড়বেন। বোমা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটল; প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মাথার খুলি গেল উড়ে; উল্লাসকর দত্তের গলার শিরাগুলো ফেটে গুটিয়ে গেল।

কে ছুঁড়েছিলেন বোমা, তা নিয়ে দ্বিমত দেখছি। শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁর 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'-এ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'স্মৃতিপাতা' থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "প্রফুল্ল বোমা ছুঁড়েছিলেন"; 'অবিস্মরণীয়' লেখক শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র বলেছেন, "বোমা ছুঁড়লেন শ্রীউল্লাসকর দত্ত"; কিন্তু দু'জনেই একমত যে, প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে ছিলেন। বোমা তৈরি করেছেন উল্লাস, স্বভাবতই মনে হয়, বিশেষজ্ঞ হিসেবে

তিনিই ওটা ছুঁড়বেন। কিন্তু প্রফুল্লই বা দাঁড়িয়ে থাকলেন বা তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া হল কেন, সব্বার যখন ব'সে থাকবার কথা, যদি তিনি বোমা না ছুঁড়ে থাকেন ? পুলিশ খতিয়ানেও এর হদিস পাওয়া যাবে না, কেন না, পুলিশ এ খবর শুধু যে পায়নি তাই নয়, মাণিকতলা বাগানবাড়ি মামলায় শেষ পর্যন্ত এই দুর্দান্ত পলাতক বিপ্লবীকে খুঁজে ফিরেছে। মাণিকতলা বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষে শেষ সওয়াল করার সময়ও আর্ডলি নর্টন বলেছিলেন, প্রফুল্ল চক্রবর্তী পলাতক। সিডিসন কমিটি রিপোর্টে এর কোন উল্লেখ নেই।

দিঘিরিয়া পাহাড়ের প্রতিধ্বনিতে ১৯০৮এর একটা তারিখ দেশমাতৃকার পদতলে লাল জবার মত ফুটে রইল। সেই তারিখ নিয়ে কিছু মতদ্বৈধ আছে। শ্রীঘোষের মতে ২৯-এ জানুয়ারি ; শ্রীচন্দ্রের মতে ১লা মে। পরদিন বন্ধুরা ফিরে গিয়ে লাশ পান নি। পুলিশ লাশ পায় নি। কিভাবে সে লাশ উধাও হয়েছিল কেউ জানে না।

কিন্তু এই অপ্রার্থিত রক্ততর্পণে যাত্রাপথ অবরুদ্ধ হয় নি।

না, এ সূচনা নয় ; এ রক্তাক্ত বিয়োগান্ত ; আগের ক'টি চেষ্টা ব্যর্থতায় শোচনীয় ; কিন্তু নিরুদ্যমে শেষ নয়।

মাণিকতলা বাগানে অস্ত্রাগার আবিষ্কারের পর বন্দীরা যেসব বিবৃতি দেন তাতে জানা যায়, ১৯০৭-এই কাজ শুরু হয়েছে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন, 'দেড় বছরে চোদ্দ পনেরোজন কর্মী আর এগারোটি রিভলভার যোগাড় করেছিলাম। এমন সময় এলেন উল্লাস। তাঁর ছিল ছোট্ট এক ল্যাবরেটরি। তিনি লেগে গেলেন কাজে। মেদিনীপুরের এক বন্ধু হেমচন্দ্র দাস প্যারিস গেছলেন মেকানিকস শিখতে, শিখে এসেছেন বোমা তৈরি করা। তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। যাঁর কাছে যাই তাঁর মুখেই একই কথা শুনি ঃ প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চাই ! আমাদের কয়েকজন কর্মী এগিয়ে এলেন আত্মদানের জন্য। লক্ষ্য হ'ল বাঙলার লাট (লেঃ গবর্ণর) স্যার এণ্ডরু ফ্রেজার। রাঁচিতে যাবেন। আমাদের প্রথম কাজ। চন্দননগরে গেলেন উল্লাস। একটা ছোট ডিনামাইট মাইন, একটা ফিউজ ও ডিটোনেটর। লাটের স্পেশ্যাল ট্রেন আসবার আগেই বসাতে হবে। লোক এসে যাওয়ায় হ'ল না। তাড়াতাড়িতে দু'তিনটি কার্তুজ থেকে গেল।

'একই উদ্দেশ্যে আরও দু'জন রওয়ানা হলেন ঃ বগুড়ার প্রফুল্লচন্দ্র চাকী আর শান্তিপুরের বিভূতিভূষণ সরকার। আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। চন্দননগর থেকে এক মাইল দূরে রইলাম আমরা। চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর মাঝামাঝি জায়গায়

মাইনটা বসিয়েছিলাম। লাটের স্পেশ্যাল এল না এ-পথে। দু'টো চেষ্টাই হ'ল নিষ্ফল।' সিডিসান কমিটি একটা সঠিক তারিখ দেন নি, বলেছেন অক্টোবর ১৯০৭, শ্রীঘোষও তাই, শ্রীচন্দ্র দিয়েছেন ৪ঠা অক্টোবর।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন: 'তৃতীয়বারের জন্য গেলাম খড়্গপুর। আমি, প্রফুল্ল, বিভূতি। আর একটা ট্রেনে নারায়ণগড় গেলাম। রেল লাইনের সমান্তরাল পাকা রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত নটা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে নারায়ণগড়ের এক মাইল উত্তরে খড়্গপুরের দিকে একটা মাইন পুঁতলাম। ছয় পাউণ্ড ডিনামাইট দিয়ে মাইনটা তৈরি। একটা পুরু লোহার পাত্রে রেখেছিলাম, তার ঢাকনার মাঝখানে ছিল একটা ফুটো। ফিউজ অবশ্যই ছিল। একটা কাগজের টিউবে পিকরিক কম্পাউণ্ড রেখেছিলাম। পাছে রুদ্ধ হয়ে যায় এজন্য একটা সীসের পাইপও বসিয়েছিলাম।' বারীন্দ্রকুমার বলেন, 'এত বিশদ বিবরণ দেবার কারণ, কতকগুলো নির্দোষ কুলির এজন্য দণ্ড হয়েছে। আমরা কুলি অথবা কারও সাহায্য নিইনি। আশ্চর্য; সেদিনকার হাইকোর্ট জজ সাহেবের দণ্ডের বিরুদ্ধে রেল-কুলিদের আপীল নাকচ করে দিয়েছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হাইকোর্ট তাতে কর্ণপাত করেন নি। হাইকোর্টে আপীল দায়ের হয় ১৯০৮এর ১৬ই জুন; এক মাস আগে বারীন্দ্রকুমার, ৪ঠা মে, বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই মামলার তদ্বিরকার পুলিশ অফিসার রামসদয় মুখার্জি এই কেরামতির জন্য খেতাব পান 'রায় বাহাদুর'। অনেক ফাইল চালাচালির পর কুড়ি মাস কারাদণ্ড ভোগের পর সম্পূর্ণ নির্দোষ হতভাগ্যেরা কারামুক্ত হয়। দণ্ডকাল সম্পর্কে মতানৈক্য লক্ষণীয়। 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'-এআছে: নেপাল দলুইর দশ বছর; কুমুদ, অপি ও অযোধ্যা পাহাড়ীর সাত বছর করে; গোপাল,তরু ও ফকিরের পাঁচ বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল থাকে। "অবিস্মরণীয়"-তে আছে: সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এটি ভুল। কেন না, পুরোনো অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টে 'জাগরণ ও বিস্ফোরণে'র কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। হাই-কোর্টে আপীল এই ছয়জনই করেছিল। গেটম্যান উমেশ প্রমাণাভাবে এবং শিবুদাস স্বীকারোক্তির বিনিময়ে নিম্ন আদালতেই ক্ষমা ও মুক্তি পেয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাক-সোপর্দ বিচার শেষ হয়েছিল ৯ই মার্চ, দায়রা বিচার শুরু হয়েছিল ৩১এ মার্চ; হাইকোর্টেআপীল হয় ১৯০৮এর ১৬ই জুন। ১৯এ আগস্ট আপীল নাকচ হ'য়ে যায়। দু'জন বিচারপতি সমমতের দুটি পৃথক রায় দেন। অমৃতবাজার পত্রিকা ২৫এ আগস্ট, ১৯০৮-এর সংখ্যায় বিচারপতি মিঃ হোমউডের (Holmwood) রায় থেকে

এই সারাংশ উদ্ধৃত করেন ঃ ১৯০৭এর ৬ই ডিসেম্বর (সিডিসান কমিটিতেও এই তারিখ আছে) রাত ২-৪৫ মিঃ বি, এন, রেলওয়ের নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে লেঃ গবর্ণরের ট্রেন উড়িয়ে দেবার যে চেষ্টা হয়েছিল এই মামলা সেই সূত্রেই উঠেছে। নারায়ণ-গড় স্টেশন ছেড়ে গেলে ট্রেন-ড্রাইভার তিনটি ঝাঁকুনি অনুভব করেন ও শব্দ শুনতে পান। গাড়ীটা থামানো হয়। দেখা যায়, একটা জায়গায় রেল লাইনের নীচে গর্ত ও রেলটা দুমড়ে গেছে। খড়্গপুরে ইঞ্জিনটা মুক্ত ক'রে নেওয়া হয়। সকালবেলা ঘটনাস্থলে ছেঁড়া খবরের কাগজ, ৩রা ডিসেম্বরের 'ইংলিশম্যান'। কিছু ন্যাকড়া পাওয়া যায়। ঐ 'ইংলিশম্যানে' ছিল লাটসাহেবের সফর-সূচী। ১০ই তারিখ রঘুনাথপুরের কুলি-বস্তিতে খানাতল্লাসী হয়, কারণ,

"এই-ই সম্ভব মনে হয় যে, খালি ট্রেন-গাড়ি স্থির রাখবার ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ কিছু কুলিকে এই দুর্ঘটনা ঘটাতে নিয়োগ করা হয়েছিল।"

এই অনুমান-নির্ভর তথ্যের মামলায় বিচারপতিগণ বললেন, যারাই সে দিন ও সে রাত্রে নেপালকে দেখেছে তার একজন সাক্ষীও বন্দীর পক্ষসমর্থক কৌঁসুলির দীর্ঘ জেরার উত্তরে বলল না যে, নেপাল অসুস্থ ছিল। সুতরাং, এই অপরাধে নেপাল ও শিবুর সংস্রব পুরোপুরি স্বীকারোক্তিতে সমর্থিত হয়েছে। কুমুদ নিজে যে স্বীকারোক্তি করেছে তা নেপালের ও রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলে গেছে। উল্লেখযোগ্য কোন অসামঞ্জস্যই এসব বিবৃতিতে নেই।

এক উচ্চ বিচারালয়ের শেষ কলঙ্ক-কথা এই ঃ

"বিষয়টি পরম সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনার পর আমাদের মনে হয়েছে, রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তিগুলো পরস্পরকে সমর্থন করেছে।……আমরা দায়রা জজের সঙ্গে একমত যে, যারা রেলকর্মী ছিল, তাদের ওপরই এর পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাচ্ছে…… সুতরাং, আমরা তাঁর দোষ সাব্যস্ত করা ও দণ্ডদানকে বলবৎ রেখে আপীল খারিজ করে দিলাম।"

আলিপুর আদালতে মাণিকতলা মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলার একেবারে সূচনায়ই বন্দী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সুস্পস্ট দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নেয়া সত্ত্বেও এই বিচার বিভ্রাট সম্ভব হ'ল। 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'-এ বলা হয়েছে— "ট্রেনের কোনও ক্ষতি হয় নি, সময়মত সেটা কলিকাতায় এসে পৌঁছেছিল।" পক্ষান্তরে, সিডিসান কমিটি বলেছেন, "যে-ট্রেনে তিনি যাচ্ছিলেন, মেদিনীপুরের কাছে একটি বোমার চোটে সেটি সত্যি করে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে পাঁচ ফুট বিস্তার ও পাঁচ ফুট গভীর এক ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল।"

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ এইচ ডাফ, মুরারী-পুকুর বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন : লেঃ গবর্ণরকে পাহারা দেবার জন্ম তিনি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে যান। ৫ই ডিসেম্বর রাত্ত নটায় কটকে তিনি লেঃ গবর্ণরের ভার নেন। লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে ছিলেন লেডী ফ্রেজার, পার্শ্বচর মিঃ গেট (Gait), ডিস্ট্রিক্ট লোকো সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডিস্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্যানেল (Ganel)। "৬ই ডিসেম্বর সকাল ছুটো কি তিনটের মধ্যে একটা কাঁপা কাঁপা ঘষার শব্দে জেগে উঠি। বিস্ফোরণের শব্দ শুনি নি। ট্রেনটা থেমে গিয়ে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে। নীচে নেমে গিয়ে মাটির বড় গর্তটা দেখি, আর দেখি রেললাইনটা ওপরে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে; ইঞ্জিনের কিছু কিছু জিনিস খোয়া গেছে।" ডাফের মতে গর্তটার ব্যাস ছিল ৫ ফুট এবং গভীরতা ৮ ফুট। তিনি ড্রাইভার ও লোকো সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে খড়্গপুর যান।

তারপর আশেপাশে তল্লাসী ক'রে কি সব জিনিস পাওয়া যায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে ফরিয়াদীপক্ষের কৌঁসুলি মিঃ নর্টন মন্তব্য করেন : বারীন্দ্রের স্বীকা-রোক্তিমত কাগজের কাটিং ছুটো ছিল "ইংলিশম্যানের" ও "বন্দেমাতরমের"।

অর্থাৎ, বারীন্দ্রের প্রাথমিক স্বীকারোক্তি তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হ'ল কিন্তু কুলিদের বিচারে তা অগ্রাহ্য হ'ল। স্পষ্টতই এ ছুটি রায়ই রাজনৈতিক। এই রাজনৈতিক বিচার করেছেন কিংসফোর্ড এবং কিংসফোর্ডকে উপলক্ষ্য ক'রে শ্রীমতী কেনেডি ও কুমারী কেনেডির আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে ক্ষুদিরামের বিচারেও আমরা এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাব।

অথচ পুলিশের দাবী ছিল নারায়ণগড় ট্রেন ছুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়েই তারা এক গুপ্ত সমিতির হদিস পায়, যে গুপ্ত সমিতি মেদিনীপুরেই আবদ্ধ নয়, কলকাতায়ও তার সম্বন্ধসূত্র বর্তমান। মেদিনীপুর পুলিশের আরও দাবী যে, তারা একজন চরকে এই সমিতির বিশ্বাসভাজন সদস্য ক'রে অনেক খবর জেনে নিয়েছিল মজঃফরপুর বিস্ফোরণের আগেই। "মেদিনীপুর বোমার মামলায়" সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মেদিনীপুরের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ বলেছিলেন : "নারায়ণগড় ট্রেন ধ্বংস মামলা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে আমি মেদিনীপুরের চরমপন্থীদের কথা জানতে পারি। আমি আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে কাজে লাগাই। আমি সমস্ত খবর পাঁচদিন অন্তর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মারফৎ ডি আই জি ও ম্যাজিস্ট্রেটকে গোপন-ডায়েরী আকারে পাঠাতাম। তাকে

চাই নে। আমি আর কোন বিবৃতি দিতে বা মামলায় অংশ নিতে ইচ্ছুক নই।"

২৫এ জুলাই অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ভূপেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষে 'ওয়ান মোর ফর দ্য অল্টার' 'বেদীমূলে আরও একটি বলি' নামে একটি, ২৬এ জুলাই আরও একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। ১৯০৭এর ১৬ই আগস্ট 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ এবং যে-প্রবন্ধের জন্য 'যুগান্তর' দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তার অনুবাদ প্রকাশের অপরাধে অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু তাঁকে 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক প্রতিপন্ন করা ও প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য দায়ী করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ম্যানেজার, হেমেন্দ্রনাথ বাগচী ও মুদ্রাকর-প্রকাশক অপূর্বকৃষ্ণ বসুকেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বাগচী অরবিন্দের সঙ্গে ছাড়া পান, বসুর তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই মামলাতেই সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে আদালতের অবমাননার অভিযোগ আনা হয় ও কিংসফোর্ড ঐ মামলা নিষ্পত্তির জন্য তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁর তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

'বন্দেমাতরম্' মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্য যখন বিপিনচন্দ্র পালের ওপর চাপ দেওয়া চলেছে, ঠিক সেই সময়ই, ২৭এ আগস্ট সুশীলকুমার সেনকে কিংসফোর্ডের সামনে হাজির করা হল এই অভিযোগে যে, তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর হুয়ে (Huey)কে মেরেছেন। সুশীলকুমার তখন নিতান্তই ১৫ বছরের তরুণ। হুয়ে সাহেবের সঙ্গে ছিল এক কনস্টেবল; তার সাক্ষ্যেই সুশীলের বেত্রদণ্ড হয়ে গেল।*

সুশীল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সেই অভিব্যক্তির মূর্ত প্রতীক।

বেত মেরে তুই মা ভোলাবি
আমি কি মা'র সেই ছেলে?

সুশীলের কাণ্ড দেখে এক বিস্মিত বিমুগ্ধ বৃটিশ কর্মচারী বলেছিলেন, দুর্ধর্ষ পাঞ্জাবীদের বুকে হাঁটিয়েছি আমি; পারিনি একটা বাঙালী ছেলেকে মায়ের নাম

* "ভাল কথা, কিংসফোর্ড মশাইর পুলিশের প্রতি এত প্রেম কেন? কলিকাতার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তাঁর পদগৌরব একজন জজের মত; পুলিশের সঙ্গে কোন কারবারই তাঁর থাকবার নয়। তবু তিনি হাইকোর্টের সার্কুলার অমান্য ক'রে একটা পনেরো বছর ছেলেকে নির্দয় দণ্ড দিলেন। এবং তাও যে জন্য তা আদৌ কোন দুর্বৃত্তের অপরাধ নয়; কেননা, সুশীল যদি পুলিশ ইন্সপেক্টর হুয়েকে পাল্টা ঘুষি মেরেই থাকেন তো সে আত্মরক্ষায়।" (অমৃতবাজার; ২রা সেপ্টেম্বর ১৯০৭)

ভোলাতে। বেতের পর বেত খেয়েছে আর বলেছে 'বন্দেমাতরম্'—মাথা উঁচু ক'রে। হার মানে নি। শ্রদ্ধা জানাই তাকে।

পুলিশও জানত, এ সেই ছেলেই নয় ; আর বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। শ্রীহট্টের এক সাব-রেজিস্ট্রারের ছেলে ও এক ডেপুটি কালেক্টরের ভাই সুশীলকে ধরে আনা হ'ল বাড়ি থেকে বাগানবাড়ি বোমা মামলা সম্পর্কে। এর আগে আর একটা মিশনে গেছলেন সুশীল সেন। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড-নিধনের মিশনে জায়গাটা দেখতে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে। বাবা অত্যন্ত অসুস্থ, এই সংবাদ পেয়ে সুশীল দেশে ফিরে যান। পরে ঐ মামলা সম্পর্কে দেশেই তাঁকে ধরে কলকাতায় আনা হয়। মাণিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় দায়রা আদালতে তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল ; হাইকোর্টে বিচারপতিদের দ্বিমতে তিনি বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সুশীল মুক্তির আনন্দে ছুটে পালান নি। দেশমাতার মুক্তিই যাঁর অবিচল সঙ্কল্প তিনি আবার তলিয়ে গেলেন আত্মত্যাগের মহাসাগরে। আবার যখন দক্ষ ডুবুরির মত ভেসে উঠলেন তখন সুশীল গুলীবিদ্ধ।

গুপ্ত সমিতির টাকা নেই, টাকার দরকার। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৮এ এপ্রিল দৌলতপুর থানার প্রাগপুরে একটা নৌকো এসে লাগে। রাত ন'টায় হরিনাথ সাহার গদী লুট হয়ে গেল। ৩০০০ টাকা মাত্র। গ্রামবাসীরা জুটে যায়। নৌকো করে ওঁরা খলিল পৌঁছোন। খবর পেয়ে পুলিশও এসে পৌঁছোয়। নৌকো থেকে নেমে ওঁরা করছিলেন রান্নার যোগাড়। তাড়াতাড়ি নৌকোয় উঠতে গিয়ে হাতের একটা আগ্নেয়াস্ত্র যায় পড়ে আর গুলী ছুটে এসে লাগে সুশীলের দেহে। আঘাত মারাত্মক। নৌকোর পেছনে গ্রামবাসীদের ততোধিক মারাত্মক চীৎকার। ওরা আসছে। আসছে একটা পুলিশের লঞ্চও। আঃ, এল প্রবল ঝড়, নিশীথের সর্বাঙ্গ জুড়ে আরও অন্ধকার। শত্রুর নাগালের বাইরে এসে পড়া গেছে। কিন্তু সুশীল একেবারে মৃত্যুর কব্জায়, পরিত্রাণ নেই ; স্বয়ং সুশীল জেনেছেন, বুঝেছেন তিনি হবেন পলায়নপর সঙ্গীদের বোঝা। নিজেই প্রস্তাব করলেন ঃ মুণ্ডুটা কেটে নাও আমার, দেহটা ফেলো জলে। সনাক্তের অসুবিধেয় সবাই যাবে বেঁচে। যেই কথা সেই কাজ। দেশ-মায়ের সন্তান, বাঙলার মাটি বাঙলার জলে মিশে গেলেন। মাকে ভোলবার ছেলে সুশীল নন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বললেন ঃ "নারায়ণগড়ের পর আমাদের চতুর্থ চেষ্টা চন্দননগরের মেয়র-ভুবনে বোমা নিক্ষেপ। যশোরের ইন্দুভূষণ রায়, আমি আর শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই। একসঙ্গে চন্দননগর গেলাম। অল্প আলো থাকতে

মানকুণ্ডু স্টেশনে নামলাম। তারপর সোজা চন্দননগর স্ট্র্যাণ্ড। রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সে রাত্রে মেয়রকে দেখা গেল না। অতএব চলে আসতে হল। স্টেশনের কাছে গেলাম ও একটা গাছতলায় রাত কাটালাম। ইন্দু আর নরেন শ্রীরামপুর ফিরে গেল, আমি ক'লকাতায়। পরদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চন্দননগর গেলাম। আমরা সেই তিনজন। ইন্দু বোমা ফেলবার ভার নিল। মেয়র মঃ তার্দিভেল (Tardivel) খাচ্ছিলেন। রাত ন'টা। ইন্দু জানালার গরাদ দিয়ে বোমাটা ছুঁড়ল (১৯০৮, ১১ই এপ্রিল)"। মেয়রের অপরাধ, তিনি যে-ফরাসী চন্দননগর ছিল বিপ্লবীদের অস্ত্র যোগানের একটা মস্ত সূত্র, ইংরাজের চাপে পড়ে সেখানে কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। কিন্তু বোমাটা কাজে লাগে নি।* বারীন্দ্রকুমার বলেছেন, "আমরা বাজার থেকে যে পিকরিড এসিড কিনেছিলাম তা ভাল ছিল না। আমরা তেলিনীপাড়ায় ছুটে এসে নৌকোয় নদী পার হয়ে কলকাতায় চলে আসি।"

যিনি বোমা ছুঁড়েছিলেন, সেই ইন্দুভূষণ রায়ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দেন তাতে বলেছেন, বোমাটা আদৌ ফাটে নি।

নরেন গোঁসাই সঙ্গে ছিলেন বটে কিন্তু ইন্দুও নরেনকে চিনতেন না, নরেনও ইন্দুকে চিনতেন না। নরেন তাঁর বিবৃতিতে বলেন, একটা পটকা ফাটার আওয়াজ হয়।

এতদিন সব কিছুই পুলিশের অগোচরে ছিল, যদিও মেদিনীপুর-পুলিশের দাবী ছিল তারা গুপ্তসমিতির হদিস পেয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সিডিসান কমিটি বলেছেন, (পৃঃ ৩২) মজঃফরপুর বিস্ফোরণের এক বছর পর একজন হাজতী বিপ্লবী জানান যে.

"এই দুর্ঘটনার আগে পার্শেল করে কিংসফোর্ডের নামে একটা বোমা পাঠানো হয়েছিল। তল্লাসী করে একটা পার্শেল পাওয়া যায়; কিংসফোর্ড ওটা পেয়েছিলেন, কিন্তু খোলেন নি। মনে করেছিলেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে যে বই নিয়েছিল, তাই ফেরত এসেছে। পার্শেলে বই একটা ছিল ঠিকই কিন্তু তার মাঝখানটার পাতাগুলো কাটা; ফলে বইটা হয়ে দাঁড়ায় একটা বাক্স। ঐ কাটা জায়গায় বসানো একটা বোমা; সঙ্গে এক স্প্রিং, যেন খুললেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।" কোন তারিখ দেওয়া নেই।

* সিডিশন কমিটি বলেছেন "ওটা বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত কেউ আহত হয় নি।......মেয়র সম্প্রতি অবৈধ অস্ত্র আমদানী বন্ধ করে এক অর্ডিনান্স জারি করেছিলেন।" (পৃঃ ৩২)

অধ্যাপক-দম্পতি উমা মুখোপাধ্যায়-হরিদাস মুখোপাধ্যায় "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান" বইয়ে একটা সময় দিয়েছেন, জানুয়ারি, ১৯০৮ এবং তাঁরা বলেছেন কিংসফোর্ড কলকাতার বাইরে থাকায় পার্শেলটি আর খোলা হয় নি এবং ভুলক্রমে বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আলিপুর বোমার মামলা চলাকালীন অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তির মধ্যে ঐ পুস্তক-বোমার হদিস্ পাওয়া যায়।" (পৃঃ ৩৩-৩৪) কারা সেই অভিযুক্তেরা তা বলেন নি।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ তাঁর "জাগরণ ও বিস্ফোরণ"-এ বলেছেন, "রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তিতে খবর পেয়ে পুলিশ বইখানি খুঁজে পেয়ে বোমা আবিষ্কার করে।" (পৃঃ ২৯৫)

মামলার সময় রাজসাক্ষীর যে স্বীকারোক্তি অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে তা টুকেছি, কোথাও এ সংবাদ পাইনি।

শ্রীমতী উমা মুখার্জি তাঁর 'টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ'-এ ২৩ পৃষ্ঠায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লিখেছেন, "আলিপুর বোমার মামলা না চলা পর্যন্ত ব্যাপারটা একরকম সবাই ভুলেই গেছল। এই সময় আবার সে স্মৃতি জাগরূক হ'ল। বইটা না-খোলা অবস্থায়ই কিংসফোর্ডের বাড়িতে পাওয়া যায়। ভারত সরকারের বিস্ফোরক দ্রব্যের মুখ্য ইন্সপেক্টর এর এই বলে বর্ণনা দিয়েছেন যে, সর্বনাশা বোমা, ফাটলে আর কথা ছিল না।"

"অবিস্মরণীয়" লেখক শ্রীচন্দ্র লিখেছেনঃ তাঁকে (কিংসফোর্ডকে) মারবার জন্য তাঁর গার্ডেনরীচের বাড়ীতে ১২০০ পৃষ্ঠার এক বইয়ের ভেতর একটি বোমা রেখে তাঁর চাপরাশির হাতে দিয়ে আসা হ'ল যাতে বইটা খোলামাত্র বোমাটা ফেটে যায়। চাপরাশি বইটা টেবিলে রাখল বটে কিন্তু মিঃ কিংসফোর্ড তাঁর কোন বন্ধু পুরানো বই ফেরত দিয়েছেন মনে করে বইটা আলমারীতে ফেলে রাখলেন।"

অমৃতবাজার পত্রিকার ১৯০৯এর ১৭ই মার্চের সংখ্যায় এই মর্মে সংবাদটি বেরোয়ঃ আরও একটা বোমা বিস্ফোরণের চেষ্টা এখন প্রকাশ পেয়েছে! কিংসফোর্ড যখন কলকাতায় সি-পি-এম ছিলেন তখন তাঁকে বইয়ের ভেতর একটা বোমা পাঠান হয়েছিল। ওটা গার্ডেনরীচের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একজন চাপরাশির হাতে দেওয়া হয়। দেখতে আইনের বইয়ের মত। কিংসফোর্ড ভাবলেন, যে-বইখানি তিনি বন্ধুকে দিয়েছিলেন, এ সেই বই। খুললেন না। বইটা তাঁর সঙ্গে মজঃফরপুরেও যায়। সেখানে অন্যান্য বইয়ের মধ্যে এটিও পাওয়া যায়। বিস্ফোরক দ্রব্যের ইন্সপেক্টর ওটা কলকাতায় নিয়ে আসেন, পরীক্ষা করেন। ১২০০ পৃষ্ঠার

একটি আইনের বইয়ের ৬০০ পৃষ্ঠা কেটে পিকরিকে তৈরি একটা টিন বসানো ছিল ঐ ফাঁকটায়। একটা স্প্রিং এমনভাবে বসানো ছিল যে বইয়ের বাঁধা দড়ি কাটলেই মলাট খুলে যেত ও বিস্ফোরণ হত। খবরটা স্টেটসম্যান থেকে তোলা।

অথচ বন্দী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কোন বিবৃতিতেই এর উল্লেখ নেই, মুক্তজীবনে লেখা 'আত্মকাহিনীতে'ও নেই। স্পষ্টই বোঝা, যায়, পুলিশের অনুমানই তথ্যের মর্যাদা পেয়েছে। প্রকৃত প্রেরকের নাম জানা যায়নি।*

তারপর মজঃফরপুরে যখন এতদিনকার ব্যর্থতার পর একটা নিদারুণ সার্থক বিস্ফোরণ ঘটল কলকাতার পুলিশ অনুমান-নির্ভর প্রত্যেকটি গোপন আস্তানায় জাল ফেলল এবং—

বারীন্দ্রকুমার বললেন, "আর একটি মাত্র ঘটনা বলতে বাকী আছে—শেষ ঘটনা। কিংসফোর্ড জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা করেছেন। প্রফুল্ল চাকী জেদ ধরল, সে বোমা ফেলে কিংসফোর্ডকে মারবে। হেমচন্দ্র ও উল্লাস ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে একটা হাতলওলা বোমা তৈরি করলেন। আমি ও উপেন্দ্রনাথ সায় দিলাম। হেমচন্দ্র ক্ষুদিরাম বসু ব'লে মেদিনীপুরের একটি ছেলের নাম সুপারিশ করলেন। তাকে যেতে দেওয়া হ'ল। আমরা তাদের দু'টো রিভলভারও দিলাম। রিভলভার দিলাম এজন্য যে, ধরা পড়ার উপক্রম হ'লে আত্মহনন করবে তারা এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ক্ষুদিরাম মাণিকতলা বাগানবাড়ি বা গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ির খবর রাখত না। আমরা বাইরের কাউকে বিশ্বাস করতাম না।

"আমি প্রফুল্লকে ৩২ নং মুরারীপুকুর রোড থেকে ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনে এনেছিলাম। একটা ক্যানভাস ব্যাগে বোমা ও রিভলভার প্যাক করা হয়।"

ওঁদের যাত্রা শুরু হ'ল। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলতে তখন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গ বাদ দিয়েও। মিঃ কিংসফোর্ড কলকাতা ছেড়ে এসেছেন জজিয়তি করতে মজঃফরপুরে। ওঁরাও এলেন রাহুর মত পিছু পিছু। ওবার ছিলেন প্রফুল্ল চাকী, সুশীল সেন, এবার প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু।

বগুড়ার রাজনারায়ণ চাকীর পঞ্চম ও কনিষ্ঠ সন্তান প্রফুল্ল। গ্রামের নাম বিহার। শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু পরিবার। কোমলপ্রাণ, নম্র, নির্বিরোধী, কোটরাগত স্বপ্নালু-

---

* ভারতের স্বাধীনতার পর জিনিসটা আমি দু'বার পুলিশের দু'টি প্রদর্শনীতে দেখেছি।—লেখক

চক্ষু প্রফুল্লও তাই। না, নামের সঙ্গে প্রকৃতির মিল ছিল না। কি একটা গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত, স্থির। গায়ের রঙ কালোই বলতে হয় কিন্তু দৃপ্ত দীপ্ত মুখমণ্ডলের ওপর টানা টানা ভ্রূ। এমন নিস্তরঙ্গেও দোলা লাগল কার্লাইলের সার্কুলারে। ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ; করলে দণ্ড। তবু যে-আশীটি ছেলে রঙপুর জেলা স্কুল ছেড়েছিল, প্রফুল্ল তাদেরই একজন। দেখে অনেকের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সমৃদ্ধ, কনিষ্ঠ ব'লে অপরিমেয় স্নেহ-লালিত প্রফুল্লর এ কি নতুন মূর্তি! বৃদ্ধা মা'র কাছে যখন সঙ্কল্প সাধনেচ্ছায় বিদায় নিলেন, মা সহজ-সংস্কারে কিছু শঙ্কিত কিছু গর্বিত হয়েছিলেন কিন্তু সব কথার তাৎপর্য ধরতে পারেন নি। নিরুদ্দেশ অবস্থায় মাকে চিঠি দিলেন, "তুমি ভেবো না, মা, আমি একটুও কষ্টে নেই, কোন অস্বাচ্ছন্দ্য নেই আমার। আমি ব্রহ্মচর্য আশ্রম অবলম্বন করেছি। ধর্মপথে বেশ খানিকটা এগোনো গেছে। তোমার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই।" অর্থাৎ প্রফুল্ল তখন বাগানে এবং বারীন্দ্র-উপেন্দ্রের বিশ্বস্ত সঙ্গী।

ক্ষুদিরাম! ফাঁসীর হুকুম যখন নিশ্চিত, উকিলবাবু জিগ্‌গেস করেছিলেন, কোন-রকম ভয় করে তোমার? ক্ষুদিরাম হেসে বলেছিলেন, ভয় করবে কেন?

আত্মীয়-স্বজন কাউকেই দেখার আগ্রহ নেই, শুধু "একবার মেদিনীপুর দেখতে চাই।"

কত বয়স হবে? ক্লাসের হিসেব করলে দেখা যায়, ষোলো-সতেরো, হাইকোর্টের হিসেবে উনিশ হবে। "আমি সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলাম। দু'তিন বছর আগে পড়া ছেড়ে দিয়েছি। তখন থেকে আমি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নি। এজন্ম আমার জামাইবাবু (অমৃতলাল রায়) আমাকে ত্যাগ করেন। মা নেই। বাবা দশ এগারো বছর আগে মারা গেছেন (মানে পাঁচ ছয় বছর বয়সে)। ভাই নেই, কাকা, মামা—কেউ নেই। ঐ এক দিদি।"

স্বদেশীর জন্ম প্রথম মূল্য দিলেন দিদির সংসার ছেড়েই। বয়স তখন ষোলো। সরকারী কৃষি-প্রদর্শনীতে দিনের বেলা স্বদেশী ইস্তাহার বিলির জন্ম। তাঁতশালায় আস্তানা, রাতে ভাত খাচ্ছিলেন। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল। রাজদ্রোহাত্মক ইস্তাহার। ম্যাজিস্ট্রেট তড়িঘড়ি দায়রা সোপর্দ করলেন। দায়রায় এসে প্রবল বৃটিশ সরকারের কি খেয়াল হ'ল, মামলা নিলেন তুলে। তরুণ ক্ষুদিরামের কপালে আঁকা হয়ে গেল মায়ের আশীর্বাদ-তিলক। দেশমাতা হেমচন্দ্র দাসের হাত দিয়ে পাঠালেন তাঁকে জীবনের বৃহত্তম মিশনে।

মেদিনীপুরের বোমা মামলায় ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ মোজাক্কল হক আদালতে বলেন, ক্ষুদিরাম (১৯০৮ এর) জানুয়ারি থেকে ২৮-এ এপ্রিল মেদিনীপুরে নিখোঁজ ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরা বলেছেন, মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ২০ দিন ছিলেন কিংসফোর্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য। তাহ'লে অন্তত ১১ই এপ্রিল ওখানে এসেছিলেন ; ৩০এ এপ্রিল রাতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মজঃফরপুর মেহ্‌তো ওয়ার্ডস এস্টেটের হেড ক্লার্ক, ৪২ বছর বয়স্ক, কিশোরীমোহন ব্যানার্জি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বলেছেন, তিনি ক্ষুদিরামকে চেনেন না, তিনি যাঁকে জানতেন তিনি দীনেশচন্দ্র রায়, তিনি মার্চ মাসের শেষে ধর্মশালায় এসেছিলেন, এক সপ্তাহেরও বেশি কাল ছিলেন, ১০ই এপ্রিল ধর্মশালা ছেড়ে যান। হাইকোর্টের হিসেব আর কিশোরী ব্যানার্জির হিসেবে ২০ দিনের ব্যবধান। কোথায় ছিলেন এঁরা এসময় ১০ই এপ্রিল ছেড়ে গেলে ? ইতিমধ্যে দীনেশচন্দ্র রায়ের নামে কলকাতা থেকে মনিঅর্ডার এসেছে। দীনেশ (মানে, প্রফুল্লচন্দ্র চাকী) বলেছেন, আসবার পথে টাকা খোয়া গেছে, টাকা এলে বারাণসী যাবেন। টাকাটা ডাকপিয়নের কাছ থেকে কিশোরীই রেখেছিলেন, দীনেশ ছিলেন না। টাকাটা অবশ্য কিশোরীর প্রযত্নে (কেয়ার অব্)-এই এসেছিল। ডাক-পিয়ন যোগেশ্বরী তেওয়ারী বলেছেন, তিনি ৯ই এপ্রিল টাকাটা দিয়েছেন। দীনেশ কোন ঠিকানা না দিয়েই কোথায় চলে গেছেন।

ঘটনাটা নিঃসন্দেহে ফরাসী চন্দননগরের মেয়রের ওপর বোমা নিক্ষেপের পর ; তার তারিখ ১১ই এপ্রিল।

মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর্মস্ট্রং-এর জবানবন্দীমত কিংসফোর্ড এখানে জজ হয়ে আসেন মার্চ মাসের শেষাশেষি। কিংসফোর্ডের বিবৃতিমত তিনি ২৬এ মার্চ মজঃফরপুরে এসেছেন। কলকাতা থেকে পাওয়া এক সংবাদ অনুসারে তিনি কিংসফোর্ডের জীবন-রক্ষায় প্রহরী মোতায়েন করেন ২৩-এ এপ্রিল থেকে। কিংসফোর্ড বলেছেন, তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি ২০ তারিখে লেখা কলকাতার পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের চিঠি দেখেছেন।

ক্ষুদিরাম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রথম যে বিবৃতি দেন, তাতে তিনি বলেন, কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য আমি কলকাতা থেকে পাঁচ ছদিন আগে মজঃফরপুর এসেছি ; দ্বিতীয় সংশোধিত বিবৃতিতেও তিনি বলেছেন, "ঘটনার দিনসহ আমি ধর্মশালায় পাঁচদিন ছিলাম।" অর্থাৎ, কিংসফোর্ড মজঃফরপুর আসার মাসখানেক পর। কে এল চ্যাটার্জি নামে এক সাক্ষী বলেছেন, ক্ষুদিরামকে তিনি ১০ই

এপ্রিল ময়দানে দেখেছেন। ক্ষুদিরামকে জেরা করতে বলা হ'লে বলেছিলেন, কি বলব আমি তো তখন মেদিনীপুরে। জেরা করেছিলেন, আপনি ঠিক বলছেন তারিখটা দশই? সাক্ষী বলেছিলেন, তিনি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত। এস্টেটের ভৃত্য খেমান কাহার বলেছে, সে চৈত্র মাসের শেষে (তার মানে এপ্রিলের মাঝামাঝি) ক্ষুদিরামকে ছ'সাতদিন দেখে, তারপর দিন দশেক দেখেনি, তারপর আবার একদিন দেখে বারান্দায় রান্না করছে; তাও মেম সাহেবদের মারা পড়বার তিন চারদিন আগে। ঐ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের মেহতা এস্টেটের অফিস-পিয়ন রামধন মিশির বলেছে, ঘটনার একমাস আগে ১৯।২০ বছর বয়সের দু'জন বাঙালী ধর্মশালায় আসেন।

তারিখ ও অবস্থিতিকাল সম্পর্কে বিভিন্ন বিবৃতির মধ্যে এই যে অমিল, আমার মনে হয়, তার এই কারণ হতে পারে যে, প্রথমবার যদি সুশীল সেন প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে এসে থাকেন, এবং দ্বিতীয়বার যদি ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে এসে থাকেন তবে ধর্মশালায় প্রথমবার থাকা, চলে যাওয়া, আবার আসা ও থাকার একটা মিল পাওয়া যায়। যে-কিশোরীবাবু অপরাধীদের আড়াল দেবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা উক্তির জন্য অভি-যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে মামলা প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়। তিনি আগাগোড়াই বলেছেন, তিনি ক্ষুদিরামকে আদৌ দেখেন নি, দীনেশচন্দ্র রায়ের (মানে প্রফুল্ল চাকীর) কোন সঙ্গীকেই দেখেন নি। কথাবার্তা সবই দীনেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে হয়েছে। সেদিক থেকে ক্ষুদিরামের ঘটনার ছ'সাতদিন আগে আসার কথা সত্য হতে পারে। এক ফাঁক থেকে যায়, কিশোরীবাবু বলেছেন, দীনেশ ১০ই এপ্রিল ধর্মশালা ছেড়ে গেছেন। এ প্রথমবারের কথা হতে পারে। আবার ডাক-পিয়নকে তিনি এমন কথাও বলেছিলেন, কি জানি তিনি কোথায় গেছেন, কোন ঠিকানা রেখে যাননি। সেটা ১০ই এপ্রিলের মধ্যেই কিনা স্পষ্ট নয়। কেননা, দীনেশের নামে টাকাটা ডাকপিয়নের কাছ থেকে নিয়ে দীনেশকে দিয়েছেন বলেছেন কিন্তু কুপন (বা রসিদটা) রেখে দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য, টাকা কে পাঠিয়েছেন তা কিন্তু কোন মামলাতেই ওঠে নি, যদিও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিরুদ্ধে তাঁর স্বীকারোক্তিমত অতিরিক্ত একটা অভিযোগ ছিল, প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে তিনি কিংসফোর্ড হত্যায় প্ররোচিত ও সহায়তা করেছেন (এডেড এণ্ড এবেটেড)।

মোদ্দা কথা, ৩০-এ এপ্রিলে বিস্ফোরণের আগে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম ধর্মশালায় ছিলেন এবং বিস্ফোরণের পর তল্লাসীকালে পুলিশ কিশোরীবাবুর অজ্ঞাতেই সেই ঘরের তালা ভেঙেছে।[১] ওঁরা দু'জনই একঘরে ছিলেন। ক্ষুদিরাম বাগানবাড়ির কেউ

ছিলেন না, প্রফুল্লর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল না ; ক্ষুদিরাম প্রফুল্লকে তাঁর ছদ্মনাম দীনেশচন্দ্র রায় নামেই জানতেন। দীনেশচন্দ্রের আর এক নাম দুর্গাদাস সেন। ধর্মশালায় ও পুলিশের কাছে তিনি ছিলেন দীনেশচন্দ্র রায়, ডি সি রয়। সনাক্তকরণ বা আসল পরিচয় বের করবার জন্যে পুলিশ যে বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিল তা চির-অমার্জনীয়। আত্মাহুতি দিয়ে পবিত্র, ঐ দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন ক'রে স্পিরিটের পাত্রে ডুবিয়ে কলকাতার লালবাজারে আনা হয়েছিল।

মজঃফরপুরে ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়ে অবধি ওঁরা তক্কে তক্কে ছিলেন কখন কিংসফোর্ড হননের সুযোগ পাওয়া যায়। ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানের কাছে তাঁর প্রথম বিবৃতিতে বলেছেন ঃ "আমরা চার-পাঁচদিন কিংসফোর্ডকে মারবার সুযোগ নিয়ে পরামর্শ করলাম। দু'তিন দিন বাইরে গিয়ে তাঁর বাড়ীটা দেখে এলাম। সন্ধ্যেয় যখন তিনি বেরোতেন, তখন আমরা তাঁকে দেখতাম। সকালবেলা কখনও তাঁকে দেখিনি। একদিন কাছারি গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি। আমার কাছে দুটো রিভলভার ছিল। দীনেশের কাছে একটা রিভলভার* ও একটা বোমা ছিল।···দু'তিন দিন দীনেশের সঙ্গে একটা টিনে করে বোমাটা নিয়ে বেরিয়েছি। সন্ধ্যায় জজ-বাড়ির সামনে ময়দানে ঘুরেছি। তিনবার তাঁকে দেখেছি কিন্তু সুবিধেমত পাই নি। শেষের রাত্রিটায় একটা সুযোগ পাওয়া গেল, আমি বোমাটা ছুঁড়ে দিলাম। দীনেশ ও আমি ময়দানের একটা গাছের নীচে ছিলাম। দেখলাম ক্লাব থেকে একটা গাড়ি বেরোচ্ছে। আমি ভাবলাম, কিংসফোর্ডের গাড়িটা চিনেছি। আমার গায়ে এই ডোরাকাটা কোটটা ছিল। দীনেশের গায়ে ছিল একটা সিল্কের কুর্তা। সে সেটা খুলে ফেলে আমার হাতে দেয়। কেন না, ওতে সুবিধে হচ্ছিল না। সে ভেস্ট আর চাদর গায় দেয়। আমাদের পায়ে জুতো ছিল। জুতো দু'জোড়া গাছের নীচে রাখলাম। বোমাটা ফেলবার জন্য আমি ছুটে সামনে গেলাম। বোমাটা যদিও দীনেশের, আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমিই গাড়িতে ছুঁড়ে দি। দীনেশ কি অবস্থায় ছিল আমি দেখতে পাই নি। আমি ভেবেছিলাম জজ ঐ গাড়ির ভেতরে আছেন। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই নি গাড়িতে ক'জন ছিল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। যে-কনস্টেবল আমাকে ধরেছে তার কাছে জেনেছি আমি ভুল করেছি।

"বোমা ফেলেই ধর্মশালা অবধি আমরা একসঙ্গে ছুটলাম। তারপরই ছাড়াছাড়ি। প্রথমে রেল লাইন ধরে, পরে সমস্তিপুর রোড বরাবর।"

*ওটা ছিল ব্রাউনিং পিস্তল, পরে দেখানো হ'লে ক্ষুদিরাম চিনতে পারেন নি।

মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ আর্মস্ট্রং তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন ঃ "কলকাতা থেকে পাওয়া এক সংবাদ অনুসারে মিঃ কিংসফোর্ডের গেটের কাছে দু'জন কনস্টেবল মোতায়েন রেখে তাদের ছ'টা সাড়ে ছ'টা থেকে ক্লাব থেকে জজ না ফেরা পর্যন্ত টহল দিতে বলি।

"আমি ঐদিন ক্লাবের রিডিং রুমে ছিলাম। রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনি। ভাবলাম, কোন বিয়ের উৎসবে বোমা ফাটল। আমি ঠিক করি, লোকটাকে আইনে ফেলব। বাড়ী ফিরে খেতে বসে যাই। কিছুক্ষণ পর মিঃ লী গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন ও কি হয়েছে তা বলেন। আমি লীর গাড়িতে উঠে পড়ি ও একসঙ্গে ঘটনাস্থলের দিকে এগোই। পথে কিংসফোর্ড ও উডম্যানের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা আমাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। সেখানে কনস্টেবল ফিয়াজুদ্দিনকে পাই। সে বলে, সে বোমা ফাটার শব্দ শুনেছে এবং দুটি ছায়ামূর্তিকে ময়দানের দিকে ছুটে যেতে দেখেছে। সে তাদের পিছু ছোটে কিন্তু তারা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সে সন্ধ্যে সাতটায় দুটি বাঙালী যুবককে দেখেছে। তারা নিজেদের ছাত্র বলে পরিচয় দেয় ও বলে, তারা কিশোরীবাবুর বাড়িতে আছে। সে তাদের চলে যেতে বলে। সে যে কিশোরীবাবুর বাড়ি বলল ও যাঁর বাড়ি তল্লাসী হ'ল সে কিশোরীবাবু নয়। সাব-ইন্সপেক্টর চতুর্বেদী শর্মাকে কিছু নির্দেশ দিলাম বাঁকিপুর ও মোকামে সম্পর্কে। টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশে 'তার' করলাম। ঘটনাস্থলে ফিরে উডম্যানকে পেলাম। তিনি জজবাড়ির সাক্ষ্যসাবুদ নথিভুক্ত করছেন। উডম্যান কনস্টেবল দু'জনের বিবৃতি নথিবদ্ধ করলেন। ময়দানে গোলপোস্টের ধারে একটা টিন পেলাম। ঢাকনা-সুদ্ধ তামাকের টিনের মতো। আশেপাশে কয়েকটা বাড়ি তল্লাসীও করলাম। উডম্যান গাছের নীচে কতকগুলো জুতো পরীক্ষা করছিলেন। সেখানে একটা চাদরও পাওয়া যায়। এবার মানুষ দুটির পুরো বর্ণনা দিয়ে 'তার' পাঠালাম। রেলস্টেশন গেলাম। মোকামে পর্যন্ত যে সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলরা যাচ্ছিল তাদের পাকা হুকুম দিলাম। ঘোষণা ক'রে দিলাম, আততায়ীদের যে বা যারা ধরে দেবে সে বা তারা ৫০০০ টাকা পুরস্কার পাবে।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ফতে সিং বলল, রাত একটায় (ইংরাজিমতে ১লা মে) একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে ট্রেনে রওনা দি; আমাকে আর শিউপ্রসাদ মিশিরকে ওয়েইনিতে মোতায়েন করায় আমরা সেখানেই নেমে পড়ি। যে-ট্রেনে এলাম সেটাও তালাস করলাম। কাউকে পাই নি। ট্রেনটা চলে গেলে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার সকাল সাতটায় আর একটা ট্রেন।

স্টেশন থেকে পনেরো গজ দূরে জিতুরামের দোকান। দেখি, সেখানে কে একজন জল খাচ্ছে। আমাদের কাছে আততায়ীদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে মিলে গেল। আমাদের দু'জনেরই শাদা পোশাক। আমার পায়ে এম্যুনিশন বুট, শিউপ্রসাদের খালি পা। লোকটাকে জিগ্‌গেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন, কোথা থেকে আসছেন। বললেন, আসছি পূব থেকে, যাচ্ছি বাঁকিপুরে। বললাম, এখানে কেন নামলেন, আপনাকে তো মজঃফরপুরে ট্রেন বদল করতে হ'ত।

"তিনি মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাছেই ছিল এক ঘটি জল। বললেন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল, জল খেতে নেমেছি। বলেই দৌড়। আমরা পেছন পেছন ছুটে জাপটে ধরলাম। ঝপ্‌ ক'রে একটা রিভলভার পড়ে গেল। তাঁকে বেঁধে ফেলবার আগেই আর একটা রিভলভার নিলেন (ক্ষুদিরাম একথা অস্বীকার করেছেন)। আমরা দু'জনে তাও কেড়ে নিলাম।"

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর্মস্ট্রং বলেছেন, "১লা মে বেলা একটায় ওয়েইনি স্টেশন থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। পাঠিয়েছে কনস্টেবল ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ মিশির। ২টা ২৫ মিনিটের ট্রেন ধরলাম। ওয়েইনি স্টেশন ২৪।২৫ মাইল দূরে। পৌঁছে দেখি, কনস্টেবলের হেফাজতে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়ে আছেন। কনস্টেবল তাঁকে একটা বাণ্ডিল দিল। সেটা খুলে পাওয়া গেল দুটি রিভলভার, একটি গুলীভরা, আর একটিতে গুলী নেই। দুটি রিভলভারই কার্যোপযোগী। কোটের পকেটে ত্রিশটা কার্তুজ। দুটি ডামি কার্তুজ, ১৪টি বড়। আর পাওয়া গেল ত্রিশ টাকার নোট, কিছু খুচরো পয়সা। চেনসহ ঘড়ি একটা, টাইম টেবিলের খানিকটা, রেলওয়ে ম্যাপের কাটিং, মোমবাতি, দেশলাই, আর একটা সিল্কের কুর্তা। চারটের ট্রেনে রওনা হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় স্টেশন ক্লাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেলাম।"

ক্ষুদিরাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের কাছে প্রথম বিবৃতি দিলেন। ইতিমধ্যে—

সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি বলল: "সিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে আমি ৩০এ এপ্রিল মজঃফরপুর যাই। ১লা মে বাঙালী-অনুষ্ঠিত ঐ ঘটনার কথা শুনলাম। ঐ তারিখেই ট্রেনে সিংভূম ফিরছিলাম। সমস্তিপুরে আমার সঙ্গে বর্ণনামত একজনের দেখা হয়ে যায়। নতুন পাঞ্জাবী, নতুন ধুতি, নতুন পাম্পস্, খালি মাথা। তিনি আমায় জিগ্‌গেস করেছিলেন, গাড়ি কখন ছাড়ে? আমি সেই সুযোগে আলাপ জমিয়ে ফেললাম। তাঁর সঙ্গে ছিল মোকামেঘাটের টিকিট। আমরা দু'জন একই কামরায় উঠলাম। তাঁর কথা বলার ধরণ ও চেহারা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। ট্রেন সমস্তিপুর ছেড়ে যাবার আগে আমি আমার দাদামশাই, মজঃফরপুরের সিনিয়ার

গবর্মেণ্ট-প্লীডার শিবচন্দ্র চাটার্জিকে এই ব'লে এক 'তার' করি, সন্দেহবশে লোকটাকে গ্রেপ্তার করবার অধিকার আমাকে দেবার জন্ম তিনি যেন পুলিশ সুপারকে বলেন। ২রা মে সকাল সাড়ে দশটায় মোকামেয় নেমে পড়ি। লোকটিও আমার সঙ্গে মোকামে স্টেশনে আসে কিন্তু আমার প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে আর একটা কামরায় গিয়ে ওঠে। আমি এজন্ম ক্ষমা চাই ও আমার জিনিসগুলো দেখতে বলে সোজা মোকামে স্টেশনে চলে যাই। উদ্দেশ্য, ওকে গ্রেপ্তারে সাহায্য করতে দুটি লোক আনা। আমি ওকে গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে মনঃস্থির ক'রে ফেলেছিলাম। লোক নিয়ে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সাব-ইন্সপেক্টর শর্মার সঙ্গে দেখা। মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে 'তার' পেলাম। ঐ 'তার, পেয়ে আমি লোকটিকে বললাম, 'আমি আপনাকে সন্দেহ করি' ব'লে যেই তাকে ধরতে গেছি অমনি সে দৌড় দিল। আমিও হৈ-হৈ ক'রে উঠলাম। একজন রেলওয়ে পুলিশ কনস্টেবল উল্টো দিক থেকে আসছিল। একটা গুলীর শব্দ শুনলাম। দেখলাম, লোকটি কনস্টেবলকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়েছে। তারপর আরও দুটি গুলীর শব্দ শুনলাম। সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি মরে পড়ে গেল।"

সাব-ইন্সপেক্টর শর্মা বলল, "নন্দলাল ব্যানার্জির কথায় বাঙালীটি যখন দৌড় দিল, আমি আর কনস্টেবল শিউপ্রসাদ শঙ্কর তার পিছু ধাওয়া করলাম। শিউপ্রসাদ শঙ্কর তাকে ধরে ফেলল এবং আমার হাতের লাঠিটা দিয়ে বাঙালীটির কাঁধে বাড়ি মারল। একটা গুলীর শব্দ শুনলাম, বাঙালীটির হাতে দেখলাম একটা পিস্তল। আর এক কনস্টেবল, জামির আমেদ খান, অন্ম দিক থেকে আসছিল। সে ঐ বাঙালীকে পেছন থেকে জাপটে ধরল, কনস্টেবল শিউপ্রসাদ শঙ্করও ধরল তাকে জাপটে। বাঙালীটির হাত দুটো তার বুকে চেপে ধরা হয়েছিল। এমন অবস্থায়ই সে দু'টি গুলী ছোঁড়ে। অতি দ্রুত, পর পর।" মৃত্যু হাত বাড়িয়ে নিলেন কোলে।

কি সনাক্ত হ'ল কে জানে, একটা প্রতিধ্বনির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে ঃ নন্দলালের উদ্দেশে বাঙলার বিপ্লব সাধনার দ্বিতীয় শহীদ প্রফুল্ল চাকীর শেষ কথা ঃ হা, হা, তুমি বাঙালী হ'য়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দিচ্ছ ?

মজঃফরপুরে ১০ই মে যে অনুষ্ঠান হ'ল ও ধ্বনি উঠল তারও তরঙ্গাঘাত চলতে লাগল ঃ প্রফুল্ল ক্ষুদিরামকে যারা ধরেছে বা ধরবার উপক্রম করেছে তাদের পুরস্কার দিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ; ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন, ইউনিয়ান জ্যাক উঠেছিল। য়ুরোপীয়-দেশী পুলিশের সমারোহ ঘটেছিল। তাকে সচকিত করে ম্যাজিস্ট্রেট ধ্বনি দিলেন হিপ হিপ্ হুররা। সাব-ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জি পেলো ১০০০

টাকা, সাব-ইন্সপেক্টার চতুর্বেদী রামাধর শর্মা, হেড কনস্টেবল শিউশঙ্কর ও কনস্টেবল জামির ৫০০ টাকা করে এবং ফতে সিং, শিউপ্রসাদ মিশির ১২৫০ টাকা করে।

মোকামের প্রফুল্ল চাকীর ধিক্কার আর মজঃফরপুরে পুরস্কারদাতা ও প্রাপকদের উল্লাসধ্বনির একদা সংঘাত ঘটল কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে। এই ১৯০৮-এই, মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে, নন্দলালের নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল ১০ই নবেম্বর। বিপ্লবী আততায়ীদের চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না।

সেদিন সোমবার সাতটা সাড়ে-সাতটায় নন্দলাল ১০নং সার্পেন্টাইন লেনের সি-আই-ডি সাব-ইন্সপেক্টর সুকুমার ব্যানার্জির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। একটা চিঠি ডাকে দিতে হবে। দু'শ গজ এগিয়েছে, এমন সময় মোকামের সেই প্রতিধ্বনি রিভলভারের গর্জনে। দুটি ছায়ামূর্তি, তিনটি গুলী, পড়ে-যাওয়া নন্দলালকে দেখল ঝুঁকে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি একটি গুলীও। শেষ পুরস্কার। হিপ হিপ হুররা! ২০ গজ দূরে মুচিপাড়া থানা। নন্দলালের মুখের আর্তনাদ ঐ গলিটায় ঘুরপাক খেতে লাগল: 'বাপরে বাপ!'

কাজটা 'আত্মোন্নতি সমিতি' ও 'মুক্তি সঙ্ঘ'র রণেন গাঙ্গুলী ও শ্রীশ পাল ওরফে নরেনের। দুজনের হাতে দুটি রিভলভার, সায়নাইড মাখানো দুটি ছোরা। ফ্রেজার হত্যার ব্যর্থতা যেন-না পুনরাবৃত্ত হয়। শিব মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে ওঁরা বাদাম খাচ্ছিলেন। গুলীটা প্রথম করেন শ্রীশ পাল (নরেন) সুনিশ্চিত হবার জন্য রণেন গাঙ্গুলী তাঁর রিভলভার নন্দলালের মাথায় মারেন। রণেন বাড়ি এসে জামাকাপড় বদলান, দরজির দোকানে গিয়ে সার্ট তৈরী করতে দেন, তারপর, আচার্য পি সি রায়কে এসে ঘটনাটা বলেন।

বগুড়ার এক গ্রামে ভাই প্রফুল্লর কাটামুণ্ডুর সংবাদ যেদিন পৌঁছেছিল উপবাস-ক্লিষ্ট দিদি ঘরে খিল দিয়ে মহাভারতের অভিমন্যু বধ পড়েছিলেন; বৃথা যায় নি।

ক্ষুদিরামের মামলা থিতিয়ে থিতিয়ে চলতে লাগল। স্টেশনে পুলিশের কাছে ছোট্ট বিবৃতি দিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উডম্যানের কাছে একটি। দায়রা সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্থুডের কাছে আর একটি; নিজেই বললেন, হ্যাঁ অপরাধী। কোন উকিল ছিলেন না তাঁর পক্ষ-সমর্থনে। স্বীকার না করলে কারও সাধ্য ছিল না ক্ষুদিরামকে দণ্ড দেয়। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, কাছে থেকেই একজন আর একজনকে দেখতে পায় না, ইলেকট্রিকের আলো নয় যে, ঘোর অন্ধকার দূর হয়ে ছিল; আশে পাশে গাছের ছায়া সেই অন্ধকারকে করেছে গাঢ়তর। ঘটনার সময়

পাহারাদার দুটি কাছে-ধারেও ছিল না। যে গাড়ি চালাচ্ছে তার দৃষ্টি সামনে, সইস পেছনে, অকস্মাৎ দুই মূর্তি বোমা ফেলেই দৌড়, খুব কাছে থাকলে নিজেরাই আহত হ'তে পারত ; এই অবস্থায় কোন্ আততায়ীর গায়ে কি রকম জামা ছিল, কার কি রকম চেহারা, কত বয়স সাক্ষীরা সব ঠিক ঠিক ব'লে গেল !! ম্যাজিক নয় ?

ক্ষুদিরাম বার বার বলেছেন, বোমা ছিল একটাই এবং তিনিই সেটা ছুঁড়েছেন। বাইরের একজন সাক্ষী, মিঃ উইলসন নামে এক সাহেব বলেছেন, তিনি পর পর দুটি বোমার শব্দ শুনেছেন। দায়রা আদালতে জজ মিঃ কার্ণডফের সামনে সরকারী কৌঁসুলি মিঃ মানুক বলেছেন, বোমা ছিল দুটি, একটি বড়, একটি ছোট। দীনেশের (প্রফুল্লের) হাতে ছিল একটা বোমা একটা রিভলভার। রিভলভারটা পাওয়া গেছে, বোমাটা পাওয়া যায়নি। তাই থেকে অনুমান, বোমাটা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এবং দ্বিতীয় আওয়াজ তারই, রিভলভারের নয়।

দায়রা আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষে উকিল ছিলেন মজঃফরপুর উকিলসভার কালিদাস বসু। তিনি তাঁর সওয়ালে বলেন, বন্দী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ও দায়রা জজের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি সন্দেহজনক। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দী বলেছিলেন, দীনেশ (প্রফুল্ল) তাঁর সিল্কের জামাটা বন্দীকে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি ওটা অসুবিধেজনক মনে করেছিলেন। বন্দীর কাছে এ ছাড়া, দুটো ভারী রিভলভার ছিল, ত্রিশটা কার্তুজ, ত্রিশটা টাকা কিছু পয়সা ইত্যাদিও ছিল। এসব নিয়েই বন্দী (ক্ষুদিরাম) ধরা পড়েন। পক্ষান্তরে, দীনেশের (প্রফুল্লের) গায়ে একটা ফতুয়া ও ব্রাউনিং পিস্তল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় নি। (চাদর আগেই ফেলে দিয়েছিলেন)। অসম্ভব যে, ক্ষুদিরাম (অত বোঝা নিয়ে) বোমা ছুঁড়েছেন, দীনেশ (প্রফুল্ল) ছোঁড়েন নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে সাক্ষ্য নথিবদ্ধ করেছেন, তাতে দেখা যায়, শাদা জামা গায়ে একজনই বোমা ছুঁড়েছে ; পক্ষান্তরে, ঘটনার আগে ও পরে এবং ক্ষুদিরামের স্বীকৃতিমত তাঁর গায়ে ছিল একটা ডোরাকাটা কালো কোট।

জজ তাঁর রায় দিতে ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারাটির ওপরই জোর দেন। এই ধারামতে যে সঙ্গে থাকে বা প্রকৃত আততায়ীকে সহায়তা করে সে সম-অপরাধী এবং একই দণ্ডের যোগ্য। "সুতরাং, একমাত্র পারিপার্শ্ব ঘটনাক্রম থেকে বন্দীকে দোষী সাব্যস্ত করতে আমার কোন দ্বিধা নেই।" কিন্তু তিনি "স্মারকলিপিতে" যে নোট দেন তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "সোপর্দকারী ম্যাজিস্ট্রেট যেভাবে বন্দীর জবানবন্দী নিয়েছেন তা অনেকটা তদন্ত-জেরার মত হয়েছে এবং ৫৫টি প্রশ্নের মধ্যে

অনেক প্রশ্নই, বন্দী যদি জেরার মুখে সাক্ষী হ'ত, তবে তার উপযুক্ত হ'ত। প্রথমত, এটা কি প্রমাণিত হয়েছে যে বন্দীই বোমাটা ছুঁড়েছেন ? যদি তা না হয়ে থাকে, তাঁর সঙ্গী নিশ্চয়ই তা করেছেন। তবে কি বন্দী ভাঃ দঃ বিধির ৩৪ ধারামতে ঐ কাজের জন্ম দায়ী ? তৃতীয়ত, এটা কি নিঃসংশয় যে, বোমাটা মৃত্যু ঘটাবার জন্মই নিক্ষিপ্ত হয়েছে ? চতুর্থত, এটা কি প্রতিপন্ন হয়েছে যে বন্দী ক্ষুদিরাম যদি বোমাটা না ছুঁড়ে থাকেন, যিনি একাজ করেছেন ক্ষুদিরাম তাঁর সঙ্গী ছিলেন ? জজ শেষ পর্যন্ত বিকল্প ধারামতে (অর্থাৎ ৩৪) ক্ষুদিরামকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ১৩ই জুন।

এই রায়ের বিরুদ্ধে হ'ল আপীল, হাইকোর্টে বিচারপতি ব্রেট (Brett) ও বিচারপতি রিভসের সামনে। আপীলের আবেদনে অপরাধ অস্বীকার করা হয় নি, বন্দী জড়িত নন এমনও বলা হয়নি ; বলা হয়েছে, দীনেশচন্দ্র (প্রফুল্লচন্দ্র) কে রেহাই দিতে ও তাঁর পরামর্শমত বিবৃতি দিয়েছেন তিনি, বোঝার মধ্যে ছিল দুটি পিস্তল ও অন্যান্য জিনিস। নতুন কথার মধ্যে ছিল—'তিনি (ক্ষুদিরাম) পিস্তল ব্যবহার করতে বা বোমা ছুঁড়তে জানতেন না। (খুবই সম্ভব, আবেদনের সব কথা উকিলবাবুরই মুসাবিদা ; কেননা, শেষ কথা আছে, দীনেশচন্দ্র অপরাধীজ্ঞানেই আত্মহত্যা করেছেন।) বিচারপতিগণ অবশ্য উকিলবাবুর প্রত্যেকটি যুক্তি অগ্রাহ্য ক'রেছেন ও দায়রা জজের রায়ই সমর্থন করেছেন (১৩ই জুলাই): মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদিরামের কণ্ঠে ফাঁসী দেওয়া হোক, এই ছিল তাঁর রায়। প্রথমে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দিন স্থির হয়েছিল ৬ই আগস্ট। কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সৌজন্যে ও উকিলের সহায়তায় যাকে বলা হয় 'দণ্ড মকুবের আবেদন' (মার্সি পিটিশন) তা করায় তারিখটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের খবরে প্রকাশ, কে একজন পিসী—না মাসী, একাই এসেছিলেন মেদিনীপুর থেকে দেখা করতে। দেখা হয়নি। লেঃ গবর্ণরের কাছে ক্ষুদিরামের যে আবেদন গেছল তা অগ্রাহ্য হয়েছে। রাজার নামে যে আবেদন যাচ্ছিল তাও আটকে দেওয়া হয়েছে। ১১ই আগস্ট ফাঁসীর দিন স্থির। তারপর। সংবাদ:

মজঃফরপুর, ১১ই আগস্ট

সকাল ছ'টায় ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল। দৃঢ়পদে প্রফুল্লচিত্তে তিনি ফাঁসীমঞ্চে উঠে যান ; মাথার ওপর টুপিটা যখন টেনে দেওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর ঠোঁট জোড়া জুড়ে ছিল স্মিতহাসির দীপ্তি। বাবু কালিদাস বসুর প্রার্থনামত গণ্ডকের তীরে নিঃশব্দ অন্ত্যেষ্টি হ'ল ; শব বাহকের সংখ্যা বিশেষ ছিল না ; কোন হৈ-চৈ হয়নি ; রাস্তার দু'পাশেই পুলিশের সারি—জনতাকে দূরে ঠেলে রেখেছিল।

বাগানবাড়ির যবনিকা উন্মোচন

২রা মে শেষ রাতে মাণিকতলায় মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ঘেরাও হয়ে গেল।

আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির সামনে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টার পি সি বিশ্বাস বললেন, "১লা মে মজঃফরপুর-বিস্ফোরণের খবর পেলাম। ইতিপূর্বে কিংসফোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণ তদ্বিরের জন্য সাব-ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্যকে মজঃফরপুরে পাঠানো হয়েছিল। তিনিও ডি-এস-পি আর্মস্ট্রংয়ের একখানি চিঠি নিয়ে কলকাতায় এসে পড়লেন। গুপ্ত সমিতির সন্দেহজনক স্থানগুলোর একটা তালিকা ক'রে ফেলা গেল। পুলিশ কমিশনারের কাছে নালিশ পেশ করে পরোয়ানাও হস্তগত করা গেল। ঐ রাত্রেই পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে তল্লাসী নিয়ে এক পরামর্শ সভা হ'ল। মিঃ করবেট (Corbett) ও ফ্রিজোনিকে মাণিকতলা বাগানে, মিঃ ফিনিকে (Feeney,) ১৭নং গোপীমোহন দত্ত লেনে, মিঃ ক্লার্ককে 'নবশক্তি' অফিসে, মিঃ ম্যাক রায় (Mac Rai) কে ৩০।৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাউয়েন ও ইন্সপেক্টর হ্যামিল্টনকে ১৩৪নং হ্যারিসন রোডে, ইন্সপেক্টর বামাচরণ ভৌমিককে ২৩নং স্কট লেনে এবং মিঃ ম্যাথিউস (Mathews) কে ৪নং হ্যারিসন রোডে পাঠানো ঠিক হ'ল।"

ইন্সপেক্টর ফ্রিজোনি ম্যাজিস্ট্রেট বার্লির (Birley) কাছে বলেছিলেন, দায়রা আদালতেও জজ সি.পি. বিচক্রফ্‌টের (C. P. Beachcroft) কাছে বললেন, ১লা মে রাত ন'টায় তিনি বাগানবাড়ি হানা দেবার আদেশ পান। ইংরাজিমতে ২রা মে ভোর দুটোয়, বাংলামতে ১লা মে রাত দুটোয় আমার বাড়ি থেকে ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়ির উদ্দেশে রওনা দি। সঙ্গে নিলাম ডি আই জি করবেট, লালবাজারের দশজন ইউরোপীয়ান সার্জেণ্ট, সুকিয়া স্ট্রীট থানার ৫০জন লাঠি-পুলিশ, ওয়াটারলু থানার দু'জন দেশী সাব-ইন্সপেক্টরকে। পৌঁছোতে তিনটে বেজে গেল। চারটের মধ্যে বাগানবাড়ি ঘেরাও হয়ে গেল।" বাড়িটায় ঠিক ঠিক ঢোকেন পাঁচটায়, তল্লাসী শুরু হয় ছ'টায়। "আমাদের হিসেব ছিল ওখানে কুড়ি জনকে পাব। আমাদের কাছে অবশ্য কারও নাম ছিল না, বারীন্দ্রকুমার ঘোষেরও নয়। পাঁচটার সময় বাড়িতে ঢুকে দেখি, বারান্দায় ওঁরা সব একটা তক্তপোষে ব'সে আছেন। কতকগুলো করোগেটেড আয়রণ শীটস (টিন)-এর ওপর দিয়ে আসবার সময় আমাদের ভারি বুটের আওয়াজে সম্ভবত ওঁদের ঘুম ভেঙে গেছল, আমরা ওঁদের

কোন সতর্ক হবার জানান্ দিই নি। ওঁরা এসে তক্তপোষে জড় হয়েছিলেন।" বাড়িটা যেমন ক'রে ঘেরাও হয়েছিল ওঁরা পালাতে পারতেন না। আমরা যখন বাড়িতে ঢুকছিলাম তখন কাউকে দেখলাম না পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন।" কোথায় তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি দেখতে পান নি। (ফ্রিজোনির সঙ্গী ইন্সপেক্টর রায় অবশ্য বলেছেন, তাঁরা যখন বাড়িটায় ঢোকেন তখন ওঁরা কেউ কেউ বারান্দায়, কেউ কেউ বিছানায় শুয়েছিলেন। আমাদের দেখে ওঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেছলেন।) ঘরটার বাইরে ট্যাঙ্কের কাছে মাটিতে কিছু কম্বল ও মাদুর পাতা ছিল। "হঠাৎ বারীন্দ্র জানালা থেকে আমার সামনে লাফিয়ে পড়েন; আমি চমকে উঠি। দরজাটা ভেতর থেকে হুড়কো দেওয়া ছিল। তিনি একটা লাথি মারতেই ওটা দড়াম্ ক'রে খুলে গেল। তল্লাসী চলতে থাকলে দেখি আর একটা ঘরের দরজা বন্ধ; লাথি মেরে খুলেই দেখি, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। এই নিয়ে মোট চোদ্দজনক গ্রেপ্তার করা হ'ল। কাউকেই হাত-কড়া পরানো হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই তল্লাসী আরম্ভ হয় নি। প্রথমে বারান্দাটা হ'ল।" ফ্রিজোনিও বলেছিলেন, ইন্সপেক্টর রায়ও বললেন, এই সময় বারীন্দ্রকুমার কিছু বিবৃতি দিলেন।

ইন্সপেক্টর আরও বলেছিলেন, বাড়ি তল্লাসীর পর আমরা বাইরে আসি। একটা জায়গা সম্প্রতি খোঁড়া হয়েছে লক্ষ্য করে আমরা তা খুঁড়তে শুরু করি। একটা পাত্রের ঢাকনা পেয়ে তা খুলে ফেলি। আমরা বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, ওতে রিভলভার, বোমা ও বিস্ফোরক আছে। ঢাকনা খুলে পাওয়া যায় কাঠের বোমার ছাঁচ।

"পুলিশ কোথাও কোথাও জমি খুঁড়তে লেগে গেল। বারীন্দ্রকুমার আমাদের সঙ্গে ঘুরতে লাগলেন ও যেসব জায়গাগুলো দেখালেন সেসব জায়গা থেকে নানান্ জিনিস উদ্ধার করি। সাতটা সাড়ে সাতটায় সব্বাইকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু বারীন্দ্রের দেখানো জায়গাগুলো খোঁড়াখুঁড়ি করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। একটা জায়গা খোঁড়া শেষ হ'লে বারীন্দ্র আর একটা জায়গা দেখিয়ে দেন। এমনি করে বেলা আড়াইটা হয়ে গেল।

প্লাউডন ও মেজর ব্ল্যাক আসবার পর বারীন্দ্র আমাদের বাড়িটার উত্তর-পূর্ব দিকে এক জায়গায় নিয়ে যান; সেখানে আমরা মাটিতে-পোঁতা একটা বাক্স পাই; মস্ত বড় একটা জিঙ্কের ট্যাঙ্ক। খুঁড়লাম। পেলাম পাঁচ বোতল কার্বলিক এসিড, এক বোতল সালফিউরিক এসিড, ডিনামাইট ভরতি একটা বালতি, একটা চটের বস্তায় কার্তুজের তিনটি পুরো প্যাকেট, নানা ধরণের বুলেট, ২৯টি কার্তুজ। আরও ডিনা-

মাইট, মাইন, দোনলা বন্দুক, একটা গাদা বন্দুক, একটা ব্রিচ লোডিং। এ জায়গা থেকে পাঁচ গজ দূরে আর এক জায়গায়, তিন ইঞ্চি মাটির নীচে একটা চামড়ার আধারে পাওয়া গেল একটা রিভলভার, একটা তাজা বোমা, ১৪টা কার্তুজ। আরও পাঁচ গজ দূরে একটা জায়গা খুঁড়ে পাওয়া গেল, কিছু তুলো ও একটা রিভলভার। আর একটা জায়গায় কাঠের ছাঁচ, তিনটি লোহার বাক্স—আর ৩৩৫৯৮ নং রিভলভার; ১৯১৯ নম্বরের পাঁচ-ঘরা, ৩২০ নং ছ'ঘরা, নম্বরহীন বুলডগ-রিভলভার, একটা সাত-ঘরা, ১২৫৭৯ নম্বরের নিকেল প্লেটের পাঁচ-ঘরা রিভলভার; তিন প্যাকেট মার্কিণ হেনরী কার্তুজ, দুই বাক্স ডিটোনেটর, ১৩ বাক্স কার্তুজ, কাপড়ে বাঁধা দুই বাণ্ডিল কার্তুজ, পিকরিক এসিড, নাইট্রিক বিস্ফোরক সম্পর্কে স্যানফোর্ডের একখানি বই, পাঁচটি নোট বই, ১৩টা প্ল্যান।

"বাগানের খোঁড়াখুঁড়ি শেষ হলে হলঘরে তল্লাসী শুরু হ'ল। তাও দু'ঘণ্টা ধরে চলল। বারীন্দ্র তখন বারান্দায় ছিলেন, আর সবাই কেউ বারান্দায় কেউ সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'একজন বন্দুক বিক্রেতা এসেছিলেন দেখতে তাঁদের খোয়া বন্দুক ফিরে পাওয়া যায় কি না।"

"যে চোদ্দজন এখানে গ্রেপ্তার হলেন তাঁরা—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয়কুমার নাগ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, পরেশচন্দ্র মৌলিক, শচীন্দ্রকুমার সেন, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর আত্মকাহিনীতে বলেছেন: "রাত আটটা। এম্পায়ার খুলিয়া দেখিলাম, মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, কাগজ বলিতেছে, পুলিশ জানে, কোথা হইতে কাহাদের দ্বারা এইসব কাণ্ড ঘটে। শীঘ্রই ইহার একটা কূল-কিনারা হইবে।

"তখনি বাগান ছাড়িয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িবার কথা। কিন্তু সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর হঠাৎ এত মাল-মশলা সরাই কোথায়? স্থির হইল, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সব যে যার পথে চলিয়া যাইবে, এখন সব জিনিস সামলাও। মাল-মশলা উপকরণ তখন আমাদের প্রাণ, কারণ, অস্ত্র যে এই নিরস্ত্র দেশে দুর্লভ বস্তু। তাড়াতাড়ি বাগানেই মাটির তলায় সবই পোঁতা হইল, তারপর অত রাত্রে পরিশ্রান্ত ছেলেরা অনাহারে আর কোথাও গেল না, যে যার বিছানায় শুইয়া পড়িল। প্রত্যূষ আর হইতে পাইল না। পুলিশ আসিয়া রাত্র চারটার সময় মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ঘেরাও করিল। আমি হঠাৎ জাগিয়া দেখি বাগানবাড়ির বাহিরে চারিদিকে খস্‌খস্

মচ্‌মচ্‌ শব্দ হইতেছে।......উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাহিরে পুলিশ। হঠাৎ আমার সেই মরিয়া সাহস কোথা হইতে আসিয়া জুটিল, সামনের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, সামনে দেখিলাম রিভলভার হাতে সার্জেণ্ট।......আমায় চার পাঁচজন পুলিশ ধরিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিল। হুড়মুড় করিয়া কতকগুলি সার্জেণ্ট ও পুলিশ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল এবং একে একে ধরিয়া ছেলেদের লইয়া পুকুরঘাটে আমতলায় বসাইতে লাগিল। বাগানবাড়ীতে দুইটা ঘর। পাশে ছোট ঘরে উপেন কখন কি ফাঁকে পর্দার আড়ালে লুকাইয়া পড়িয়াছিল।......মনে ভগবানের উপর একটা অন্ধ অভিমান জমা হইতেছিল......হঠাৎ একজন সার্জেণ্ট পাশের ঘরে ঢুকিয়া উপেনকে পর্দার পিছন হইতে টানিয়া বাহির করিল।......

"হঠাৎ আমাকে লইয়া তাহারা সেইখানে উপস্থিত হইল যেখানে জিনিসপত্র পোঁতা ছিল। দেখিলাম মাটি খোঁড়া, আমার এত সাধের গোপন করা বোমা, রিভলভার সবই ঊষার আলোয় ট্যাঙ্কের মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছে।...অভিমানে আমার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া অন্তরাত্মা বলিতে লাগিল, 'ঠাকুর! সব ভেঙ্গে দিলে? তবে নাও আমিও রিক্ত হয়ে সব দেব।' সেই রাগে যেখানে যাহা ছিল সব দেখাইয়া দিলাম।...

"লালবাজার হইতে একজন বাচ্চা সার্জেণ্ট সঙ্গে দিয়া আমাকে ডিটেকটিভ অফিসে পাঠান হইল।......প্রায় রাত ১টা অবধি 'দিদিশাশুড়ী' রামসদয়ের জেরা ও আদর সমান বেগে চলিতে লাগিল।

"সব সওয়ালে আমার ঐ এক কথা, উপেন উল্লাস হেমচন্দ্র বিভূতি ইন্দু সবাইকে আন, পরামর্শ করি, তাহার পর বলিব।......পরদিন সকালে প্রথমে উপেন, উল্লাস আসিল। পরামর্শ করিয়া আমরা স্থির করিলাম, আমি, উপেন, বিভূতি ও ইন্দু সমস্তই নিজের ঘাড়ে লইয়া সব স্বীকার করিব।...হেমচন্দ্র আসিল এবং কোন কথাই স্বীকার করিতে রাজী হইল না।...পুলিশ বেগতিক দেখিয়া তাহাকে সরাইয়া লইল। তাহার অনেকক্ষণ পর হঠাৎ রামসদয় একটা কাগজ হাতে আনিয়া বলিল, এই দেখো। সে স্বীকার করেছে। আমরা তো হতভম্ব।...দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া আমাদের লেখা স্বীকার পত্রের বিবরণে তাহারও কীর্তিকলাপ জুড়িয়া দিলাম।...

"...এই প্রকারে আত্মকীর্তি রাখিতে গিয়া খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে সময়ে নরেন গোঁসাইয়ের নাম বলা হইয়াছিল; তাহার শ্রাদ্ধ যে কতদূর গড়াইবে, তখন তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানিতেন, আমরা বুঝি নাই।

"তাহার পর বেলা তিনটার সময় বার্লি সাহেবের কোর্টে—আমরা গাড়ী বোঝাই

হইয়া পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেবের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া বিধিমত আসামী নথি-ভুক্ত হইবার পর—পাত্রসাৎ হইলাম। প্রথমেই আমার পালা।”...

ইতিমধ্যে ১৩৪ নং হ্যারিসন রোডে ধরা পড়েছেন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণীনাথ গুপ্ত, অশোকচন্দ্র নন্দী, বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু; ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীট থেকে অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু; ৩৮।৪ নবকৃষ্ণ স্ট্রীট থেকে হেমচন্দ্র দাস; ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে কানাইলাল দত্ত, নিরাপদ রায়কে; শ্রীরামপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই; এবং হৃষীকেশ কাঞ্জি-লাল প্রমুখ আরও কয়েকজন। এঁরা সব ধরা পড়লেন মে মাসের মধ্যেই। এঁরাই প্রথম দল। দ্বিতীয় দল ধরা পড়েন রাজসাক্ষী হ'য়ে নরেন গোঁসাইর স্বীকা-রোক্তির পর; তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুও। তিনি ইতিমধ্যে অস্ত্র আইনে কারাদণ্ডিত হয়ে ছিলেন। কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন।

আপাতত আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির সামনে ৩১ জনের বিরুদ্ধে প্রাক্-সোপর্দ শুনানী শুরু হ'লে সরকার-পক্ষে মিঃ নর্টন এগারোখানি প্রাথমিক স্বীকারোক্তি দাখিল করলেন। স্বীকারোক্তির তারিখগুলো হচ্ছে, ৪ঠা মে—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিভূতিভূষণ সরকার, নরেন্দ্রনাথ বক্সী; ৫ই মে—নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী; ১১ই মে—সুধীরকুমার সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল; ১৫ই মে—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ; ১৬ই মে—কৃষ্ণজীবন সান্যাল।*

১৩ই আগস্ট ম্যাজিস্ট্রেট বন্দীদের সোপর্দ করার আগে বিধিমত কয়েকটি প্রশ্ন করেন; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ—যাঁরা ৪ঠা মে প্রাথমিক স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন তাঁরা—সেই সম্পর্কে এবং যেসব সাক্ষ্য সাবুদ দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কেও মন্তব্য করতে নারাজ হন। আদালতে তাঁরা যে পরিচয় রাখেন তা এই : বারীন্দ্রকুমার, পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ, বয়স ২৮, জন্ম ক্রয়ডন। তিনি ভারতীয় হিসেবে,না, ইউরোপীয় হিসেবে বিচার চান, ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলে বারীন্দ্রকুমার ভারতীয় রূপেই বিচার চান। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে ৩১ জনের মধ্যে তাঁকে বাদ দিয়ে বাকী ৩০ জনকে দায়রা সোপর্দ করেন; পরে হাইকোর্টের নির্দেশে বারীন্দ্রকেও করেন।

ইন্দুভূষণ রায়, পিতার নাম তারকনাথ রায়, বয়স ১৮ বছর। উল্লাসকর দত্ত, পিতা দ্বিজদাস দত্ত, কালিয়াচক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বয়স ২৯, পিতার নাম রমানাথ ব্যানার্জি, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। শিশিরকুমার ঘোষ, বয়স ২৬, পিতার নাম তারিণীচরণ ঘোষ, সাগরদাড়ি, কেশবপুর, যশোর। নলিনী-

* দায়রা বিচারকালে স্বীকারোক্তিগুলো প্রত্যাহৃত হয়।

কান্ত সরকার, বয়স ২০, পিতা রজনীকান্ত সরকার, ফরিদপুর। শচীন্দ্রকুমার সেন, ১৫ বছর, পিতা যোগেন্দ্রনাথ সেন, সোনারঙ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। পরেশচন্দ্র মৌলিক, ২৮, পিতা যাদবচন্দ্র মৌলিক, রায়নাগড়, থানা মাগুরা, যশোর। কুঞ্জলাল সাহা, ২৭, পিতা রামদয়াল সাহা, মাঝামপুর থানা, কুষ্টিয়া। বিজয়কুমার নাগ, ১৭, পিতা বিপিনবিহারী নাগ, বাসবাটি থানা, বাগেরহাট, খুলনা। নরেন্দ্রনাথ বক্সী, ১৮, পিতা উমেশচন্দ্র বক্সী, বৈদ্যনাথপুর, রাজসাহী, ছাত্র। তিনি বলেন, তিনি আগে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা সত্য নয়, পুলিশের চাপে পড়ে তা দিয়েছিলেন, তিনি নির্দোষ। তিনি কখনও বাগানে ছিলেন না, তাঁকে বাগানের বাইরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পূর্ণচন্দ্র সেন, ১৯, যোগেন্দ্রনাথ সেন, তমলুক, মেদিনীপুর, ছাত্র। হেমচন্দ্র ঘোষ, ১৮, রাইচরণ ঘোষ, সাগরদাড়ি থানা, কেশবপুর, যশোর, ছাত্র। বিভূতিভূষণ সরকার, ২০, পিতা সারদাপ্রসাদ সরকার, শান্তিপুর। নিরাপদ রায়, ১৮, রজনীকান্ত রায়, শান্তিপুর, ছাত্র।

আদালত : (কানাইলাল দত্তকে) আপনি আপনার বয়স ও নাম বলতে অস্বীকার করেছেন ?

কানাই : হ্যাঁ, করেছি।

এবারও তিনি নাম সই দিতে অস্বীকার করলেন।

হেমচন্দ্র দাসকেও নাম জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি তা বলতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আদালতের এ কাজ নয়। জবরদস্তি না করলে তিনি নামও সই করবেন না।

অরবিন্দ ঘোষ, পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ, আদিবাড়ি কোন্নগর, ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, পদত্যাগ করেন। কোন বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতার নাম ও বয়স উল্লেখ নেই, আরাবেলিয়া মেদিনীপুর। কোন বিবৃতি দেন না। শৈলেন্দ্রনাথ বসু, পিতা কেদারনাথ বসু, আরাবেলিয়া, মেদিনীপুর। কোন বিবৃতি দিতে রাজি নন। দীনদয়াল বসু, পিতা ঐ, বয়স ২৪, ঠিকানা ঐ, ট্রাম কোম্পানীর কর্মী। কোন বিবৃতি দেন না। কৃষ্ণজীবন সান্যাল, বয়স ১৮, পিতা কালীকৃষ্ণ সান্যাল, পাংসা, মালদা থানা, শিবগঞ্জ।

আদালতঃ : কিছু বলতে চান ?

হ্যাঁ, আমি আগে যে বিবৃতি দিয়েছি তাতে কিছু ভুল আছে। আমি কখনো বাগানে ছিলাম না। পুলিশ আমাকে দিয়ে ওকথা বলিয়েছে।

আদালত : আগে যখন আপনি বিবৃতি দিয়েছিলেন তখন আমি আপনাকে জিগ্‌গেস করেছিলাম, 'আপনি জানেন আমি একজন হাকিম ? আমার কাছে যা-ই

বলবেন তা-ই আপনার বিরুদ্ধে যাবে ?' তখন আপনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। কেন বলেছিলেন ?

আমি আগে জানতাম না।

আমি জিগ্গেস করেছিলাম, পুলিশ আপনাকে পীড়ন করেছে কি ? আপনি বলেছিলেন, 'না'।

পুলিশের ভয়ে বলেছি, পুলিশ বলিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট তখন বন্দীর বিবৃতিটি পড়ে শোনান এবং বন্দীও পড়ে দেখেন এবং বলেন, পুলিশ আমাকে বুঝিয়েছিল, আমি যদি ঐ রকম বলি তবে আমি ছাড়া পাব। ৪৪-৩ হ্যারিসন রোডে আসা পর্যন্ত কথাটা সত্য, বাকী অসত্য।

হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, বয়স ২১, পিতা অমরনাথ কাঞ্জিলাল, চত্রা, শ্রীরামপুর, শিক্ষক ছিলেন। বারীন্দ্রনাথ বসু, বয়স ১৭, পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু, সাগরদাঁড়ি, যশোর। ছাত্র।

আদালত : ৪ঠা মে আপনি একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন ? তা কি সত্য ?

হ্যাঁ, কিন্তু তা সত্য নয়।

এখন কিছু বলতে চান ? কেন ঐ বিবৃতি দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, আমি নিরপরাধ। আমি কোনদিন বাগানে যাইনি। পুলিশ আমাকে ওকথা বলার জন্য চাপ দিয়েছে।

ধরণীনাথ গুপ্ত, ২১, পিতা গঙ্গাপ্রসন্ন গুপ্ত, বিদগাও, থানা মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। আদালতের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন, আমি নিরপরাধ। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২৭, পিতা ও ঠিকানা ঐ, আদালতের জিজ্ঞাসার উত্তরে একই কথা বললেন।

অশোকচন্দ্র নন্দী, ১৮, পিতা মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কালিয়াচক থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা ত্রিপুরা। ম্যাজিস্ট্রেটের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, আমি নিরপরাধ, পুলিশ যেসব সাক্ষ্য দিয়েছে তা মিথ্যে। সুশীলকুমার সেন, ১৭, কোন বিবৃতিও দেন না, নামও সই করেন না। বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ১৭, পিতা কৈলাসচন্দ্র সেন, বানিয়াচঙ্, শ্রীহট্ট, ছাত্র। তিনিও নিজেকে নিরপরাধ বলেন এবং কোন বিবৃতি দেন না।

এই সময় ফরিয়াদীপক্ষের কৌঁসুলি মিঃ নর্টন বলেন, মাণিকতলা বাগানে বারীন্দ্রের যে জন্ম-প্রমাণপত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, তাঁর জন্ম হয়েছে সাগরে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা দরকার, তিনি ইউরোপীয়ান বৃটিশ প্রজারূপে বিচার ও বিধিমত তদনুরূপ সুবিধে নিতে চান কিনা। ম্যাজিস্ট্রেট শনিবার পর্যন্ত বারীন্দ্রকে একথা ভেবে দেখবার অবকাশ দেন।

১৯এ আগস্ট বারীন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বারীন্দ্রকুমার ইউরোপীয়ান বৃটিশ প্রজার সুবিধে নিতে নারাজ হওয়ায়, ম্যাজিস্ট্রেট বারীন্দ্রকুমারকে ৩০এ এপ্রিল মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের প্ররোচক ও সহায়ক বলে তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে ও এজন্য পৃথক বিচার হওয়া দরকার এই যুক্তিতে আপাতত বাদ দিয়ে প্রথম দলে ধৃত ৩০ জনকে দায়রা সোপর্দ করেন। দ্বিতীয় দল নরেন গোঁসাইর স্বীকারোক্তির পর ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় দলের প্রাক-সোপর্দ শুনানীর তারিখ পড়ল ২৪এ আগস্ট। কিন্তু এ দলে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ইন্দ্রনাথ নন্দী অসুস্থ থাকায় শুনানী তারিখ মত হতে পারে নি। ২৫এ আগস্ট বারীন্দ্রকুমারের বিরুদ্ধে পৃথক 'প্ররোচনা ও সহায়তার' মামলা উঠল। ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এইসব সাক্ষ্য-সাবুদ সম্পর্কে কিছু বলতে চান?' বারীন্দ্রকুমার বললেন 'না'। 'বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র রাখবার যে অভিযোগ এনেছে সে সম্পর্কে কিছু বলতে চান?' 'না'। '৪ঠা মে মজঃফরপুর হত্যা সম্পর্কে আপনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চান?' 'না'। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন, মজঃফরপুরের ব্যাপারে যখন বারীন্দ্রকুমারের বিরুদ্ধে দণ্ডযোগ্য সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে তখন আগে এইটেতেই প্রথম সোপর্দ হওয়া উচিত, পরে যদি ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অভিযোগে তাঁর বিচার হয়, তো হবে। সুতরাং ব্যাপারটা হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট নর্টনের আবেদনক্রমে ম্যাজিস্ট্রেটের কৈফিয়ৎ তলব করেন।

এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এল বার্লি বারীন্দ্রকে সোপর্দ করে এই রায় দিলেন:

"বারীন্দ্রকুমার ঘোষ! আমি, আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট, এল বার্লি, আপনাকে এই ব'লে অভিযুক্ত করছি যে, ১৯০৮এর ৩০এ এপ্রিল নাগাদ মজঃফরপুরের ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশচন্দ্র রায় যে হত্যাপরাধ করেছে, আপনি ৩২ নং মুরারী-পুকুরে এবং অন্যান্য স্থানে থেকে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লকুমার চাকী ওরফে দীনেশচন্দ্র রায়কে ঐ হত্যাকাণ্ড সাধনে প্ররোচিত করেছেন; অতএব আপনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯।৩০২ ধারা-মতে অপরাধ করেছেন। এই অপরাধের বিচার দায়রা আদালতের এক্তিয়ারে পড়ছে। আমি এতদ্বারা ঐ দায়রা আদালতে আপনার বিচারের নির্দেশ দিচ্ছি।"

ওদিকে হাইকোর্টে বিচারপতি সরফুদ্দিন ও বিচারপতি কোক্সের সামনে বারীন্দ্র-কুমারকে ষড়যন্ত্র মামলায় সোপর্দ করার শুনানী চলল। হাইকোর্ট বারীন্দ্রের এই মামলাটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফেরত পাঠালেন। জজ স্থির করলেন, ষড়যন্ত্র মামলা নিষ্পত্তির পর ওটা নেওয়া হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি দ্বিতীয় দলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিলেন, ফরাসী চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ের ব্যাপারটা গবর্মেন্টের গোচরে এনেও তাঁকে অন্যান্যের সঙ্গে দায়রা সোপর্দ করলেন।* এই আদেশের সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসু আদালতে ছিলেন না; তিনি ইতিমধ্যে জেলে নরেন গোঁসাইর হত্যাকাণ্ডে কানাইয়ের সঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন। সত্যেন কিন্তু ইতিপূর্বেই মেদিনীপুর থেকে অস্ত্র আইনে দণ্ডিত হয়েছিলেন; সুতরাং, হাজতী নয়, কয়েদীই ছিলেন। আরও আদেশ হ'ল যে, আলিপুরে যে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলা এসেছে তাতে দ্বিতীয় দলও সংযুক্ত হবে। দ্বিতীয় দলে ছিলেন দেবব্রত বসু, বয়স ২৭; ইন্দ্রনাথ নন্দী, ২৩; নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, ৩৩; যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ৩০, প্রমাণাভাবে ম্যাজিস্ট্রেট এঁকে ছেড়ে দেন; বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৮; বালকৃষ্ণ হরিকানে, ১৯, বাড়ি বেরার।

এই সংযুক্ত মামলার শুনানী উদ্বোধনের আগেই জেলখানায় রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দায়রা সোপর্দ হয়েছিলেন, দায়রায় কানাইয়ের প্রাণদণ্ডাদেশ এবং মতভেদের দরুন সত্যেনের বিষয়টি হাইকোর্টে মূল্যায়নের জন্য এসেছিল। হাইকোর্ট দু'জনেরই প্রাণদণ্ডাদেশ সমর্থন করেন।

১৯০৮এর ১৯এ অক্টোবর আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ সি পি বীচক্রফ্‌টের সামনে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলাটি উত্থাপিত হয়; কিন্তু কতগুলো আনুষঙ্গিক কথাবার্তাতেই এ দিনটা কেটে যায়; এদিন মিঃ সি আর দাশও আসেন নি অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে। বস্তুত, ১৭ই নভেম্বর থেকে আদালতে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায়। ধরণীনাথ গুপ্ত ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সমর্থনে কেউ ছিলেন না। ২১এ অক্টোবর নর্টন ফরিয়াদীপক্ষে মামলার উদ্বোধন করেন এবং অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের প্রসঙ্গই প্রথম তোলেন।

মামলা চলে ১৯০৯এর ১৩ই এপ্রিল অবধি। ৬ইমে বিচারপতি বীচক্রফ্‌ট রায় দেন। অরবিন্দসহ সতেরোজন অব্যাহতি পান। উনিশ জন দোষী সাব্যস্ত হন। ফাঁসীর দণ্ড হয়েছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের, হাইকোর্টের আদেশে (২৩ নভেম্বর ১৯০৯) যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও হেমচন্দ্র দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দায়রা দণ্ড হাইকোর্টে বহাল থাকে। বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বীরেন্দ্র

*পরে এঁকে বৃটিশরাজ ফরাসীরাজের চাপে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

চন্দ্র সেন, সুধীরচন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল ; হাইকোর্টে বিভূতি, হৃষীকেশ, ইন্দুর হয় ১০ বছর করে ; সুধীরচন্দ্র, অবিনাশের সাত বছর করে ; বীরেন্দ্র, ইন্দ্রনাথ নন্দী, শৈলেন্দ্রের ক্ষেত্রে দ্বিমত হ'লে, তৃতীয় দফা বিচারের (১৮ ফেব্রু ১৯১০) বীরেন্দ্রের হয় সাত বছর দ্বীপান্তর, শৈলেন্দ্রের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ইন্দ্রনাথ নন্দী পান মুক্তি ; শিশির-কুমার ঘোষ, নিরাপদ রায়, পরেশচন্দ্র মৌলিকের দায়রায় হয়েছিল ১০ বছর ক'রে দ্বীপান্তর, হাইকোর্টে হয় প্রথম দু'জনের পাঁচ বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড, পরেশের সাত বছর দ্বীপান্তর ; সুশীলকুমার সেন, বালকৃষ্ণ হরিকানে ও অশোক নন্দীর হয়েছিল সাত বছর ক'রে দ্বীপান্তর, সুশীলের ক্ষেত্রে দ্বিমত হওয়ায় তৃতীয় দফা বিচারে, মুক্তি পান ; বালকৃষ্ণ হাইকোর্টে মুক্তি পান ; অশোক ইহলোক থেকেই মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, হাইকোর্টে দ্বিমত হওয়ায় তৃতীয় দফা বিচারে মুক্তি পান।

এখানে কয়েকজনের নাম নেই। প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্রফুল্ল ১৯০৮এর ২রা মে ধরা পড়ার উপক্রম হ'তে আপনহাতে পিস্তলের গুলীতে আত্মহনন করেন, ক্ষুদিরামের ১১ই আগস্ট ফাঁসী হয়, নরেন গোঁসাই আলিপুরে বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে সরকারী দণ্ডের আওতা থেকে মুক্তি পান ; কিন্তু জেলের মধ্যে কানাই ও সত্যেনের গুলীতে পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। কানাইয়ের ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে ফাঁসী হয় ; সত্যেনের হয় ২১এ নবেম্বর শনিবার সকালবেলা।

মঙ্গলবার, ২৩এ জুন ১৯০৮। মিঃ এল বার্লির আদালতে মিঃ নর্টন হুম্ ক'রে বলে বসলেন, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামে একজন আসামীকে তিনি ফরিয়াদী সাক্ষীরূপে দাঁড় করাতে চান। আসামী নরেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে বলল, আমি পুরোপুরি সত্য কাহিনী বলতে প্রস্তুত। ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট একটা ধারা উল্লেখ ক'রে বললেন, তবে তোমাকে ঐ ধারামতে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল।

আসলে নরেন বিশেষ কিছুই জানত না ; সে বাগানবাড়িতেও থাকত না। বারীন্দ্রের বিবৃতিমত তাকে শ্রীরামপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর জমিদার নন্দনের নরম মাটি দেখে পুলিশ বারীন্দ্রপ্রমুখের এগারোখানি প্রাথমিক বিবৃতি, নিজেদের যোগাড় করা কিছু অসমর্থিত তথ্য, কিছু অনুমান এবং অরবিন্দকে প্রধান অপরাধী করবার অভিসন্ধির মশলা মিশিয়ে এক খিচুড়ি গলাধঃকরণ করায় নরেনকে ; তাই সে ক'দিন ধরে অনর্গল উগরে যায় ; অবশ্য তাতে এতদিন

তার অন্যান্য বন্দীর সহবাস থেকে আহৃত কাহিনীগুলোও থাকে। ফরিয়াদী-পক্ষের সৌভাগ্য, নরেনের জেরার আগেই, সত্য মিথ্যা ফাঁস না হতেই, বিপ্লবীদের হাতে তার মৃত্যুদণ্ড হ'য়ে যায়। জেরা হ'লেই যাই অবশিষ্ট থাক তা প্রধানত অরবিন্দ ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য হ'য়ে যেত; সে ঝুঁকি বিপ্লবীরা নিতে চান নি। দণ্ডদানের ভার নিয়েছিলেন দ্বিতীয় দলের সত্যেন ও প্রথম দলের কানাই। নরেনের স্বীকারোক্তিমত ন'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় দলটি তাই থেকেই বিচারের কাঠগড়ায় আসে। বিরক্ত হয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মত নরমপন্থী সংবাদপত্রও বলতে বাধ্য হন :

"কেবল একটি রাজসাক্ষীর কথার ওপর নির্ভর করে ভদ্রলোকদের চালাও ধরে আদালতে হাজির করা অর্থ কেবল যে তাঁদেরই অকারণ দুর্গতি ঘটানো তাই নয়, গোটা সমাজটাকেই তছনছ ক'রে দিয়ে বর্তমানের যে চাঞ্চল্যকে দীর্ঘকালব্যাপী বা তীব্র হতে দেওয়া সমীচীন নয় তাকেই বাড়িয়ে দেওয়া মাত্র।"

সেকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র কলাম ছিল পাঁচটি, এখন আটটি; পাঁচ কলামের দুই কলামব্যাপী শিরোনামা বেশ বড় দেখাতো; এমনি দুই কলামব্যাপী শিরোনামায় 'অমৃতবাজার' পর পর দু'দিন নরেন গোঁসাই হত্যাকাণ্ডের খবর পরিবেশন করলেন; অবশ্য প্রাথমিক সংবাদগুলো শ্রুতিনির্ভর বলে বেশ ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল; একেবারে দায়রা আদালতে না আসা পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনা জানা যায় নি। ৩১এ আগস্টের চাঞ্চল্যকর সংবাদ বড় বড় শিরোনামায় বেরোলো।

জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমার্সন কাছেই থাকতেন, তখুণি এসে পড়েন। চিকিৎসক মেজর চ্যাটার্টনও এসে পড়েন। কিন্তু তিনি আহতদের পরিচর্যা করতে পেরেছিলেন, নরেন গোঁসাইকে নয়; তার প্রাণবায়ু ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।

২৪ পরগণার জেলা ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যথাক্রমে ডবলিউ. এ. মার, এবং মিঃ এল বার্লিকে খবর দিয়ে আনা হয়। তাঁরা এসেই প্রাথমিক তদন্তের পর কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্র নাথ বসুর বিরুদ্ধে গোঁসাইকে হত্যা এবং হিগিন্স ও লিণ্টন নামে দুই ইউরোপীয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডারকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ দাঁড় করান। বেঙ্গল গবর্মেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ ডিউক, পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিশ কমিশনার, গোয়েন্দা বিভাগের রায় রামসদয় মুখার্জী বাহাদুর, ইন্সপেক্টর পার্সি, গুপ্ত—সবাই চলে আসেন। জেলের সব প্রবেশমুখে কড়া নজর রাখা হয়; কাজের জন্য যাদের ঢুকতে দেওয়া হয় তাদের তন্ন তন্ন তল্লাসীও করা হয়। জেলের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন মিঃ স্টুয়ার্ট, তিনি ছুটিতে যাওয়ায়

তাঁর জায়গায় ছিলেন মিঃ উইর (Weir) ; হেড জেলার একজন বাঙালী, নাম যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সে সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল য়্যাংলোইণ্ডিয়ান পত্রিকা "পায়োনিয়ারে" তার প্রতিফলন পাওয়া যায়, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, 'পাওনিয়ারে'র মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে তা কাটিয়ে নেন (শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯০৮ ; এলাহাবাদ থেকে তরা পাঠানো) ঃ

"আলিপুর জেলের হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত হয়ে কলকাতার সংবাদপত্রগুলো তাদের মন্তব্যে যে রকম ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর চোখে পড়ে না। 'ইংলিশম্যান' এই হত্যাকাণ্ডকে বলেছেন 'ব্রুটাল' (নির্দয়, নৃশংস বা পাশব) এবং 'ফাউল' (নীতি-বিরুদ্ধ)। শব্দগুলোর যথার্থ প্রয়োগ করা যেত সেই সব হীন পাপকার্যের ক্ষেত্রে যেখানে শিশুর অলঙ্কার অপহরণের একান্ত কুৎসিত উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়। হত্যা মাত্রেই 'পাশব' (বা নৃশংস) কিন্তু আলিপুর জেলের হত্যা সাধারণ হত্যাপরাধ থেকে কিছু পৃথক। 'স্টেট্‌সম্যান' নির্বুদ্ধিতায় আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে এই হত্যাকাণ্ডকে বলেছেন মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত লোকেদের হাতে একজন নিরস্ত্র মানুষের কাপুরুষোচিত আচম্‌কা হত্যা। অর্থাৎ, ঐ দুই অপরাধীর উচিত ছিল, ঐ ইনফরমারকে (রাজসাক্ষী নরেন্দ্রকে) তাঁদের তৃতীয় রিভলভারটি দেওয়া এবং গুলী করার আগে একটা সতর্ক-সঙ্কেত দেওয়া ; কিন্তু বাঙলাদেশের জেলেও সম্ভবত এই প্রাথমিক ব্যবস্থা করা যেত না। সে যাই হোক্, হত্যাকারীরা যেহেতু দ্বন্দ্বযোদ্ধা নন সেই হেতু এই ধরনের অখ্যাতির ছাপ মেরে দিয়ে বললে অদ্ভুত শোনায় যে, যারা একাজ করেছে তারা তাদের 'বলি'কে সতর্ক ক'রে দেয়নি এবং সেও যাতে যথাযথ অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে তা দেখেনি। 'কাপুরুষোচিত' কাজ এ নিশ্চয়ই নয়। চারধারে প্রাচীর-বেষ্টিত জেলের মধ্য থেকে পালাবার কোন পথ নেই। দুটি মাত্র পথ—হয় আত্মহত্যা নয়তো ফাঁসী। এমন কাজকে বড় জোর বলা যায় বেপরোয়া, কিন্তু একে কাপুরুষোচিত বলা মূর্খতা। হত্যার জন্য যদিও একটাই শাস্তির ব্যবস্থা আছে তবু এর কলঙ্ক-কালিমার মাত্রা আছে এবং সুস্থ বিচারের দৃষ্টিতে আলিপুরের অপরাধ শুভ্রতার প্রান্ত ঘেঁষেছে ব'লে প্রতীয়মান হবে। এ-জাতীয় অপরাধ ভাই করে থাকে। রাজসাক্ষীটি তার নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য তার সঙ্গীদের সমূহ সর্বনাশ ঘটাবে বলে স্থির করেছিল। যাঁদের সর্বনাশ সাধনে সে তৎপর হয়েছিল তাঁদেরই দু'জন স্থির করেছিলেন যে, দায়রা আদালতে তাঁদের গল্প বলার আগেই তাকে অপসারণ করতে হবে। এ হ'ল—তার একটিমাত্র প্রাণ বনাম

অন্য বহু প্রাণ এবং আততায়ী দুজন স্থির করেন যে, অবশিষ্টের রক্ষার জন্য তাঁরা আত্মবলি দেবেন। এ হত্যা, কিন্তু এ আত্মোৎসর্গও বটে। তথাপি, সন্দেহ নেই, আইন তার বাঁধা পথেই চলবে ; সরকারী প্রশাসকেরা যেখানে ঐ রাজসাক্ষীকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে, বিশেষ ক'রে বিচার-ব্যবস্থা, প্রতিশোধ নিতে বাধ্য।

"কিন্তু আমরা যখন নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াই তখন আমরা দণ্ডবিধি-কার্যবিধির গণ্ডীমুক্ত হই। হ্যাঁ, কতগুলো শব্দের বল্মীকে প্রশ্নটাকে ঢেকে না দিয়ে যথার্থ সত্যের আলোকে তার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শ্রেয়তর। আমরা যদি আলিপুর জেলের এই অপরাধকে 'নির্মম' 'কাপুরুষোচিত' ও 'নীতি-বিরুদ্ধ' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগে চিহ্নিত করি তবে যেখানে যৌনলিপ্সার জন্য তরুণীকে হত্যা করা হয় অথবা অশক্ত শয্যাশায়ী বৃদ্ধার সঞ্চিত সম্পদ আত্মসাতের জন্য তাকে হত্যা করা হয় সেখানে কি সব শব্দ প্রয়োগ করা হবে ?

"এরপর বাঙালীরা যদি চান, এই দুটি যুবককে তাঁরা আর এক যুগল হারমোডিয়াস ও এরিস্টোজিটনের মতো * তাঁদের স্মরণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবেন, তবে এই সিদ্ধান্তে কেউ যথার্থ আপত্তি করবেন কি বলে বোঝা মুস্কিল।"

২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডবলিউ এ মার (W. A. Marr) দু'জন ইউরোপীয়ান কয়েদী-ওয়ার্ডার—হিগিনস ও লিণ্টন এবং ময়না তদন্তের ডাঃ ড্যালিসহ উনিশ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে কানাই ও সত্যেনকে দায়রা সোপর্দ করেন। অভিযোগ, বন্দীরা রাজসাক্ষীকে রিভলবার চালিয়ে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯০৮-এর ৩১এ আগস্ট হত্যা করেছেন।

সাক্ষ্য-সাবুদে প্রকাশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২৯এ আগস্ট শনিবার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে কোনক্রমে জেল হাসপাতালে ডেকে পাঠান ; সেখানে তিনি রোগী হিসেবে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে জানান যে, তিনিও রাজসাক্ষী হ'তে চান। ৩১এ তারিখে আবার তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠান। নরেন্দ্রনাথ হিগিনস নামে এক ইউরোপীয়ান ব্যক্তির সঙ্গে সকাল সাতটা কি সোয়া সাতটায়

* হারমোডিয়াস ও এরিস্টোজিটন দু'জন এথেনিয়ান যুবক (খ্রীঃ পূঃ ৫১৪)। এঁরা দু'জন পানাথেনিয়া। উৎসবকালে স্বৈরাচারী শাসক হিপ্পিয়াসের ভাই হিপারকাসকে হত্যা করে। দেহরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গেই হারমোডিয়াসকে হত্যা করে এবং এরিস্টোজিটনও পরে ধৃত ও নিহত হয়। যদিও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত, তবু তাঁরা স্বৈরাচারীসূদন এবং স্বাধীনতার অগ্রদূতরূপে সঙ্গীতে ও ভাস্কর্যে অবিনশ্বর হয়েছেন।

হাসপাতালে এই আশায় আসে যে, সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছু বিবৃতি কিম্বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে। তারা দোতলায় উঠে এসে ডিসপেন্সারিতে ঢোকে। সেখানে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত হন ও নরেন্দ্রর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ হয়, প্রথমে ডিসপেন্সারিতে, তারপর ঘরের বাইরে বারান্দায়। হঠাৎ বন্দীরা দুটি রিভলবার বের করেন ও নরেন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়তে থাকেন। এই নিয়ে বারান্দায় ও ডিসপেন্সারিতে কিছুটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় এবং ইউরোপীয়ান কয়েদী হিগিনস নরেন্দ্রকে রক্ষা করতে গেলে কানাইলাল দত্তের গুলী হিগিনসের এক কব্জিতে এসে লাগে। সিনিয়ার হসপিটাল এসিস্ট্যাণ্ট এবং আরও দুই একজন ছুটে এসে বাধা দিতে সচেষ্ট হলে কানাই তাদের ভয় দেখায় ও গুলী ছোঁড়েন। তখন ঐ এসিস্ট্যাণ্ট শেষ পর্যন্ত জেলার ও অন্যান্য অফিসারকে খবর দেবার জন্য জেল-গেটের দিকে ছুটে যান।

এই হট্টগোলের সুযোগে নরেন্দ্র ও হিগিনস ডিসপেন্সারি থেকে সরে পড়তে সমর্থ হয়, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে যায় এবং হাসপাতাল-গেট পার হ'য়ে জেল-গেটের দিকে ছোটে। জেল-গেট থেকে তাঁতচালির দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর একটা পথ গেছে। ঐ তাঁতচালির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর একটা পথ এর সঙ্গে সমকোণে মিলেছে ; এই পথটি ফ্যাক্টরী (কারখানা) র দুই অংশের মাঝখান দিয়ে উত্তরমুখে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়েছে ; এরই কাছে জেল-গেট ও অফিসগুলো। এই অফিসগুলো বরাবরই নরেন্দ্র ও হিগিনস পালাচ্ছিল। কিন্তু কানাই ওদের পিছু নিয়েছেন, তাঁর পেছনে সত্যেন ; দু'জনের হাতেই রিভলভার ; আরও গুলী চলল। ইতিমধ্যে লিণ্টন নামে আরও এক ইউরোপীয়ান কয়েদী, জেলার, তাঁর কয়েকজন সহকারীও ওয়ার্ডারের সঙ্গে জেল-গেট থেকে আসছিল। তাঁতচালির দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কাছে দুই পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়াল। দু'একজনের ওপর ভর দিয়ে নরেন্দ্র ও হিগিনস টলতে টলতে যাচ্ছিল এবং বন্দী দু'জন তাদের পিছু ধাওয়া করছিলেন। যারা নরেন্দ্রকে উদ্ধারের জন্য আসছিল বন্দীরা তাদের সাবধান ক'রে দিলেন। এরপর কি যে হয়েছিল বলা মুস্কিল, তবে এটা পরিষ্কার যে, যারা নরেন্দ্র ও হিগিনসের উদ্ধারকার্যে আসছিল তারা সব পালালো, ক্ষণকালের জন্য তারা যেন হাল ছেড়ে দিল, ফলে, বন্দীরা তাদের পাশ কাটিয়ে নরেন্দ্রর দিকে ছুটে যেতে পারলেন।

ইউরোপীয়ান কয়েদী লিণ্টন কিন্তু যাহোক, সামনে থেকে অথবা পেছন থেকে সত্যেনকে জাপটে ধরে ফেলে ; কিন্তু ঐ ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় তার কানের পাশ দিয়ে একটা গুলী যাবার শব্দে আঁৎকে ওঠে এবং কোত্থেকে গুলীটা ছুটল দেখতে গিয়ে

লক্ষ্য করে, নরেন্দ্র লাট্টুর মত কিরকম ঘূরপাক খাচ্ছে। সত্যেন্দ্র এই সুযোগে একটা গুলী ছুঁড়লো এবং লিণ্টনের কথামতে ওটা গিয়ে লাগল নরেন্দ্রর গায়ে। নরেন্দ্র স্নানঘরের (বাথ-রুমের) পাশের ড্রেনে (নর্দমায়) হুমড়ি খেয়ে পড়ল ; ওরা তখন ঐদিক দিয়েই যাচ্ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে লিণ্টন সত্যেনের হাতের রিভালভারটা ছিনিয়ে নেয় ও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে লিণ্টনের কথামতে কানাই তাঁর হাতের রিভলভারটা জেলারের দিকে তাগ করে। লিণ্টন লাফ দিয়ে এগোয় ও কানাইকে ধরে ; কানাই তাঁর রিভলভারের বাঁটটা দিয়ে লিণ্টনের কপালে মেরে তাকে ঠেলে দেন। লিণ্টন নীচু হ'য়ে ঘুরে যায় কানাইয়ের পেছনে এবং কানাইকে জাপটে রাখতে চেষ্টা করে ; কিন্তু তার এই প্রচেষ্টার আগেই কানাই নরেন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে আর একটা গুলী ছোঁড়ে। লিণ্টন এবার রিভলভারটা ছিনিয়ে নেয়। দু'জন বন্দীই পর্যুদস্ত হয় ও ওঁদের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। নরেন্দ্রকে মনে হ'ল অচেতন, মুমূর্ষু। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সিভিল সার্জেন কিছু চেষ্টাও করলেন কিন্তু আর কয়েক মিনিটের মধ্যে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। গোটা ব্যাপারটাই কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। সবাই এমন হতভম্ব ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, একজন সাক্ষীও ঠিক একই কাহিনী বলতে পারে নি, স্পষ্টতই অসত্য বলেছে ; অধিকাংশেরই নরেন্দ্রকে রক্ষা করতে এগোনো দূরস্থান পালানোর চেষ্টা ছিল, ফলে তারা কল্পনার জাল বুনেছে। জেলের মধ্যে দুজন মানুষকে রিভলভার নিয়ে আস্ফালন করতে দেখলে এ হওয়াই স্বাভাবিক। ৭টা ৫৫ মিনিটে, অর্থাৎ ঘটনার পর এক ঘণ্টাও কাটেনি, তখনই ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, আমি প্রাক্-সোপর্দ তদন্ত শুরু করি। স্বল্পক্ষণস্থায়ী ঘটনাটি এমনই, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, আমার মতে এই বিবরণ-বৈষম্যের তাই-ই কারণ, লোকগুলো এমনই বিভ্রান্ত ও বেসামাল হয়ে পড়েছিল যে, কিছু গুছিয়ে বলতে পারছিল না। এই অভূতপূর্ব ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে যে যতটা পেরেছে নিজের দিকে টেনে বলতে চেষ্টা করেছে। তবে এই মোদ্দা কথাটা এর মধ্যেও ফুটে উঠেছে যে, জেল হাসপাতালের দোতলায় যাহোক করে নরেন্দ্রকে ওঁরা পেয়েছিলেন, নরেন্দ্র ও হিগিনসকে গুলী করেছিলেন, নরেন্দ্র ও হিগিন্‌স সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাবার পথ খুঁজছিল কিন্তু বন্দীরা পিছু নিয়ে আরও গুলী চালান, নরেন্দ্র মরে ড্রেনে পড়ে যায়।

রিভলভার দু'টো এনে পরীক্ষা হ'ল। ছোটটা থেকে চারটে গুলী বেরিয়েছে ; বড়টা থেকে পাঁচটা ; মোট ন'টা গুলী ছোঁড়া হয়েছে। বড়টা কানাইলালের হাতে ছিল এবং যে গুলীটা লিণ্টন্ তাঁর কান ঘেঁষে যাবার শব্দ শুনেছে সেটিই নরেনের

মৃত্যুর কারণ হয়েছে। কানাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি নরেন্দ্রকে হত্যা করেছেন, সত্যেন্দ্র আপাতত কিছু বলতে নারাজ হন।

রাজসাক্ষী হবার পর নরেন্দ্রনাথকে রাখা হ'ত ইউরোপীয়ান কয়েদী ওয়ার্ডে এবং অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যও সে পেত। কেণ্ডারডাইন লেনের এক তরুণী ধর্ষণের অভিযোগে দশ বছর কারাদণ্ডিত মোরক্রফ্‌ট হিগিনস ছিল কয়েদী-ওভারসিয়ার। জেলের ভেতরে এই জাতীয় কয়েদীরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করত এবং নরেন্দ্র ছিল তার তত্ত্বাবধানে। লিণ্টন ব'লে যে ইউরোপীয়ান কয়েদী তার এক হাজার টাকা তছরুপের দায়ে দণ্ড হয়েছিল। হিগিনস তার সাক্ষ্যে বলেছে, সত্যেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে বারবার ডেকে পাঠায়। শনিবার দুপুরে, কি একটার সময়, নরেন সত্যেনের কাছে যায়, হিগিনস একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, নরেন কথা কয়ে চলে আসে, তার কাছে শোনে যে, সত্যেনও রাজসাক্ষী হ'তে চায়। হিগিনস নাকি তাকে সাবধান ক'রে দেয়। কিন্তু ঘটনার দিন আবার সকালে যেতে চায়, বলে, সত্যেন বলেছে তাকে লিখিত বিবৃতি দেবে। হিগিনস তার জবানবন্দীতে বলে, সে কানাইয়ের হাতে দু'টি রিভলভার দেখেছে, পরে একটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে হাসপাতালের আর এক হাজতী বন্দী ইন্দ্রনাথ নন্দী সেটা কুড়িয়ে নেন। এই নিয়ে অনেক গবেষণা, জেরা, খোঁজ, তল্লাস হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ বলেছে, ওটা বাজে কথা। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকার হিগিনসের কথাটাই ধরে বসে আছেন; অথচ জেলখানায় কোথাও ওটা লুকোনো হলে একদিন না একদিন বেরোতই। আর কানাই ছ'ঘরা বড় রিভলভারের সঙ্গে আরও একটা নিয়ে দু'হাত জুড়তেই বা যাবেন কেন?

দুটো হোক কি তিনটে হোক, জেলখানায় রিভলভার এল, এ নিয়েও কম আজগুবি গল্প ছড়ায়নি। কাঁটালের মধ্যে রিভলভার পাচার করার একটা গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু সেটা গল্পই। কোন স্ত্রীলোক মারফৎ ওগুলো হস্তান্তর হয়েছে, এ গল্পেরও কোন ভিত্তি নেই। সোমবার ঘটনা হয়েছে, তার আগের দিন, রোববার হচ্ছে দেখাসাক্ষাতের দিন। এদিন ৭৫ জন এসেছিলেন বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে। দেখাসাক্ষাতের জন্য একটা লম্বা পৃথক ঘরে সবাই বসেছিলেন। সাক্ষাৎপ্রার্থী আর বন্দীদের মাঝখানে একটা শিকের বেড়ার ব্যবধান। সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের কাছ থেকে বন্দীদের উপহার নেওয়া অনুমোদিত। এক বাণ্ডিল কাপড় শিকের ফাঁক দিয়ে গলানো যায়, ফল মিষ্টি বাদেও। নিষিদ্ধ কেবল তামাক। লম্বা ঘরটা কয়েকজন সাব-জেলারের তত্ত্বাবধানে থাকে। বন্দীরা যেসব জিনিস

নেয় তা খতিয়ে দেখাই নিয়ম। কিন্তু কোন কোন জেলারের পক্ষে হয়তো নব্বই জনের জিনিসপত্র দেখতে হয়; সেকাজে একটু হেলাফেলা হ'তই। এমন-ভাবেই রিভলভার পাচার হয়ে থাকবে। কোন একজন লেখক মিষ্টি বিতরণের এক গল্প ফেঁদেছেন। সব্বাইকে মিষ্টি বিলোনোর নামে প্রহরীদের দৃষ্টি বিভ্রান্তি ঘটিয়ে ওগুলো নাকি পাচার করা হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই সীমিত সংখ্যক লোকের জানা ছিল। কিন্তু ঘটনা প্রকাশের পর অনেকেই জানতেন ব'লে বাহাদুরি নেবার ছলে নানা গল্প চালু ক'রে থাকতে পারেন। আরও একটি কাহিনী আছে। বারীন্দ্রকুমার জেল থেকে সদলে পালাবার জন্য অস্ত্র আমদানী করছিলেন। সেই অস্ত্রেরই দু'টি বা তিনটি তাঁর অজ্ঞাতে হাত-ছাড়া হয়েছে কানাই সত্যেনের হাতে। তাঁর আত্মকাহিনীতে একথার সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং তাঁকে এড়িয়েই যে এই কাণ্ড হয়েছে এই আভাস পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে, শ্রীমতী উমা মুখার্জী তাঁর "টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ"এ এবিষয়ে কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন এবং তিনি দাবী করেছেন যে, তাঁর বই সরকারী ও বেসরকারী মূল সূত্র ও নথিপত্রের ভিত্তিতে লেখা।

এ ছাড়া, লেখিকা ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট চন্দননগরে খোদ শ্রীবসন্তকুমার ব্যানার্জীর কাছে জেনেছেন, চন্দননগর বিপ্লবীদের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হ'ল, রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর প্রাণনাশের জন্য কানাইলাল দত্তের অনুরোধে আলিপুর জেলে দুটি রিভলভার সরবরাহ। চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মতিলাল রায়কে দুটি রিভলভার দিলে তিনি সে দুটি কলকাতায় বসন্তকুমার ব্যানার্জীর হেফাজতে জমা দেন। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও বসন্তকুমার ব্যানার্জী জেলখানায় সে দুটি যথাক্রমে কানাইলাল দত্ত ও উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর হাতে অর্পণ করেন।

কানাইলাল প্রাক্‌সোপর্দ তদন্তকাল থেকেই মামলার ফলাফল সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন ব্যবস্থাই করেন নি। প্রথম জিজ্ঞাসাতে বলেছেন, তিনি আর সত্যেন এ কাজ করেছেন; কিন্তু যখন দেখলেন সত্যেন নিরপরাধ প্রতিপন্ন হবার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত তখন দায়রা আদালতে প্রথম বিবৃতি সংশোধন ক'রে বলেন, আমি একাই একাজ করেছি। ফলে তাঁর মামলা সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়, অর্থাৎ প্রাণদণ্ড, হাইকোর্টের সমর্থনের জন্য গেলে সেখানেও ঐ রায় বহাল থাকে। তিনি কোথাও কোন আপীল করেন নি, আবেদনও করেন নি। তারপর প্রেসিডেন্সি জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার প্রধান জহ্লাদ এ. ই. প্রাইসের হাতের ফাঁস নিজেই পরলেন গলায়, আলিপুর সেণ্ট্রাল

জেলে, ১০ই নবেম্বর মঙ্গলবারের প্রত্যূষে যেমন দৃপ্ত পদক্ষেপ তেমনি বলিষ্ঠ ভঙ্গি। পরাভব মেনেছে মৃত্যু।

শ্রীমতী উমা মুখার্জী তাঁর "দ্য হিরোইজম অব কানাই ডাট্ এণ্ড সত্যেন বোস" (পিপলস পাথ, জলন্ধর, আগস্ট '৬৮)-এ লিখেছেন: "ফাঁসী যাবার আগের সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা গেল, তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাঁর সেলে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আদালত থেকে ফেরার পর তাঁর বন্দী বন্ধুরা যখন তাঁর সেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি তাঁদের অভিবাদন গ্রহণ করছিলেন। রাত্রি ন'টা অবধি বই পড়ে কাটালেন; তারপর সকাল পাঁচটা অবধি গভীর ঘুম। বিছানা ছেড়ে যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সারলেন খুবই শান্ত সাম্যাবস্থায়—যেন অস্বাভাবিক কিছুই হয়নি বা এক্ষুণি কিছু হ'তে যাচ্ছে না। ফাঁসীর ঠিক আগে যখন তাঁকে মৃত্যু পরোয়ানা পড়ে শোনানো হ'ল তখন তিনি অচঞ্চল ঋজুদেহে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জানা যায়, জহ্লাদ তাঁর গলার ফাঁস ঠিক ক'রে দেবে এতে তিনি আপত্তি করেছিলেন এবং অত্যাশ্চর্য স্থিরতা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে নিজেই তা ঠিক করে দিলেন।"

বিরাট এক শোক মিছিল, কমসেকম হাজার দশেক লোকের, তার হাজার পাঁচেকই হবেন মেয়েরা, কানাইয়ের মরদেহ নিয়ে এল কালীঘাটের শ্মশানে। বীরের মুখখানি দেখবার জন্য সেই সহস্র সহস্র মানুষের কি আকুতি। দুপুর সাড়ে বারোটার আগে পুষ্পমালা ও স্তবকে সাজানোই গেল না দেহটি। এলো টিনে টিনে ঘি এবং চন্দনকাঠ। প্রথম থেকে শেষ অবধি রাজোচিত মর্যাদায় ঘি আর চন্দনকাঠের অগ্নিশিখা আপন উজ্জ্বল চিতাঙ্কে অগ্নি-সাধককে আত্মস্থ করলেন। নিকটাত্মীয় পূতাগ্নির উদ্দেশ্যে কল্যাণবাণী উচ্চারণ করলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আকাশ কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠল: 'কানাইলাল কী জয়।

দায়রা আদালতে সত্যেন সম্পর্কে জুরী-জজে মতদ্বৈধ হয়েছিল। পাঁচজন জুরীর মধ্যে তিনজন সত্যেনকে বলেছিলেন নিরপরাধ। জজ মিঃ রো (Roe) তাই চূড়ান্ত অভিমতের জন্য বিষয়টি হাইকোর্টে পাঠিয়েছিলেন। দুই বিচারপতি, সরফুদ্দিন ও কোক্স, তাঁদের দীর্ঘ এক রায়ে সত্যেনেরও মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত করলেন:

"এটা পরিষ্কার যে, সত্যেন্দ্রের প্রবঞ্চনায় প্রলুব্ধ হয়েই হতভাগ্য গোঁসাই মৃত্যু ফাঁদে পা দিয়েছিল এবং অভিপ্রায়ের দিক থেকে সত্যেন্দ্র কানাইয়ের সঙ্গে সমভাবে অপরাধী। তাঁর হাতে ছিল একটা বাজে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র; তাই মনে হয়, গোঁসাইয়ের উদ্দেশে তাঁর সব গুলীই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।...যদিও সাথীর মতই

সত্যেন্দ্রের প্রবল ইচ্ছা ছিল গোঁসাইকে মারবার তবু তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে সে-ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন নি।"

দু'জনেরই মৃত্যুদিন ধার্য হয়েছিল ৯ই নবেম্বর সকাল সাতটা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসু মৃত্যুদণ্ড মকুব ক'রে লঘুতর দণ্ডের আবেদন করেছেন মাননীয় লেঃ গবর্ণরের কাছে এমন একটি খবর বেরোলে "সন্ধ্যা" তার প্রতিবাদ ক'রে জানান, না, সত্যেন্দ্রনাথ নন, তাঁর স্নেহময়ী মা ওটা করেছেন। যাই হোক, এজন্য সত্যেনের ফাঁসীর দিন স্থির হ'ল ১০এর পরিবর্তে ১২ই। কিন্তু যখন মায়ের আবেদন অগ্রাহ্য হয় তখন শেষ দিন স্থির হয় ২১এ নবেম্বর। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আত্মীয়-স্বজন ফাঁসীর পর তাঁর দেহ যেন তাঁদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হয় এই প্রার্থনা জানান। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বমপাস হুকুম দেন তাঁর দেহ যেন জেল-প্রাঙ্গণের বাইরে না যায়। তবে বলা হয়, যদি তাঁরা চান, জেলে-চৌহদ্দিরই কোন উপযুক্ত স্থানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করতে দেওয়া হবে।

সত্যেনের মা এরপর সম্রাটের উদ্দেশে এই মর্মে এক আবেদন করেন যে, প্রিভিকাউন্সিলে আপীল সাপেক্ষে ফাঁসী স্থগিত থাক। জেল কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন যথারীতি বাঙলা গবর্মেন্টের বিচার-বিভাগীয় সচিবের বরাবরে পাঠিয়ে দেন। এদিকে সত্যেনের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যে এটর্নি এজেন্ট মাধ্যমে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের চেষ্টা করছিলেন তাঁরা তারযোগে জানিয়ে দেন যে, এজন্য বিস্তর টাকার দরকার, এত অল্প সময়ের মধ্যে অত টাকা তোলা সম্ভব নয় এবং এই কারণেই আপীল করার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে। সুতরাং, শেষ দিন এল। শনিবার সকালে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জেল-চৌহদ্দি ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু কোন দরকার পড়েনি। কোন রকম বিক্ষোভই হয় নি। ফাঁসী দেখে যাঁরা ফিরে এলেন তাঁরা জেলের গেটের বাইরে জন পঞ্চাশেকের একটা ছোট্ট ভিড় মাত্র। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমার্সন বাঙলা সরকারের বিচার-বিভাগীয় সচিবের একখানি চিঠি দেখান। তাতে ছিল, সত্যেনের মা ভারত সচিবের কাছে দণ্ডমকুবের যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তা তাঁর কানে যথারীতি পৌঁছেছিল; তিনি কেবল ক'রে জানিয়েছেন, বড়লাটের সিদ্ধান্তে তিনি হস্তক্ষেপ করতে অপারগ। ইতিমধ্যে এই মর্মেও একটা গুজব রটানো হয়েছিল যে, যে-যুবকটি ওভারটুন হলে বাঙলার লাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি সত্যেনের আত্মীয়। কথাটা সর্বাংশে মিথ্যা।

ফাঁসীর আগে সত্যেনের শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে মৃত্যুকে কিভাবে শান্তচিত্তে গ্রহণ

করা যায় তাই নিয়ে কথা হয়েছিল। কানাইয়ের দেহ নিয়ে শ্মশানগামীদের উদ্বেলিত মিছিল ও জয়ধ্বনি প্রতাপান্বিত বৃটিশ শক্তিকে এমনই সন্ত্রস্ত করেছিল যে, সত্যেনের দাহ জেলের বাইরে মঞ্জুর হয়নি।

ক্ষুদিরাম ও সত্যেন মেদিনীপুরের। ১৯০৬-এ এক "রাষ্ট্রদ্রোহী" ইস্তাহার বিলির জন্ম ক্ষুদিরাম হয়েছিলেন বন্দী, সত্যেনের গেছল চাকরী। ইস্তাহার বিলির জন্ম ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হ'লে ও মজঃফরপুর বিস্ফোরণের সংস্রবে ১৯০৮-এ হ'ল তাঁর ফাঁসী ; সত্যেন অস্ত্র আইনের অছিলায় কারাদণ্ডিত এবং মাণিকতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত হন। তারপর জেলের বিয়োগান্ত নাটক। এমন মেদিনীপুরকে বৃটিশ শাসকেরা ক্ষমা করতে পারেন ?

মেদিনীপুর-পুলিশ দাবী করেছিল যে, তারা নারায়ণগড়ে ট্রেন ধ্বংস চেষ্টা থেকেই গুপ্ত সমিতির হদিস পেয়েছিল ; কিন্তু ধরেছিল কয়েকটি নিরপরাধ কুলিকে ; তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তিও আদায় হয়েছিল ও হাইকোর্ট অবধি তাদের দণ্ড বহাল ছিল। ঐ পুলিশের আরও দাবী ছিল আবদুর রহমান নামে এক গুপ্তচর সত্যেনের পরিচয়সূত্রে গুপ্ত দলে ছিল এবং মজঃফরপুরের পর মাণিকতলা বাগানবাড়ি ইত্যাদি গুপ্ত আড্ডায় পুলিশী হানার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের আড্ডাগুলোতে হানা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বিপ্লবীদের তারা জালে ফেলবে। দুর্ভাগ্যবশত কলকাতার পুলিশের কোড যিনি উদ্ধার করবেন তিনি সময়মত দুর্লভ হয়ে পড়াতে একই সঙ্গে মেদিনীপুর ছেঁকে তোলা যায়নি। তাই প্রথমে সূচনাটা হ'ল সত্যেন বসু প্রমুখকে অস্ত্র আইনে ফেলে ; কিন্তু খুব শিগগিরই জমিয়ে তুলল এক ষড়যন্ত্র মামলা ; জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনকে বোমা মারবার ষড়যন্ত্র। তিনটি অদ্ভুত জায়গায় বোমাও (বিশেষজ্ঞরা যাকে পটকা বলেছে) পাওয়া গেছল দু তিনটি এবং স্বীকারোক্তিও ততটি। মেদিনীপুরের যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মায় নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁকে সুদ্ধ হাজতবাস করিয়ে ছাড়ল। যারা স্বীকারোক্তি করেছে বলা হয়েছিল, তারা প্রথম সুযোগেই জানিয়ে দিল, পুলিশের চাপে তারা তা করেছে ; তারপর পুলিশের ভরসা রইল এক মাতাল ; সেও বিগড়ে যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে অসত্য কথনের অভিযোগ আনা হয়। শেষ সম্বল পুলিশচর আবদুর রহমান। একে মারবার একাধিকবার চেষ্টা হয়েছে, প্রতিবারই তা ব্যর্থ হয়েছে।

প্রথম দফায় আসর জমাবার জন্য পুলিশ ৩রা মে নাগাদ মিউনিসপাল স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও তার ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে কার্যভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নেলসন (আই. সি. এস.)-এর তত্ত্বাবধানে, জেলার

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ মিঃ কর্নিস, তাঁর ডেপুটি মৌলবী মোজাফ্ফল হক, দু'জন পুলিশ ইন্সপেক্টর, দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর, দুজন হেড-কনস্টেবল ও কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল হানা দিয়ে বাড়িটা তছনছ করে দিয়ে গেল। জ্ঞানবাবুর অপরাধ, আজ অবিচ্ছিন্ন ১৫ বছর ধরে লাইসেন্সবলে তিনি যে দো-নলা ব্রিচ লোডিং বন্দুক রেখেছেন, তা তাঁর কাছে পাওয়া গেছে। তাঁদের দুজনকে, এবং অন্যত্র শরৎচন্দ্র দে ও যোগজীবন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরোও যাঁদের বাড়িতে এমনি তল্লাসী হয়, তাঁরা হলেন—উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল, জমিদার, যোগজীবনের বাবা ; হারাধন মল্লিক, জমিদার, শরৎ দে ওঁর বাড়িতে থাকতেন ; শীতলচন্দ্র মুখার্জী, উকিল; কৈলাসচন্দ্র দে, মোক্তার ; অমৃতলাল রায়, দ্বিতীয় মুন্সেফের পেস্কার, ক্ষুদিরামের ভগ্নীপতি ; পিয়ারীলাল ঘোষ, উকিল (হাইকোর্ট) ; পিয়ারীলাল দাস, অবসরপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রার।

জ্ঞানবাবু জামীন পান। কিন্তু আর তিনজন ক্ষুদিরামকে হত্যার প্ররোচনা দিয়েছেন ও সেকাজে সহায়তা করেছেন এই অভিযোগে জামীন পেলেন না।

শহরের মাঝখানে মাঝারি আকারের এক পুকুর। ধীবরেরা পুলিশের আজ্ঞায় জাল ফেলে পেলো একটা মরচে-পড়া তরোয়াল। অমনি তোলপাড়। আবার জাল, এবার একটা ভাঙা টি-পট। চার পারে চার কনস্টেবল মোতায়েন রেখে নামানো হ'ল ডুবুরি। ফল শূন্য। বেসরকারী ডুবুরিতে বিশ্বাস নেই, এবার সরকারী ডুবুরী। ফল এক। যদিও নাকের সঙ্গে নললাগানো অদ্ভুতদর্শন ডুবুরিকে দেখতে লোকের ভিড় হয়েছিল অনেক। তারপর এল এক ছোট্ট ফেরীবোট ; নতুন ক'রে ডুবুরি নামানো হ'ল। নিষ্ফল। বাকী রইল পুকুরটাকে সেঁচে ফেলার কাজ। সারা শহর জুড়ে গোয়েন্দা নানা বেশে।

অস্ত্র আইনের মামলায়, জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নেলসন একা সত্যেন্দ্রকে অভিযুক্ত করে আর সবাইকে ছেড়ে দেন। ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টনের জেদে আবার তাঁদের তলব করা হয়। পুনর্বিচারে যোগজীবন ঘোষ ও শরৎচন্দ্র দে-কে নেলসন একমাস ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

ইতিমধ্যে আরও এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা হয়। বন্দেমাতরম্'-এ মেদিনীপুরের ১০ই জুলাইর খবরে প্রকাশ, সন্তোষচন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে একটা নাকি তাজা বোমা পাওয়া যায় ; সে একজন শিক্ষানবিশী পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর। সে ছিল হাজারীবাগ পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে এবং অল্প কিছু দিন হ'ল মেদিনীপুরে এসে বসবাস করছে। সে একাজে নিযুক্ত হয় এই প্রতিশ্রুতিতে যে, সে বোমা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে খবর যোগাবে। পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করে; কেননা,

সত্যেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করার পর সে মেদিনীপুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়। নিরাপত্তার খাতিরে সন্তোষ বোমাটা তার ছোট ভাইয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রাখে। পুলিশের বিশ্বাস, আলিপুরে রাজসাক্ষী যে বলেছিল, সত্যেনের কাছে দুটি বোমা আছে, তারই এটি একটি। বোমাটির লক্ষ্য ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন।

ঠাকুরনগর গ্রামে মার্চ মাসে বারোয়ারি মেলায় জুয়া খেলে বহু দরিদ্রের সবনাশ হচ্ছিল ব'লে তাদের নিবৃত্ত করবার জন্য গেছলেন সদলে ইতিহাস-দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক ও এম-এ-বি-এল ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞা। নিজেরা ওটা বন্ধ করতে না পেরে তাঁরা সাহায্য চেয়েছিলেন দারোগার। তিনি কিছুই করেন না। এই নিয়ে "মেদিনী বান্ধব"-এ এক প্যারা মন্তব্য বেরোলে ক্রুদ্ধ দারোগা অধ্যাপক ও আরও দু'জনের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা ও জখমের দায়ে চালান দেন। মহকুমা হাকিম মিঃ জেমসন তাঁদের দশমাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেন। সেই মামলা আসে হাইকোর্টে। ১১ই আগস্ট শুনানীর পর রায় স্থগিত থাকে।

যোগজীবনের দণ্ডের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপীল আসে। বিচারপতিগণ ঐ দণ্ড কেন খারিজ হবে না তার কারণ দেখাবার জন্য মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর রুল জারি করেন। ৬ই আগস্ট হাইকোর্ট মামলা পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠান।

বিচারপতিগণ যোগজীবনের বিরুদ্ধে কারাদণ্ডাদেশ খারিজ করে দেন। কেননা, কোন্ তারিখে সে যে তরোয়াল নিয়ে শহর পরিক্রমা করেছিল পুলিশ তার সুনির্দিষ্ট তারিখ বলতে ব্যর্থ হয়। যোগজীবনের বয়স তখন ছিল ১৫ বছর ১১ মাস।

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের দুর্ভোগের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১লা আগস্ট সম্পাদকীয় স্তম্ভে একে বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে তুলনা করেন। এমন একটি সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ি ছিল না যেখানে পুলিশ সদলে হানা না দেয়। নতুন ক'রে এই সন্ত্রাসের কারণ কি?—না, ডেপুটি পুলিশ সুপারের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও নাকি আর একটা বোমা পাওয়া গেছে।

মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও ব্যারিস্টার মিঃ কে বি দত্ত, ২০ বছর কালের প্রবীণ উকিল অপর্ণাচরণবাবু, ডাঃ ভুবনেশ্বর মিত্র প্রমুখ-জন-প্রতিনিধিরা গেছলেন পুলিশ কমিশনারের কাছে। তিনি তাঁদের মুখেরওপর ব'লে দেন, মেদিনীপুরের পুলিশ নায়কদ্বয়, ডেপুটি সুপার মোজারুল হক ও ইন্সপেক্টর লালমোহন গুহ যা করছেন বেশ করছেন। তিনি এই ভদ্রলোকদের জন-প্রতিনিধি ব'লে স্বীকারই করলেন না। ১৫ই আগস্ট থেকে পুলিশের সাজানো 'মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয়ে

যায়। ২৪এ আগস্ট আদালতে যে দুটি স্বীকারোক্তি হয়েছে ব'লে পুলিশ বলেছে তার নকল চাওয়া হলে সেই প্রার্থনা ফরিয়াদীপক্ষের এই যুক্তিতে অগ্রাহ্য হয়ে যায় যে, ওগুলো এখনো খতিয়ে দেখা হয়নি এবং এখনই তা প্রকাশ পেলে পুলিশ তদন্তে ব্যাঘাত ঘটবে। ৩১এ আগস্ট দিন পড়ে।

পুলিশী সন্ত্রাস শহর থেকে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে যখন 'মেদিনীবান্ধব'-সম্পাদকের বাড়ি তল্লাসী হয়। মেদিনীপুর শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে শিরোমণি গ্রামে তাঁর বাড়ি। পরিবারটি খুবই প্রাচীন।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিদিন বিস্তারিত খবরের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' একটি, কখনও দুটি, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ,উপরন্তু প্যারা লিখেছেন। ব্যাপারটি এমনই ভয়াবহ হয়েছিল। মেদিনীপুরের পত্রিকা-সংবাদদাতা ২৮এ আগস্ট লিখলেন: মেদিনীপুরবাসীদের বড়ই দুঃসময় যাচ্ছে। রাতের অন্ধকার কাটবার আগেই পুলিশ শহরের বহু বাড়ি ঘেরাও ক'রে ফেলে এবং প্রত্যুষ থেকেই তল্লাসী ও গ্রেপ্তার শুরু ক'রে দেয়। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও অনুগত প্রজা তাঁরা। বাবু উপেন্দ্রনাথ মাইতির বয়স ৪৮, জজ কোর্টে একজন প্রথম সারির উকিল, উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধেয় এবং এঁরই উদ্যোগে সরকারের কাছে সাজানো মামলা সম্পর্কে তদন্তের জন্য অনুরোধ জানানো হয়; তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-ব্রাডলি বার্টে'র কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণও উপস্থিত করেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আর আছেন বেশ বড় জমিদার বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র, 'দুর্ভাগ্যবশত' তিনি গত বছর মেদিনীপুর-সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত সিভিলিয়ান ও বাংলার বি এন দে'র বিলাতে পড়ায় সহায়তা করেছিলেন। বাবু খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী; বাবু যামিনীনাথ মল্লিক, বড় জমিদার, মেদিনীপুর-সম্মেলনে রাসমঞ্চ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর সাক্ষ্য দেবার কথা ছিল; বাবু গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী, উকিল; বাবু মন্মথ কর, জমিদার, বাবু দেবদাস করণ, 'মেদিনীবান্ধবে'র সম্পাদক।

সুরেন্দ্র ও সন্তোষের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ে পুলিশ কি করেছে, সন্তোষের ভাই আশুতোষ, সন্তোষের ভাগে জ্যোতি, সুরেন্দ্রর ভাই উপেন্দ্র সেই সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিয়েছে। লোকে শুনে চমকে উঠেছে যে, রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের প্রাসাদে তল্লাসী হয়েছে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে মেদিনীপুরেও আনা হ'য়ে গেছে।

ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মোজাম্মেল হক ১৯০৮-এর ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৪।৫।৬নং ধারা অনুসারে অভিযোগ দায়ের করলেন ১৫৪ জনের

বিরুদ্ধে। তাঁরা হলেন: অখিলচন্দ্র সরকার, আশুতোষ দাস, নবীনচন্দ্র পেত্তাল,* যামিনীনাথ মল্লিক, প্রমথনাথ বসু, কালীচরণ বসু, গজেন্দ্রনাথ সরকার, পূর্ণানন্দ চ্যাটার্জী, অভয়চরণ কুণ্ডু, পরাণ চাবড়ি, হেমচন্দ্র কুণ্ডু, পরিতোষ দাস, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুরেন্দ্রনাথ বসু, রাখালচন্দ্র পাল, সারদা নাগ, রাধানাথ পতি, জগন্নাথ ভকত, অতুলচন্দ্র বসু, পরেশনাথ চক্রবর্তী, আশুতোষ কুণ্ডু, মন্মথনাথ বসু, খগেন্দ্র ওরফে রমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, নটবর দত্ত, মন্মথনাথ কর, গোবিন্দচন্দ্র মুখার্জী, হরেন্দ্রনাথ সরকার, মতিলাল মুখার্জী, সত্যচরণ কর, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শশীভূষণ লাহা, হরিকৃষ্ণ পাত্তেল, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক, মনমোহন সিং, গিরা বেনিয়া, যতীন্দ্রনাথ দাস, গোষ্ঠবিহারী দে, সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, গোবিন্দ পাল, রঘুনাথ সাহা, জয়হরি বেরা, নিবারণচন্দ্র মিত্র, গোঁসাইদাস ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, কুঞ্জ মিস্ত্রী, রামচরণ নন্দী, নন্দ রায়, আনন্দচরণ পাল, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, আশুতোষ দত্ত, শিব বেরা, আশুতোষ দে, ভুবনচন্দ্র মাল, আশুতোষ রায়, সরোজরঞ্জন পাল, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, যোগীন ঘোষ, গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী, হেমচন্দ্র কর, সতীশচন্দ্র রায়, ভোলা ভকত, বিজয় দত্ত, কিষাণ সাহা, বরদাপ্রসাদ দত্ত, সত্যচরণ কর, শীতলপ্রসাদ রায়, মন্মথনাথ মিত্র, শৈলানন্দ সেন, রামমোহন সিং, চারু বসু, ভূদেব দাস, মন্মথনাথ, আশুতোষ সেন, পূর্ণচন্দ্র দে, মন্মথনাথ পাল, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্র মাইতি, বিভূতিভূষণ দত্ত, অমূল্য বসু, লাবণী দে, পিয়ারী ডাক্তার, জ্যোতি সিং, অন্নদাপ্রসাদ দে, বারীন পাল, সুরেশচন্দ্র দাস, অম্বিকা শিকদার, চুনীলাল দত্ত, কার্তিক সেন, অমরচন্দ্র রায়, নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত, দেবদাস করণ, উমাচরণ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মিত্র, হারাধন রায়, রামচরণ সাহা, যদুনাথ সাহা, রাসবিহারী বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগজীবন ঘোষ*, ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শম্ভুনাথ রায়, কৈলাসচন্দ্র দাস, গঙ্গাধর ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সন্তোষ দাস, যতীন্দ্রনাথ সেন, জ্ঞান ব্যানার্জী, মন্মথনাথ নাগ, উপেন্দ্রনাথ মাইতি, হারাধন মল্লিক, বিনোদ সাহা, প্রসন্ন সাহা, রাজকুমার সিং, শরৎ চাবড়ি, জগদীশচন্দ্র চৌধুরী, আশুতোষ ভুঞা, ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী, মধুসূদন দত্ত, সত্যচরণ মুখার্জী, রাজেন্দ্র ব্যানার্জী, শ্রীনারাণ পাল, শশীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, কুমুদ ঘোষ, তসাদ্দক খান, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, মিহিরচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ

---

*ইংরাজি বানান, কোথাও Pattel কোথাও Pettal উচ্চারণ জানিনে।

*ইংরাজি বানান, কোথাও Jogjiban কোথাও Jagajiban. ভ্রান্তি মার্জনীয়।

দাস, মাণিক দাস, সত্যচরণ রক্ষিত, মণীন্দ্র ঘোষ, ভরতচন্দ্র চ্যাটার্জী, অতুলচন্দ্র বসু, অনুকূল চন্দ্র ব্যানার্জী,গোলক ঘোষ, প্রসাদচন্দ্র মিত্র,সুকুমার রায়,রতন ওরফে ভূপতি মল্লিক, যোগী সাহা, নিবারণ কুণ্ডু, উপেন্দ্র সরকার, সতীশচন্দ্র দাস, হীরালাল সেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল খান শ্যামলাল সাহা, সারদাপ্রসাদ দত্ত. ত্রৈলোক্য পাল, প্রকাশ মাইতি পিয়ারীলাল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রভাসচন্দ্র দত্ত।

এঁদের মধ্যে আছেন, 'রাজা', জমিদার, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, মুহুরি, পেস্কার, ডাককর্মী, কেরানী, মেডিকাল ছাত্র, আইনের ছাত্র, এমনি ছাত্র, সূত্রধর, দোকানদার, টীকাদার, কর্মকার, ওভারসিয়ার, টাউট, রেলকর্মী, ঘড়ি-মেরামতকার, ঔষধ-বিক্রেতা, পূজারী ব্রাহ্মণ, স্বর্ণকার, ড্রইংমাস্টার, শিক্ষক, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ও সঙ্গীতকার।

এঁদের বাসস্থান হচ্ছে মীরবাজার, মাণিকপুর, কর্ণেলগোলা, কেরাণীটোলা, চিড়িমারসই, শিববাজার, পাহাড়ীপুর, সুজাগঞ্জ, বল্লভপুর,ওলিগঞ্জ, কোতয়ালীবাজার, বাঁকুড়া, বিবিগঞ্জ, নূতন বাজার, ছোটবাজার, হবিবপুর, কোতবাজার, নবীনাগঞ্জ, মঙ্গলটোলা, বেগমপাড়া, পিঙ্গলা, বাড়মাণিকপুর, নাড়াজোল ও সঙ্গৎবাজার।

অভিযোগ ছিল, ঐ ১৫৪ জন মাঝে মাঝেই নিম্নোক্ত জায়গায় মিলিত হয়ে সভা করতেন ঃ বসন্তমালতী আখড়া, মল্লিকদের রাসমঞ্চ,কামিনী গণিকালয়,গঙ্গারাম দত্তর বাড়ি, গোপালচন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়ি, যামিনী মল্লিকের বাড়ি, মহিষাদল রাজার বাড়ি, দেবদাস করণের বাড়ি, উপেন্দ্র মাইতির বাড়ি, সারদাচরণ দত্তের বাড়ি, ত্রৈলোক্যনাথ পালের বাড়ি, অধরচন্দ্র রায়ের বাড়ি, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাড়ি, রাজবালা গণিকালয়, এসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. দে'র বাড়ি, ডাঃ অমরচন্দ্র সরকারের বাড়ি, উমেশচন্দ্র দত্তের বাড়ি, হনুমানজীর মন্দির, বক্সীবাজারে ময়ূরভঞ্জের রাজবাড়ি, দেবদাস করণের লক্ষ্মী প্রেস ও লালদীঘি। খবর পেয়ে অস্ত্রোদ্ধারে প্রথম তল্লাসী হয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শরৎ দে, যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষ দাস ও বরদাপ্রসাদ দত্তের বাড়ি; প্রথম তিন জায়গায় ৩রা মে. বাকী দু'জায়গায় যথাক্রমে ৮ই ও ৩১ জুলাই। প্রথম তল্লাসীর ফলে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তার তালিকা দেওয়া হ'ল, অস্ত্র আইনে সত্যেন্দ্র, যোগজীবন ও শরৎ দে'র বিরুদ্ধে মামলা হয়; সত্যেনের দু'মাস, বাকী দুজনের একমাস করে কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টের আপীলে যোগজীবন মুক্তি পান।

বলা হয়, এই মামলায় ২৯এ জুলাই ও ১৫ই আগস্ট যথাক্রমে সন্তোষ দাস ও সুরেন্দ্র মুখার্জী নিজেদের ও সবাইকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন। মেদিনীপুর তল্লাসীর

স্কুলে দুটি তাজা বোমা, একটা সন্তোষ দাস আর একটা বরদাপ্রসাদ দত্তের বাড়িতে, পাওয়া গেছে। সাক্ষ্যসাবুদে প্রকাশ, ওগুলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার জন্তই রাখা হয়েছিল।

স্টেট্‌স্‌ম্যানের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে পুলিশের ক্রিয়াকলাপের বহুবিধ যৌক্তিকতার মধ্যে এই দৃঢ়বিশ্বাসও হকসাহেব ব্যক্ত করলেন, তাঁকে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র হয়েছিল এই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। পুলিশ মামলা সাজাচ্ছে এমন কথা তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

জেলাজজ পর্যন্ত আটক ব্যক্তিদের জামিন দিতে অস্বীকার করলেন।

লেঃ গবর্ণরের কাছে নাগরিকরা যে অভিযোগ পত্র পাঠিয়েছিলেন তা তো তিনি অস্বীকার করলেনই এবং পুলিশদের প্রশংসাছলে নাগরিকদের তিরস্কারও করলেন:

'পুলিশের নামে অস্পস্ট অপযশ-কীর্তন, তাদের কাজে অসূয়া ও তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের প্রতি কর্ণপাত করবার সময় এ নিশ্চয়ই নয়। ক'লকাতায় ঘৃণ্য ও বিপজ্জনক বোমা ষড়যন্ত্র আবিষ্কারে তারা যে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করেছে তা আপনাদের এবং আরও সকলের স্বতঃই স্বীকার করা উচিত। এই ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত শাখা-প্রশাখাগুলো খুঁজে বের করা দরকার এবং এই-ই পুলিশের বিশেষ কাজ। সচরাচর যাদের ওপর সন্দেহের ছায়াপাত হ'ত না তাদের সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ জেগেছে ব'লে তাদের কাজে বাধা দেওয়া যায় না। পরিস্থিতি অসাধারণ এবং যেসব ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রে জড়িত তারা সাধারণ চোর-ডাকাত নয়।"

সন্তোষ দাস যে স্বীকারোক্তি করেছিল ও প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছে তা প্রকাশ পেল। সুরেন্দ্র মুখার্জীর স্বীকারোক্তিও। হাইকোর্টে নাড়াজোলের জামিনাবেদন এল এবং অন্ত আর সব্বার পক্ষেও, এক সুরেন্দ্র বাদে। নাড়াজোলের রাজাসহ মাত্র ছ'জন জামিন পান, বাকী সব্বার আবেদন নামঞ্জুর হয়। এর পর গোটা ব্যাপারটাই বিচারপতি কোক্সকে নিয়ে গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চের সামনে এল। দুই বিচারপতির মতানৈক্য হ'ল; কিন্তু বিচারপতি মিত্র সিনিয়ার ব'লে তাঁর রায়ই বলবৎ হ'ল। তিনি তাঁর রায়ে বললেন: এখানে চার দফা আবেদন আছে; প্রথমটি যামিনী মল্লিক ও আর পাঁচ জনের তরফে, দ্বিতীয়টি অখিলচন্দ্র সরকার ও আর ন'জনের তরফে; তৃতীয়টি সন্তোষচন্দ্র দাস ও সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর তরফে এবং চতুর্থটি অবিনাশচন্দ্র মিত্রের তরফে। তিনি বলেন, নিম্নতর আদালতে প্রাক্-সোপর্দ তদন্তের যে নথিপত্র তিনি পেয়েছেন তাতে হাজতীদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই প্রতিপন্ন হয়নি।

কয়েকজন বেশ সম্ভ্রান্ত ও পদমর্যাদাসম্পন্ন ; তাঁদের কাছ থেকে যদি বেশ মোটারকমের জিম্মাদারি চাওয়া হয়, তাঁদের পালিয়ে যাবার কোন আশঙ্কা নেই। প্রথম আবেদনের তিনজনই মেদিনীপুর আদালতের উকিল, আর সবাই কেউ জমিদার, কেউ মোক্তার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের। এঁদের কারও কারও বিরুদ্ধে কিছুমাত্র সাক্ষ্য নেই ; অন্যান্যের বিরুদ্ধেও যা আছে তা ঐ সন্তোষ ও সুরেন্দ্রের প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তিতে। আমাদের কাছে যেসব নথিপত্র পেশ করা হয়েছে তাতে হাজতীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দোষী বলবার মত কোন সঙ্গত যুক্তিই নেই। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন বটে আছে, কিন্তু দেখান নি। সন্তোষ ও সুরেন্দ্রের প্রত্যাহৃত স্বীকারোক্তি ছাড়া প্রথম এজাহারেও কোন সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং, আমার অভিমত এই যে, বেশ মোটারকমের দুটি সমপরিমাণ জিম্মাদারিতে উপেন্দ্রনাথ মাইতি, যামিনীনাথ মল্লিক, মন্মথনাথ কর, খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপালচন্দ্র ব্যানার্জি ও নলিনীকান্ত সেনগুপ্তকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া উচিত। জামিন-জিম্মাদারির পরিমাণ ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁর ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক ক'রে দেবেন। আমার এই মন্তব্য দ্বিতীয় আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই আবেদনকারীদের কারও কারও বিরুদ্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ নেই, অন্যান্যের বিরুদ্ধে যাওবা আছে তা অতি তুচ্ছ। হয়তো এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পদমর্যাদাসম্পন্ন নন, কিন্তু সেরকম বৈষম্য তো আমরা করতে পারিনে। এঁদেরও যথাযোগ্য জিম্মাদারিতে জামিন দেওয়া উচিত। কিন্তু তৃতীয় দফার আবেদনকারী সন্তোষচন্দ্র দাস ও সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী স্বীকারোক্তি করেছেন, তাঁরা অপরাধী নন এরকম প্রমাণ তাঁরা উপস্থিত করতে পারেননি ; অতএব তাঁদের জামিনাবেদন অগ্রাহ্য করা হ'ল। চতুর্থ আবেদনকারী অবিনাশচন্দ্র মিত্রের বিরুদ্ধেও এযাবৎ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আসেনি ; তাঁকেও যথাযোগ্য বিভিন্ন জিম্মাদারিতে জামিন দেওয়া উচিত। (১লা অক্টোবর, ১৯০৮)

শেষ পর্যন্ত, ৯ই নবেম্বর জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রীডের সামনে মামলা উঠলে এডভোকেট জেনারেল মিঃ সিং ঘোষণা করেন যে, তিনি সন্তোষ, সুরেন্দ্র ও যোগজীবন বাদে আর সকলের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরণ আইনের মামলা প্রত্যাহার ক'রে নিচ্ছেন। এডভোকেট জেনারেল আদালতকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানারকম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছে ব'লে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। পুলিশের কাছে রাখালের যে বিবৃতি তা কোন সাক্ষ্য নয়—যদিও সুরেন্দ্র ও সন্তোষের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহৃত হ'লেও সে যাদের জড়িয়েছে তাদের সকলের বিরুদ্ধেই বিবেচনাযোগ্য। পারম্পরিক সাক্ষ্যে সমর্থিত অভিযোগগুলোই

কেবল আমি আনতে পারি; কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তা যথেষ্ট নয়। আমি এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনে যে, আমি অন্য কারও বিরুদ্ধে মামলা চালাব না। সারদা, বরদা ও মধুসূদন দত্ত একই বাড়িতে যৌথ পরিবারে বাস করেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছিনে যে, তাদের একান্ত হেফাজতে বোমাটা ছিল; আর, একটা বোমা পাওয়াও যথেষ্ট সাক্ষ্য নয়। আমি ঝগড়াঝাঁটির উদ্দেশ্যে শুনানীর মূলতুবি প্রার্থনা করিনি। আমি চেয়েছি সন্তোষ ও সুরেন্দ্রের বিরুদ্ধে অন্য সব অভিযোগ আনতে। আর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

তবে রাখালকেও তিনি ছাড়বেন না; আদালতে কতগুলো বিবৃতি দেবার জন্য তাকেও পৃথকভাবে অভিযুক্ত করবেন।

পত্রিকা লিখেছেন ঃ

"কিন্তু আমরা সবিনয়ে একথাটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, তিনি কি করে তাঁর সকল নিন্দার ঝুড়ি ঢেলে দিলেন কেবল ঐ হতভাগা মাতাল রাখালের মাথায়? তার কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাকে তো পুলিশই ওৎ পেতে থেকে ধরে গুপ্তচর বানিয়েছে। এডভোকেট জেনারেল কিন্তু মেদিনীপুর কেলেঙ্কারির কর্তাব্যক্তিদের একটুও তিরস্কার করলেন না। আমাদের বন্ধুবর মৌলবি সাহেব এখন কোথায়? তিনি কি এখনও মেদিনীপুরেই? না-কি তিনি ছুটি নিয়ে স্বদেশে চলে গেছেন? তিনি না রাজার বিরুদ্ধে মামলার সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং বড়াই ক'রে বলেছিলেন যে, তাঁর (নাড়াজোলের রাজার) বিরুদ্ধে তাঁর (মৌলবির) কাছে এমন প্রমাণ আছে যে, তিনি (রাজা) নিশ্চিত দোষী সাব্যস্ত হবেন?···"

এই ক'রে, ওয়েস্টন, মৌলবী, লালমোহন গুহ গয়রহ দুটি পটকা ধরে মাণিকতলা বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলার চাইতে যে বৃহত্তর মামলার রঙিন ফানুস তুলেছিলেন তা এক মুহূর্তেই এডভোকেট জেনারেল চুপ্‌সে দিয়ে গেলেন, শুধু রইল ক্ষুব্ধ মেদিনীপুরের অন্তর বহ্নিমান।

১৯০৯-এর ৩০এ জানুয়ারি দায়রা বিচারে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে সন্তোষ দাসের দশ বছর সশ্রম ও সাত বছর দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাত বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়; কিন্তু হাইকোর্টের আপীলে (১৯০৯, ১লা জুন) নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। যোগজীবন ঘোষেরও ষড়যন্ত্রের অপরাধে দশ বছরের দ্বীপান্তর হয়; ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই আগস্ট তিনিও হাইকোর্টের আপীলে মুক্তি পান।

১৯১২. খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর মামলায় পুলিশের গুপ্তচর আবদুর রহমানকে হত্যা করবার এক নিদারুণ চেষ্টা হয়। চন্দননগরে তৈরি পিকরিক

এসিডের এক বোমা যে-ঘরে আবদুর রহমান সচরাচর শুতো তা লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া হয়। ও ঘরে তার মেয়ে শুয়ে ছিল। বোমাটা প্রচণ্ড বিদারণে দেওয়ালে গর্তের সৃষ্টি করে, কিন্তু কারও জীবনহানি হয়নি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর আরও একবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। আবদুর রহমান মহরমের মিছিলে যাচ্ছিল। বোমাটা একই জাতের হলেও ফাটেনি।

এরপর ষোলো বছর একটানা বিরতি।

১৯৩০-এর ৩রা জুন চেচুয়াহাটে পিকেটিং চলছে। দাসপুরের বড় দারোগা ভোলানাথের রাজানুগত্যে কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। অতএব ভোলানাথ সদলে উপস্থিত; চারজনকে গ্রেপ্তার করলেন। কিছু কথা কাটাকাটি হতেই ভোলানাথ একজনকে বেতপেটা করেন। কনস্টেবলরা বেপরোয়া লাঠি চালাতে লেগে যায়। বহ্নিমান আগুন দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে। ভোলানাথ 'হাটুয়া' মারে জর্জরিত হয়ে মারা যান। সহকারী অনিরুদ্ধও গুম্‌। পাইকারী হারে গ্রেপ্তার হ'ল। পরে সতেরো জনের বিরুদ্ধে মামলা; দায়রায় ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, পাঁচ জনের দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। হাইকোর্টে আপীল হ'লে আটজনের যাবজ্জীবন থেকে সাত বছর কারাদণ্ডে হ্রাস পায়, তিন জনের দু'বছর, চার জনের মুক্তি হয়।

প্রায় এক বছর পরে। ১৯৩১ এর ১৭ই এপ্রিল। মেদিনীপুর কালজিয়েট স্কুলে হচ্ছে প্রদর্শনী খেলা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডি আমন্ত্রিত। তিনি শিকার থেকে ফিরে সোজা এসেছেন এখানে। একটা ঘর ঘুরে দেখে আর একটা ঘরে ঢুকছেন এমন সময় মুখোমুখি দুই যুবক। মুহূর্তে তাদের রিভলভার ছুটল। সন্ধ্যা রাত্রির কোলে এলিয়ে পড়েছে। সাড়ে সাতটা। পেডি অচেতন; দেহের তিন জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। মেদিনীপুর হাসপাতাল, কলকাতা থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে ডাক্তার নার্স। তখন ভোর আড়াইটা। বুলেট বেরোলো একটা। বিকেলে সাড়ে পাঁচটার পর আর রাখা গেল না খোঁজ নেই আততায়ীদেরও।

এর পরের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাস খুব নিঃশঙ্কচিত্তে আসেন নি। কিন্তু নিয়তি। ১৯৩২-এর ৩০এ এপ্রিল, এ তারিখটাও এক বছর পর। বিকেল সাড়ে পাঁচটা। জেলা বোর্ডের মিটিং। কাগজপত্র হাতের চালনায় নড়ছে। অকস্মাৎ পাঁচ-ছ' হাত দূরে দূরে দুই পাশে দুই কৃতান্ত। একই সঙ্গে দুই আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন। হাত বুক তলপেটে গুলী ভেদ করেছে। ন'টা পঁয়তাল্লিশ, শেষ।

কিন্তু এবারকার দ্বিতীয় অঙ্কটা প্রথম নাটকের মত নয়। একজন মিলিয়ে

গেলেন যেন কোথায়। আর একজন ধরা পড়লেন একটা পোড়ো ঘরে। প্রদ্যোতের কাছে কার্তুজভরা রিভলভার পাওয়া গেল। একটা গুলীও চলেনি। কার্তুজ ছাড়া আর পাওয়া গেল দু' টুকরো কাগজ। একটিতে : 'হিজলী বন্দী নিবাসে * অমানুষিক অত্যাচারের সামান্য প্রতিবাদ'; দ্বিতীয়টিতে : 'আমাদের প্রাথমিক পাটীগণিত।'

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে ফাঁসীর আদেশ হ'ল ১৯৩২-এর ২৫এ জুন। ফাঁসীর দণ্ড শুনে মাকে লিখছেন প্রদ্যোৎ :

"আমি যে আজ মরণের পথে যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য কোন শোক করো না। আমার ভাইদের বলো যে, আমার অসমাপ্ত কাজের মধ্যে আমার হৃদয় রেখে গেলাম। আমার জন্য দুদিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশি তর্পণ করা হবে।...... আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন করছি, তাতে মন আমার কানায় কানায় ফুটে উঠছে, মন খুশিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে।"**

হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে; ১৯৩৩-এর ১২ই জানুয়ারি মেদিনীপুর জেলে প্রদ্যোতের ফাঁসী হয়ে যায়।

ডগলাসের পরে এলেন বি. ই. জে. বার্জ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। ফুটবল খেলার বাতিক ছিল খুব। ১৯৩৩এর ২রা সেপ্টেম্বর এক ফুটবল প্রতিযোগিতা; বার্জও খেলবেন কথা আছে। মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত আর অনাথবন্ধু পাঁজা একটা বল নিয়ে মাঠে নেমে গেলেন। মাঠে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন। বার্জের সঙ্গেও দুই দেহরক্ষী। মৃগেন, অনাথ বল গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে বার্জের কাছে উপস্থিত; অমনি গুলী; পাঁচ আর তিন=আট। প্রত্যেকটি অব্যর্থ। বার্জের দেহ নিমেষে লুটালো ধরণীতে। মৃগেনের ওপর পুলিশ দঙ্গল, মারের চোটেই মৃগেন মারা গেলেন হাসপাতালে। অনাথ মার খাননি কিন্তু হয়েছে পুলিশের গুলীতে মৃত্যু। তারপরও ট্রাইবিউনাল। বিচারের বাণী শুনলেন এগারোজন বন্দী :

১৯৩৪এর ১০ই ফেব্রুয়ারি : রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর

---

* হিজলী বন্দীশালায় সেপাইদের আচমকা গুলীচালনায় বন্দী সন্তোষ মিত্র ও বন্দী তারকেশ্বর সেন নিহত এবং বহু বন্দী আহত হন। রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

** শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্র লিখিত 'শহীদ প্রদ্যোৎকুমার; শ্রীকালীচরণ ঘোষ কৃত 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬২ থেকে পুনরুদ্ধৃত।

চক্রবর্তীর মৃত্যুদণ্ড; সনাতন রায়, নন্দদুলাল সিংহ, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেনগুপ্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; চার জনের মুক্তি। হাইকোর্টে সব দণ্ডই বহাল (১৯৩৪, ৩০ আগস্ট)। ২৫এ অক্টোবর ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণের এবং ২৬এ নির্মলজীবনের ফাঁসী হ'ল মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। ঢাকা জেলে সুকুমার সেন করেছিলেন অনশন, পুরস্কার ৩০ ঘা বেত। শান্তিগোপাল সেন পরে ধরা পড়েন। ১৯৩৪ এর ২১এ ফেব্রুয়ারি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আপীল করেন নি।

বছর আটেক পর ১৯৪২ এর ১৭ই ডিসেম্বর 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৃটিশ শাসনের স্তম্ভস্বরূপ মহিষাদল, তমলুক, নন্দীগ্রাম, বৃন্দাপুর, পটাশপুর, ভগবানপুর, পূর্বলক্ষ্যা, সবঙ্গ থানা, কেশপুর, কাঁথি, কানাইদীঘি, বাসুদেবপুর, গোপুর থানা, সরিষাবাড়িয়া প্রভৃতি থানা আক্রমণ অথবা ঐ সব এলাকায় পুলিশের গুলীতে,প্রহারে বা অন্য কোন সূত্রে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের পূর্ণ তালিকা দুর্লভ; তাঁদের একটি ভগ্নাংশের মাত্র নামোল্লেখ সম্ভব হ'ল: মাতঙ্গিনী হাজরা, শশীবালা দাসী, কনকলতা বেরা, যামিনীকান্ত কামিলা, অনন্তকুমার পাত্র, শশীভূষণ মান্না, সুরেন্দ্রনাথ কর, আশুতোষ কুইলা, ক্ষুদিরাম বেরা, ভোলানাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, সুধীরচন্দ্র জানা, প্রসন্নকুমার ভুঁঞা, পঞ্চানন দাস, দ্বারকানাথ দাস, গুণধর হাণ্ডা, সুরেন্দ্রনাথ মাইতি, যোগেন্দ্রনাথ দাস, রাখালচন্দ্র সামন্ত, আশুতোষ কুইলা, প্রফুল্ল কুমার বাগ, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, জীবনচন্দ্র বেরা, পুরীমাধব প্রামাণিক, রামচন্দ্র বেরা, ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ভানু রাণা, ভূতনাথ সাহু, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বিহারীলাল হাজরা, গৌরহরি কামিলা, গান্ধার সাহু, কেদারনাথ জানা, মুচিরাম দাস, অখিল গিরি, ভগীরথ রথ, মুরারীমোহন বেরা, যুধিষ্ঠির জানা, বিভূতি দাস, রামচন্দ্র দাস, রঘুনাথ মণ্ডল, তারকনাথ জানা, উপেন্দ্রনাথ জানা, গৌরহরি কামিলা, রজনীকান্ত মাইতি, শ্যামাচরণ মাইতি, জগন্নাথ পাত্র, ভূপতি দাস, শ্রীনাথচন্দ্র প্রধান, হরিচরণ বেরা, হরিপদ মাইতি, পরেশচন্দ্র জানা, ভারতচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানদা মাইতি, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তি, ভূষণ সামন্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দাস, বিপিনবিহারী মণ্ডল, চন্দ্রমোহন দিন্দা, হরেকৃষ্ণ ধর, ভজহরি রাউত, বংশীধর কর, চন্দ্রমোহন জানা, হেমন্তকুমার দাস, চৈতন্যচরণ বেরা, বৈশ্চরণ মহাপাত্র, শিবপ্রসাদ, চন্দ্রমোহন দাস, সর্বেশ্বর প্রামাণিক, রামপ্রসাদ জানা, রজনীকান্ত ঘোষ, রামকৃষ্ণ ঘোষ, অনন্তকুমার পাত্র, সুরেন্দ্রনাথ ধাড়া, হরেকৃষ্ণ জানা, অমূল্যকুমার শাসমল, ব্রজগোপাল দাস, রামেশ্বর বেরা, ভূষণচন্দ্র জানা, নিরঞ্জন জানা, পূর্ণচন্দ্র মাইতি, সর্বেশ্বর জানা, অমূল্যচরণ গড়াই, গোবিন্দচন্দ্র গড়াই, গৌরহরি গড়াই, ব্রজমোহন জানা, হরেকৃষ্ণ জানা, সর্বেশ্বর জানা, রাখালচন্দ্র দাস ও ন'কড়িচরণ দাস।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত ও শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া ছিলেন এই সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালকদের মধ্যে প্রথম সারির নেতা।

শোধবোধ

১৯০৮এ মহাকাল লিখেছেন বাঙলার লাট এণ্ডরু ফ্রেজারের প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা। কালের গর্ভে ওয়াই এম সি এ'র ওভারটুন হল বিলীন হয়ে গেছে; সেখানে আজ ব্যাঙ্ক আর দোকান। কিন্তু ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় আছেঃ একদা ১৯০৮-এর ৮ই নবেম্বর কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে ওভারটুন হলে (দোতলায়) চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্নেস্ট-ডি উইট বার্টন (Earneste de Witt Burton) 'আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্রমবিকাশ' (Growth of University Education in America) সম্পর্কে সন্ধ্যা ছ'টায় বক্তৃতা দেবেন এবং সভাপতিত্ব করবেন স্যার এণ্ডরু ফ্রেজার। হ'ল ভরতি লোক। ছ'টার একটু আগে এলেন এ-ডি-সি ক্যাপ্টেন ক্যাম্বেল ও বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বাঙলার লাট। এসো-সিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ বারবার হ্যারিসন রোডের দিকে গেটটায় তাঁকে অভ্যর্থনার জন্ম ছিলেন এবং এঁদের নিয়ে হলের দিকে এগোতে লাগলেন। যেই তাঁরা হলের চৌকাঠ পেরিয়েছেন অমনি এক বাঙালী যুবক সম্মুখ সারির চেয়ারগুলোর একটি থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়েন; এইখানটা পার হয়েই লাটসাহেবকে বক্তৃতামঞ্চে ওঠবার সিঁড়িতে যেতে হবে; যুবকটি তাঁদের দিকে ছুটে যান এবং এণ্ডরু ফ্রেজারের ছ' ইঞ্চি কি এক ফুটের মধ্যে এসে পড়েন, একটা রিভলভার বের করে ফ্রেজারের বুক সমান ধরে ট্রিগার টেপেন। ত্ব'বারের একবারও গুলী বেরোলো না। মিঃ বারবার লাটসাহেবের সামনেই ছিলেন; যুবকের হাত ধরে ফেললেন এবং রিভলভারটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। কিছু ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'ল, আরও ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন; রিভলভারটা ছিনিয়ে নেওয়া গেল। পুরোনো ধরনের পাঁচ-ঘরা রিভলভার। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে যুবক ও বারবার ত্বজনই কিছু চোট পান। ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন; ফ্রেজার স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি ও আরও কারও কারও সঙ্গে পাশের ঘরে চলে এসেছেন। যুবককে পুলিশের হাতে অর্পণ করার পর উত্তেজনা প্রশমিত হয়, লাটসাহেব হলে পুনঃপ্রবেশ করেন এবং সংক্ষেপে বক্তার পরিচয় দেন। সভা চলে।

পুলিশের বর্ণনামতে যুবকটির বয়স ২৫, বেশ শক্তিমান, নাম জে চৌধুরি (জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরি; থানায় নাম বলেছিলেন 'জীবনচন্দ্র চৌধুরি, ঠিকানা

শ্যামপুকুর এলাকায় ৫নং চৌধুরি লেন, মামা ক্ষেত্রমোহন বসুর বাড়ি, সেখানে তল্লাসী চালিয়ে কিছু পাওয়া গেল না)। জিতেনের পিতৃগৃহ ২৪ পরগণার আরাবেলিয়া, পিতা বসিরহাটের উকিল। জিতেন পাঁচ বছর ধরে কলকাতায় আছেন।

দায়রা আদালতে জিতেনের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অন্যান্যের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা এই মামলায় সাক্ষ্য দেন।

মহাকাল একালেই লিখেছেন নন্দলালের মৃত্যুদণ্ড।

আর, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কপালে জুটল ১৮১৮ রেগুলেশনে অকারণ নির্বাসন দণ্ড।

১৯০৯ এর গোড়াতেই (৫ই জানুয়ারি) যেমন হ'ল সাতটি সমিতি বে-আইনী বলে ঘোষিত, তেমনি সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের নিধন-পর্ব। ভাগ্যের পরিহাস, আশুতোষের আততায়ীর নাম ও তাঁর পুত্রের নাম এক: চারুচন্দ্র।

চারুচন্দ্র বসুর জন্মকাল থেকেই ডানহাতের আঙুলসমেত তালু ছিল না। বিকল হাতে গুলীভরা একটি রিভলভার বেঁধে গায়ের কাপড় জড়িয়ে তিনি এলেন শিকার সন্ধানে। আলিপুর পুলিশ কোর্টে পেয়েছেন কিন্তু ঠিক বাগে পাচ্ছেন না। চারটে বেজে কুড়ি মিনিট হ'য়ে গেল। আশুতোষ আদালতের পুব-দরজা দিয়ে বেরোলেন, বাঁক ঘুরে বারান্দার দক্ষিণ পানে চললেন, দক্ষিণ-পুব কোণে এসে পৌঁছেছেন। রাহু চলেছে পেছনে, আশুতোষের পিঠে ছায়াপাত হ'ল রাহুর। চারুচন্দ্র বিকল হাতের রিভলভারটা তুলে বাঁ হাতে তার ঘোড়া টিপলেন। অব্যর্থ। তবু আশুতোষ যন্ত্রণায় ছুটলেন পশ্চিমমুখো ; চারুচন্দ্র নিরস্ত হন নি, তেমনি কাছে আর একটা গুলী ছুঁড়লেন। বহুদিনের নিত্যসঙ্গীপ্রায় কাছারি ঘরটায় ঘুরপাক খেয়ে কোর্ট ইন্সপেক্টরের কামরার কাছে দড়াম করে পড়লেন। সেই শেষ। ১৯০৯-এর ক্যালেণ্ডারে তারিখটা ছিল ১০।

ইতিমধ্যে চারুচন্দ্রকে জাপটে ধরেছে এক কনস্টেবল। চারু আর একটা গুলী চালালেন। এটি ব্যর্থ। আরও কনস্টেবল এসে গেল।

চারুচন্দ্র পরিষ্কার গল্প ব'লে গেলেন। তিনি নিঃসঙ্গ, তবে অজ্ঞাতক এক ঢাকা-বাসী পাঁচকড়ি সান্যাল মারণাস্ত্রটি দিয়েছেন। আর লটারিতে তাঁর নাম উঠেছে আশু-হত্যার। কে করেছে কারা করেছে লটারী, দক্ষিণ-পাণিহীন বিপ্লবীর মুখ থেকে তার কোন কথাই বের করা গেল না।

আসলে চারুচন্দ্রের কলকাতায় কেটেছে বারো বছর। ছিলেন ১৩০ নং রসা রোডে। হাওড়ার 'হিতৈষী প্রেসে' কাজও করেছেন কিছুদিন। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। আর কিছু খবর জানা যায়নি। প্রাক্-সোপর্দ তদন্তকালে চারুচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন ঃ আশু বিশ্বাস দেশের শত্রু; মিথ্যা সাক্ষ্যে নিরীহ দেশপ্রেমিকদের শাস্তি-বিধানই ছিল তার কাজ।

অপ্রয়োজনবোধে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন উকিল নিয়োগ করলেন না, বললেন, এই নিয়তি, আশুর মৃত্যু আমার হাতে, আমার হবে ফাঁসী। চারুর তর্ সয় না। দায়রায় ফাঁসীর হুকুম শুনে তাঁর জিজ্ঞাসা, কালই তো? কিন্তু হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বার জো নেই। হাইকোর্টে দণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বহাল হ'ল ২রা মার্চ; ১৯এ চারুচন্দ্রের ফাঁসী হয়ে গেল।

হাইকোর্টে মাণিকতলা বাগানবাড়ি ষড়যন্ত্র মামলার আপীল। ১৯০৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সামসুল আলম ছিলেন ঐ মামলার তদ্বিরকার। সিডিসান কমিটি রিপোর্টে তাঁকে বলা হয়েছে শুধু ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ড অব পুলিশ; Two Great Indian Revolutionaries-এ তাই, আর, বন্ধনীতে সি-আই-ডি; 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'-এ পুলিশ ইন্সপেক্টর; 'অবিস্মরণীয়'-তে ডেপুটি কমিশনার। এই সামসুল আলম সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাজ-কর্ম সেরে ফেললেন ১৯১০-এর ২৪এ জানুয়ারি। এবার বাড়ি ফিরবেন। পুবদিকের সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। তাঁর সামনে এডভোকেট জেনারেল, জি এইচ বি কেনবিক, আর পেছনে সশস্ত্র দেহরক্ষী। সামসুল নামবার জন্ম প্রথম ধাপে পা বাড়িয়েছেন ['অবিস্মরণীয়'-তে আছে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলেছেন] এমন সময় সম্মুখে এক যুবক; তাঁর হাতে রিভলভার। ['অবিস্মরণীয়'তে নাম করেই আছে, সেই যুবক সামসুলকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনিই সামসুল আলম কিনা। উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে···আমাদের কালেও এমন একটা কিম্বদন্তী ছিল ঃ 'আপনি মিঃ আলম?' 'হ্যাঁ'। 'তাহলে আপনার পুরস্কার নিন।' 'Are you Mr. Alam'? 'Yes' 'Then take your reward'.' কিন্তু এতখানি সংলাপ কি সম্ভব?] যুবকটি মুহূর্তে রিভলভার তুলে প্রায় আলমের গা ছুঁয়ে রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলেন। আলম আর্তনাদ করে উঠলেন—পাকড়ো। আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের ছড়িটা আততায়ীকে মারবার জন্ম সান্ত্রীকে দিলেন, কিন্তু নিজে পড়ে গেলেন এবং সেই শেষ। [অবিস্মরণীয়'-তে আছে ঃ সশস্ত্র কনস্টেবল ভয়ে তখন থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন।]

যুবক—বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত—সিঁড়ি দিয়ে নামতে কোন বাধা পাননি। পুবের

দরজাটা বন্ধ ও বাইরে জনতা। একটা গুলী ছুঁড়তে ভীড় সরে গেল। এবার দরজা পার হয়ে রাস্তায় পড়তেই দৌড়। কিন্তু পিছু নিয়েছে ঘোড়সওয়ার। একটা গুলী ছুঁড়লেন বীরেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল এবং ধরা পড়ে গেলেন। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আনুষ্ঠানিক তদন্তের পর বীরেনকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করলেন। ১৮।১৯ বছরের যুবক। প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের বয়সী। উকিলের প্রয়োজন বোধ করলেন না। জুরি জজ একমত—মৃত্যুদণ্ড (জানুয়ারি ৩১, ১৯১০)। উদ্ভাসিত উজ্জ্বলমুখ বীরেন উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন কয়েদী গাড়িতে। বিমর্ষ হয়েছিলেন শুধু সেইদিন যেদিন পুলিশ কারসাজি ক'রে তাঁকে জানালো, তাঁর সম্বন্ধে যাঁরা খবর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [শ্রীমতী উমা মুখার্জী লিখেছেন, না, নামটা হবে জ্যোতিন্দ্র (Jyotindra) নাথ মুখোপাধ্যায় ; সিডিশন কমিটি রিপোর্টে আছে Jatindra Nath Mukherjee]। বিহ্বলচিত্তে বীরেন যতীনের নির্দেশটা মেনে নেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে যায়। [একটা শাদাকাগজে বীরেনের জবানবন্দী লিখে নেওয়া হয়।—অবিস্মরণীয়] যতীন মুখোপাধ্যায়কে জড়িয়ে প্রেসিডেন্সি জেলেই এক মামলা শুরু হয়। এ সম্বন্ধে তিনটি বইয়ে তিনরকম আছে ঃ

(১) যতীন্দ্রনাথ এ-সময়ে 'হাওড়া গ্যাং কেস'-এর আসামী, জেল হাজতে দিন কাটছে।…যতীনের আত্মীয়দের কাছে খবর গেল। পরদিনই মামলা। যতীনের ব্যারিস্টারকে বলা হ'ল বীরেনকে জেরা করতে। ব্যারিস্টার আপত্তি জানালেন—মক্কেলের কাছ থেকে তিনি কোন বিবরণই শোনার সময় ও সুযোগ পাননি। হাকিম নাছোড়বান্দা। বীরেনের ফাঁসীর দিন আসন্ন। মামলা খানিকক্ষণ মুলতুবী রাখা হ'ল। ব্যারিস্টার ও পুলিশ কমিশনার ছুটলেন ছোট-লাটের কাছে ফাঁসীর দিন পিছিয়ে দেবার জন্য। তাঁরা বিফল হলেন। যথাকালে বীরেনের ফাঁসী হয়ে গেল (২১এ ফেব্রুয়ারি ১৯১০)। বীরেনের একতরফা জবান-বন্দী সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা সম্পর্কেও হাইকোর্ট সায় দিতে পারেননি। পরে পুলিশের অপকর্ম বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।—"জাগরণ ও বিস্ফোরণ"।

(২) ফাঁসীর আগের দিন পুলিশ একটি নকল খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় শ্রীযতীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দীর মাধ্যমে শ্রীদত্তগুপ্তের নামে নানারকমের কুৎসার পরিচয় ছাপিয়ে…দেখান হ'ল যেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় তাঁর বিরুদ্ধে একথা বলেছেন। তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হ'ল যে, যদি তিনি বলেন যে, যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি একাজ করেছেন তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। বীরেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। 'তিনি এ ব্যাপারে কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়

হয়ে পড়েন। তাঁর এ সাময়িক ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে পুলিশ কৌশলে একটি সাদা কাগজে ২০এ ফেব্রুয়ারি তাঁর নাম সই করিয়ে নিলেন। কিন্তু সে কৌশল কাজে লাগল না। এ স্বীকারোক্তি প্রমাণের জন্য তাঁর সাক্ষ্যের প্রয়োজন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁর জেরা হবে কিন্তু ফাঁসীর দিন ২১এ ধার্য হয়ে গেছে। পুলিশের কর্তারা শেষ চেষ্টার জন্যে ছুটলেন গভর্ণরের কাছে যদি তাঁর অনুমতিতে দু'চারদিন ফাঁসী স্থগিত থাকে। গভর্ণর পুলিশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ না বুঝেই সরাসরি তা' প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, হত্যাকারীকে একদিন বেশী বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়।

—অবিস্মরণীয়

(৩) শ্রীমতী উমা মুখার্জী কিন্তু সরাসরি বলেছেন, "১৯১০ এর ১৪ই জানুয়ারি সি-আই-ডি পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামসুল আলমের হত্যায় জ্যোতীন্দ্র বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি কেবল যে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর সহকারী সতীশ সরকার মারফৎ কলকাতা অনুশীলন সমিতির তরুণ সদস্য বীরেন দত্তগুপ্তকে দিয়ে কাজটা সমাধা করিয়েছিলেন।

"সামসুল আলমের হত্যা প্রশাসন-কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রস্ত এবং হতবিহ্বল ক'রে দেয়; এবং এই হত্যার পেছনে আসল মাথা ধরে নিয়ে ১৯১০-এর ২৭এ জানুয়ারি সকাল-বেলা জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখার্জীকে গ্রেপ্তারও করা হয়—১৯১০-এর ৩০এ জানুয়ারি ছেড়ে দেওয়া হয়···আবার গ্রেপ্তার করা হয়—ডাকাত দলের লোক ব'লে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়···তারপর ১৯১০-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। বীরেন দত্তগুপ্তের কোন একটা বিবৃতির সূত্র ধরে, বীরেনের ফাঁসীর ঠিক একদিন আগে, ১৯১০-এর ২০এ ফেব্রুয়ারি, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদভারপ্রাপ্ত মিঃ সুইনের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি জেলে এক আদালত বসিয়ে জ্যোতীন্দ্র-নাথকে আলম হত্যায় জড়াবার একটা শেষ চেষ্টা হয়। কিন্তু মামলাটি হতে পারেনি; কারণ, জ্যোতীন্দ্রনাথের পক্ষ-সমর্থক ব্যারিস্টার জে এন রায় তীব্র প্রতিবাদ জানালেন বিনা নোটিশে তাঁকে কোন সাক্ষীকে যেন পিস্তল উঁচিয়ে জেরা করবার জন্য আহ্বান করায়—যখন তিনি কয়েক মিনিট আগেও জানলেন না তাঁর (জ্যোতীন্দ্রের) বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এবং মক্কেলের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হ'ল না।" (টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ)।

'ভূতের বাড়ি'—ঢাকা

সিডিশন কমিটি লিখেছেন : ১৯০৮-এ ঢাকার 'ভূতের বাড়ি'তে ঢাকা অনুশীলন সমিতির ভবনে তল্লাসীর ফলে পুলিনবিহারী দাসের একখানি চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিটায় তারিখ নেই। তাতে লেখা ছিল : অনুশীলন সমিতির শাখা ও সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির দরুণ খুবই দরকার হয়ে পড়েছে তদারক, পরিদর্শন ও রক্ষণের জন্য সাবা বাঙলাকে কতকগুলো অঞ্চলে ও উপ-অঞ্চলে ভাগ করা, কয়েকটা ছোট সমিতিকে নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় কমিটি করা, কয়েকটা কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে পরগণা সমিতি, কয়েকটা পরগণা সমিতি নিয়ে মহকুমা সমিতি এবং মহকুমা সমিতিগুলোকে নিয়ে জেলা সমিতি করা। সুশৃঙ্খলিতভাবে সমস্ত কাজ চালাবার জন্য প্রতিটি যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানের ভার দেওয়া হবে। এজন্য বিস্তারিত অভিমত প্রকাশে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। উপযুক্ত লোক নিয়ে কোথায় ঐ কেন্দ্রীয় সমিতিগুলো থাকলে সুবিধে বা অসুবিধে হবে সত্বর জানিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

পুলিন দাসের সংগঠন শক্তিতে গবর্মেণ্ট অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন। টাকার জন্য অত্যন্ত নৈপুণ্য ও দুঃসাহসের সঙ্গে এখানে ওখানে ডাকাতি হ'চ্ছে, কিনারা হচ্ছে না, পুলিন দাসকে রেগুলেশনে আটকও রাখা গেল, কিন্তু সমিতির অটুট বিস্তার রোধ করা গেল না।

১৯০৫-এর ৩রা নবেম্বর, প্রথমে কলকাতার শাখা হিসেবে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, পরে এটি একটি স্বতন্ত্র সংগঠনরূপে গড়ে ওঠে।* মূল অনুশীলন সমিতির জন্ম হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মার্চ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র, সোমবার দোল পূর্ণিমার দিন। হেদুয়ার লাগোয়া মদন মিত্র লেনে ছিল সতীশচন্দ্র বসুর এক ব্যায়ামাগার। তারই কাছে হ'ল সমিতির কার্যালয়। ১৯০৫এ ৪৯নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে কার্যালয় চলে আসে। ঢাকায় ব্যারিস্টার পি মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল এলে তাঁদের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হন পুলিনবিহারী দাস ; তাঁর নেতৃত্বে আশীজন যুবক পি মিত্রের কাছে সেবামন্ত্রের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।**

---

*Two Great Indian Revolutionaries—Uma Mukherji, p 23.

** অনুশীলন সমিতির পি মিত্তির—শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, পৃঃ ২৮।

মিঃ আর্মস্ট্রং প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পদ্ধতির এই রকম বর্ণনা করেছেন : দীক্ষাপ্রার্থী হাঁটু গেড়ে বসতেন, আর, পি মিত্র একটি তরবারির অগ্রভাগ তাঁর কপালে ঠেকিয়ে রাখতেন ; দীক্ষাপ্রার্থী শপথ নিতেন এই ব'লে যে, যদি প্রয়োজন হয়, দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত থাকবেন।

পুলিনবিহারী দাস তাঁর অসাধারণ দক্ষতার, নেতৃত্বের বিরল গুণপনার জন্য সমিতির 'ক্যাপ্টেন-জেনারেল' নিযুক্ত হন।

রাউলট (সিডিশান) কমিটি বলেছেন, প্রতিজ্ঞা ছিল চার রকমের : আদ্যপ্রতিজ্ঞা, অন্তপ্রতিজ্ঞা, বিশেষ প্রথম প্রতিজ্ঞা, বিশেষ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। আদ্যপ্রতিজ্ঞায় ছিল : আমি কখনো এই সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হব না ; আমি সর্বদাই সমিতির নিয়ম মেনে চলব ; কোন বাক্যব্যয় না ক'রে কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করব। আমি নেতার কাছে কোন কথা গোপন করব না ও তাঁকে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না।

অন্তপ্রতিজ্ঞায় ছিল : আমি কারও কাছে সমিতির কোনরকম ভেতরের বিষয় প্রকাশ করব না এবং অকারণ ঐসব বিষয় নিয়ে আলোচনাও করব না। পরিচালককে না জানিয়ে আমি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাব না। কোন সময়ে আমি যদি কোথাও গিয়ে পড়ি আমি তা তৎক্ষণাৎ পরিচালককে জানাব। আমাদের সমিতিতে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে যদি জানতে পারি আমি তৎক্ষণাৎ তা পরিচালককে জানাব। এর প্রতিকারে আমি তাঁর আদেশ পালন করব। যখন যে অবস্থায়ই থাকি না কেন আমি পরিচালকের আদেশে তৎক্ষণাৎ হাজির হব। শপথ-বদ্ধ আমি এখানে যা শিখব তা আমারই মত শপথবদ্ধ ছাড়া আর কাউকে শেখাতে পারব না।

প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞায় ছিল : ওঁ বন্দেমাতরম্।* ঈশ্বর, জননী, পিতা, গুরু, নেতা ও সর্বশক্তিমানের নামে আমি শপথ করছি যে, সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন না সিদ্ধ হচ্ছে ততদিন আমি এই শাখার সংসর্গ ছেড়ে কোথাও যাব না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, গৃহপরিবেশের আকর্ষণে আমি আবদ্ধ হব না এবং আমি কোন অজুহাত না দেখিয়ে নেতার আদেশে সমিতির সকল কাজ নিষ্পন্ন করব। আমি সকল কাজই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে, বাচালতা ও লঘুচিত্তে নয়, সম্পন্ন করব। এই প্রতিজ্ঞা

---

*উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সন্ন্যাসীদের এই ছিল ধ্বনি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত রচনারও আগে।

যদি লঙ্ঘন করি তবে যেন আমার ওপর বর্ষিত ব্রাহ্মণকুলের, পিতার ও মাতার এবং সর্বদেশের দেশপ্রেমিকদের অভিশাপ আমাকে ভস্মীভূত করে।

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞায় ছিল ঃ ওঁ বন্দেমাতরম্। ঈশ্বর, অগ্নি, মাতা, গুরু ও নেতাকে সাক্ষী রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, সমিতির উন্নয়নের জন্য আমি এই শাখার সকল কাজ, আমার নিজ জীবন ও সম্পদ হানির ঝুঁকি নিয়েও নিষ্পন্ন করব। আমি সব আদেশ পালন করব এবং শাখার যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে ও ক্ষতিসাধন করবে যথাশক্তি তাদের বিরুদ্ধে কাজ করব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি কারও সঙ্গে গুপ্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করব না, আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে ওসব কথা বলব না, অথবা অকারণে এই শাখারও কারও কাছ থেকে কিছু জানতে কৌতূহল প্রকাশ করব না। এই প্রতিজ্ঞা যদি আমি রক্ষা করতে না পারি তবে যেন ব্রাহ্মণকুলের, জননীর এবং সর্বদেশের দেশপ্রেমিকদের অভিশাপ আমাকে অচিরেই ধ্বংস করে।

কিভাবে এইসব শপথ পাঠ করানো হ'ত? আদালতে 'অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'র ফরিয়াদী সাক্ষী হ'য়ে প্রিয়নাথ চ্যাটার্জি তার এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন ঃ দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছুটির আগে, মহালয়ার দিনে ঢাকা সমিতির রমেশকে, আমাকে, আরও কয়েকজনকে রমনা সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে পুলিনদাস আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দেন। আমরা দশ বারোজন ছিলাম। আমরা এর আগে আদ্য, অন্ত ও বিশেষ প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম। কোন পুরোহিত ছিল না এবং মা কালীর সামনে সকাল আটটায় এই অনুষ্ঠান হয়। দেবীর সম্মুখে পুলিন দাস যজ্ঞ ও অন্যান্য পূজা সাঙ্গ করেন। প্রতিজ্ঞাপত্রগুলো ছাপানো ছিল, আমরা প্রত্যেকে তাই পড়ি এবং ঐ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হব ব'লে আমরা স্বাক্ষর করি। মা কালীর সামনে আমাদের যখন বিশেষ শপথ করানো হয় তখন বাঁ হাঁটু গেড়ে বসি ; আমাদের মাথায় তরোয়াল ও গীতা রাখা হয়। সিংহ শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যে ভঙ্গি নেয় আমাদের হাঁটু গাড়ার ভঙ্গিটি হ'ত সেই রকম।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লার দলের একটি ছেলে এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছিল যে, সে-বছর কালীপূজার দিনে আমাকে পূর্ণ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় এবং তারই পরামর্শমত আমরা চারজন সারাদিন উপোস করি। রাত্রি হ'লে পূর্ণ আমাদের সবাইকে শ্মশানে নিয়ে যায়। সেখানে পূর্ণ কালীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং দেবীর চরণে দুটি রিভলভার স্থাপন করেছিল। আমাদের সবাইকে সেই প্রতিমা স্পর্শ

ক'রে সমিতির প্রতি অনুগত থাকবার শপথ নিতে হয়। এই উপলক্ষে সমিতির জন্তে আমাদের এক একটি নাম রাখা হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ধরণের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। সমিতি-সভ্যদের জন্ত আরও কতকগুলো নিয়মকানুন ছিল। তার একটি ছিল, সভ্যরা যে যাই পাক, সমিতির সাধারণ ভাণ্ডারে তা জমা দিতে হবে। আর একটি যে দলিল পাওয়া গেছে তার শিরোনামা হ'চ্ছে "সম্পাদকগণের কর্তব্য"। এতে একটা উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—তা হ'চ্ছে অল্পবয়স্ক ছেলেদের সমিতিতে আনা। তার অভিভাবকের নাম থাকবে, স্কুল ও ক্লাশ উল্লেখ থাকবে। বাড়ির খবর থাকবে। ১২ বছরের কম যাদের বয়স তাদের জন্ত নিয়ম কিছু পৃথক। যারা সব রকম শপথ নিয়েছে আর যারা সবে আদ্য প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত হয়েছে তাদের লাঠিখেলায় তারতম্য থাকত। লাঠি-খেলা সম্পর্কে অনেক বই পাওয়া গেছে। কতকগুলো আসলে অসি-চালনা শিক্ষা। কোন কোন বইয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ রক্তলোলুপ "তরবারির স্তব" পাওয়া গেছে।

আরও একটি দলিলের নাম—"পরিদর্শক"। অর্থাৎ সংগঠনের ইন্সপেক্টাররা কিভাবে কাজের তদারক করবেন। বহু নির্দেশের মধ্যে কেন মুসলমানদের বাদ দিতে হবে তারও উল্লেখ থাকত।

সিডিশান কমিটিতে এমনি আরও বহু গুপ্ত দলিল উদ্ধৃত আছে।

কমিটির মতে ঢাকা অনুশীলন সমিতি এই কালটা জুড়ে সব চাইতে শক্তিশালী সংগঠন ছিল। অন্ত কোন সংগঠন যদি নাও থাকত এই একটিমাত্র সংগঠনই রাষ্ট্রীয় বিপদ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ব্যায়াম ও ধর্মচর্চার নামেই পুলিনবিহারী দাস এর প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী আন্দোলনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে এই সমিতি তার পূর্ণ সুযোগ নেয়। আর এর ছিল "পরসেবাভাব" (প্রশংসনীয়, যতক্ষণ-না বিকৃতি ঘটে); এই একদল জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সেকালে অগ্নিদাহ, প্লাবন ও অনুরূপ বিপর্যয়ের ত্রাণকার্যের জন্ত সতত প্রস্তুত থাকতেন। মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ এই জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা যেখানে আগুন লেগেছে ছুটে গেছেন, বন্তাত্রাণে অথবা ঐ জাতীয় দুর্গতিমোচনে ছুটেছেন। ঢাকার ন্তাশানাল স্কুলে পুলিন দাস ও ভূপেশচন্দ্র রায় ছিলেন শিক্ষক; এবং এই স্কুলই সমিতির ছেলে সংগ্রহের ও শিক্ষণের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। ১৯০৮এ এই সমিতিকে অবৈধ ঘোষণা করে পুলিন দাসকে নির্বাসিত করা হয়। তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মাখনলাল সেন; তিনি স্থাপন করেছিলেন সোনারঙ ন্তাশানাল

স্কুল। সিডিশান কমিটির মতে বড্ড "কুপ্রভাব" পড়ত এই ছেলেদের ওপর এবং কত-গুলো অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্যও এঁরাই দায়ী। 'অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'সূত্রে হাইকোর্ট বলেছিলেন, ষড়যন্ত্র মামলা-সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি ডাকাতি এঁরাই করেছেন। পুলিন দাসের নির্বাসন হ'লে মাখনলাল সেনের দক্ষ পরিচালনায় এই সমিতি সারা বাঙলা এবং বাঙলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায়ই যদিও ছিল এর বাড়-বাড়ন্ত, উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর থেকে পূব-দক্ষিণে চট্টগ্রাম এবং উত্তর-পূবে কোচবিহার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্যন্ত এই সমিতি সক্রিয় ছিল। বাঙলার বাইরে আসামে, বিহারে, পাঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশে (এখনকার উত্তর প্রদেশে), মধ্যপ্রদেশে ও পুণাতেও এর সভ্য ছিল।

শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, পুলিনবিহারী দাস যেদিন এই সমিতির সূত্রপাত করেন সেদিন মাত্র এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর ঢাকায় ৫০নং ওয়াড়িতে কার্যালয় ক'রে সংগঠন দ্রুতগতি লাভ করে। নির্বাসন থেকে মুক্তির পর পুলিন দাস আই-বি'র ডেনহামকে বলেছিলেন, ঢাকা শহরেই ১০০০ সভ্য ছিলেন, পূর্ববঙ্গের নানা জেলায় কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার। শাখার সংখ্যা ৬০০।*

১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে এই সমিতি গোয়ালন্দে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্টেট এলেনের প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা করে (২৩ ডিসেম্বর, ১৯০৭); একদা সমিতি-সদস্য, পরে পুলিশের চর হওয়ায় মনসা চক্রবর্তীকে হত্যা করে (১২ নবেম্বর ১৯০৮); ইংলিশ বাজার ও নড়িয়া বাজারে ডাকাতি করে (যথাক্রমে ২০ ও ৩০ অক্টোবর, ১৯০৮); কিন্তু সব চাইতে দুঃসাহসিক ডাকাতি করে বরুহায় (২ জুন ১৯০৮) এক গৃহস্থ বাড়িতে; ২৬,০০০ টাকা পাওয়া যায়; প্রতিরোধী পক্ষে চারজন নিহত ও সাতজন আহত হয়। দলের পক্ষে গোপাল সেন পুলিশের গুলীতে নিহত হন। নৌকোর পেছনে ছুটছে দু'পারে কাতারে কাতারে লোক। নৌকো থেকে অবিরাম গুলী চালিয়ে এদের নিরস্ত করতে হয়। কিন্তু পুলিশের হাতেও বন্দুক। একটা গুলী নৌকো ফুটো করে দেয়, জল উঠতে থাকে, জল সেঁচে ফেলাও তাই জরুরী হ'য়ে পড়ে। গোপাল নিয়েছিলেন সেই ভার। পুলিশের একটা গুলী এসে তাঁর মাথায় লাগে; তাতেই তিনি মারা যান। পুলিশের লঞ্চ ছুটে আসছে পেছনে। বারো ঘণ্টার সংগ্রামে গুলী প্রায় শেষ। আর নিস্তার নেই। এমন সময় এল এক প্রবল

---

*টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ, পৃঃ ২৪।

ঝড়; গাঢ় অন্ধকার; সব ছত্রভঙ্গ। ঝড় যেন এসেছিল তাদের মুক্তিদূতরূপে। গোপালের দেহ নৌকোর ভারী নোঙরের সঙ্গে বেঁধে নদীগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হ'ল। তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছিল, কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্য-সাবুদের অভাবে ফরিয়াদ নিষ্ফল হয়ে যায়।

দলের নেতৃত্ব পুলিন দাসের গ্রেপ্তারের পর পর্যায়ক্রমে মাখনলাল সেন, নরেন সেন (নরেন মহারাজ), প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ চৌধুরি, অনুকূল চক্রবর্তী, নগেন দত্ত (গিরিজা বাবু), নলিনীকান্ত ঘোষ প্রমুখের হাতে যায়। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় মনান্তর ঘটলে পুলিন দাসের দল-ত্যাগ না করা পর্যন্ত দলের ঐতিহ্য ছিল পুলিন দাসেরই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায়ও এর একটা কেন্দ্র স্থাপিত হ'লে একদিকে এর শাখা ছড়ায় বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশে, অন্যদিকে চন্দননগর বিপ্লবী-গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ হয়; আবার, বারাণসীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যালদের সঙ্গে সংযোগ হয়। রাসবিহারী বসুর মারফৎ চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দিল্লী ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদেরও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বাঙলা সরকারের মুখ্যসচিবকে পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল অব পুলিশ জানান যে, মৌলবীবাজার-ঢাকা, ঢাকা-কলকাতা, কলকাতা-লাহোর হ'য়ে আবার মৌলবী-বাজার নিয়ে একটা বিরাট্ চক্র আবর্তিত।

প্রথম যুদ্ধের সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতির চণ্ডীচরণ নাগ ও ভবানীপ্রসাদ দত্ত সংগঠনের কাজে ব্রহ্মদেশে যান এবং বর্মীদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবনা প্রচার করেন দীনেশ বিশ্বাস, সঞ্জীব মুখার্জি, সুমতি মজুমদার, কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এমনি এক বিস্তারিত সবল সংগঠন তৎপর হ'য়ে উঠলে মারা পড়ে হেড কনস্টেবল রতিলাল রায়, রাজনৈতিক সন্দেহভাজন দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ, হেড কনস্টেবল হরিপদ দেব, পুলিশ চর বঙ্কিম চৌধুরি, পুলিশ অফিসার বসন্ত ভট্টাচার্য, ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, গুপ্তচর রামদাস। ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জীর বাড়িতে বোমা নিক্ষেপের ফলে একজন হেড কনস্টেবল, ডেপুটি পুলিশ সুপার যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, সুপার বসন্ত চ্যাটার্জী, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর হরিদাস মৈত্র। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৪এ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুনের মধ্যে এই ঘটনাগুলো সবই একতরফা হয়নি। রতিলাল রায়ের হত্যায় ছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী ও নীরেন চ্যাটার্জী। ময়মনসিংয়ের ধুলদিয়ায় টাকা লুটতে গিয়ে রিভলভারের গুলীতে অমৃত সরকার আহত হন। মহকুমা হাকিম মিঃ গর্ডনকে হত্যার চেষ্টায় যোগেন্দ্র চক্রবর্তী বোমা বিস্ফোরণে মারা যান; আহত হন অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বল। হেঃ

কঃ হরিপদ দেবের হত্যায় ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, নির্মল রায়। বসন্ত ভট্টাচার্যকে হত্যা করেন অনুকূল চক্রবর্তী ও আদিত্য দত্ত।

গুপ্তচর রামদাসের মৃত্যুটা কিছু রোমাঞ্চকর। সূর্যাস্তের আগে একদল পুলিশ বাকল্যাণ্ড বাঁধে শাদা পোশাকে রামদাসকে নিয়ে অনুশীলন সমিতির লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিল; বসন্ত চ্যাটার্জি আরও একদল পুলিশসহ ছিলেন বুড়ীগঙ্গার ওপর নৌকোয়। রামদাস একটুকু দলছাড়া হতেই অমৃত সরকার, অনুকূল চক্রবর্তী, গিরিজা বাবু ও বীরেন চ্যাটার্জি রামদাসকে শেষ করে একেবারে নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। বাঁধটা তখন লোকে লোকারণ্য।

মাস চারেক পর কলকাতার গ্রীয়ার পার্কে নরেন সেন ও বীরেন চ্যাটার্জি ধরা পড়েন বটে কিন্তু বীরেন লোম্যানের কব্জিটা ভেঙে দেন। বীরেন লাঠি-ছোরা-যুযুৎসুতে ওস্তাদ ছিলেন। মুসলমান লেনে থাকতেন ডেঃ সুপার বসন্ত চ্যাটার্জি। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এক প্ল্যান ছকেছিলেন। ও বাড়িতে বোমা পড়বে আর টেগার্ট আসবেন অকুস্থল তদন্তে, তখন আর একদল তাঁকে মারবে। বসন্ত চাটুজ্যের বাড়িতে বোমা পড়ল, একজন হেঃ কঃ মারাও গেল; দু'জন কনস্টেবল ও চাটুয্যের এক আত্মীয়ও নিহত হলেন। কিন্তু দেখা গেল, অখিল মিস্ত্রী লেনে বোমায় আহত অবস্থায় পড়ে আছেন নগেন সেন, পাশে পড়ে আছে একটা ওয়েবলি রিভলভার। বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নগেন সেন, কালী মৈত্র ও সতীশ পাকড়াশি আহত হলে দ্বিতীয় প্ল্যানটা ফস্‌কে যায়। মেডিকাল ছাত্র যাদুগোপাল মুখার্জি ছিদাম মুদি লেনে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে কালী মৈত্রের চিকিৎসা করেন।

বসন্ত চাটুয্যে যেবার আর মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান না সেবার তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোডে রিভলভার নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন, সুরেশ চক্রবর্তী ও যতীন রায়, পাহারা দিচ্ছিলেন প্রবোধ বিশ্বাস, শিশির ঘোষ, মোহিনী ভট্টাচার্য। চাটুয্যের দেহরক্ষীও মারা যায়।

ত্রিপুরার ললিতেশ্বরে ডাকাতি করতে গিয়ে সঙ্ঘর্ষ বেঁধে যায়; গ্রামের পাঁচজন মারা যায়, পাঁচজন আহত হয়। দলের প্রবোধ ভট্টাচার্য গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়লে তাকে পিটিয়ে মারা হয় ব'লে পুলিশ পক্ষ থেকে বলা হয়। দলের প্রভাস লাহিড়ী বলেন, না, সাপে কেটেছিল। গৌহাটির নবগ্রহ পাহাড়ের কাছে আটগাঁও ভবনে পুলিশ-বিপ্লবীদলে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। ধরা পড়েন নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, মনীন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ; পালিয়ে যেতে পারেন নলিনী বাগচী, প্রবোধ দাশগুপ্ত ও অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। বগুড়া শহরে সাব-

ইন্সপেক্টর হরিদাস মৈত্রের আততায়ী নিকুঞ্জ পাল পাবনার আটঘরিয়ায় সশস্ত্র প্রতিরোধ করে ধরা পড়েন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন, সকালবেলা, ঢাকার কলতা বাজারে ২৮নং বাড়িতে পুলিশ হানা দিলে তারিণী মজুমদার ও নলিনী বাগচী মৌজার পিস্তল নিয়ে প্রতিরোধ করেন ; তারিণী ওখানেই বীরের মৃত্যুবরণ করেন, আহত নলিনী বাগচী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তৃতীয় বীর হরিচৈতন্য দে ধরা পড়েন। সাব-ইন্সপেক্টর ভীষণ আহত হন ও হেড কনস্টেবল মারাত্মক জখমের ফলে মারা যান।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই ঢাকায় ৫৫ জনের নামে এক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। শেষ পর্যন্ত ৪৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানো হয় ; তাঁদের মধ্যে পুলিন দাস অন্যতম। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট দায়রা জজ নানা মেয়াদে তাঁদের কারাদণ্ড দেন। মামলা হাইকোর্টে যায়। ১৪ জনের দণ্ডকালের কিছু অদল-বদল হয়, বাকীরা ছাড়া পান। দায়রা জজ ও হাইকোর্টের বিচারপতি মুখার্জী বিস্তারিতভাবে সমিতির 'অন্ত' 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা' এবং 'বিশদ নিয়মাবলী' নিয়ে আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সমিতি-সদস্যগণ সমিতিপ্রধানের নিরঙ্কুশ আয়ত্তে থাকবেন এমন কড়া নিয়মে সমিতির গোপন খবর অনুদ্ঘাটিত রাখবার সর্বপ্রকার সাবধানতাই অবলম্বন করা হয়েছিল। অর্থাৎ, বিচারের মুখ্য বিষয়ই ছিল সংগঠন। প্রত্যেক গ্রাম সম্পর্কে কমসেকম ২১টি তথ্য টুকে রাখতে হ'ত এবং খাল বিল নদী নালা মাঠ বাড়ি বাগান দেখিয়ে একটা মানচিত্রও থাকত। "পরিসংখ্যান্ ও অন্যান্য গুরুত্ব-পূর্ণ তথ্যের সংগ্রহ আশ্চর্য।" মোটকথা, সংগঠন সম্পর্কে এমন নিপুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থাকে বিচারকেরা বিস্ময়কর মনে করেছেন। হাইকোর্ট সকল বিষয়ের যে এগারো দফা সংক্ষিপ্তসার করেন তাতে বলা হয়েছে ঃ পুলিনবিহারী দাসের উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় নেতৃত্বে এক সাম্রাজ্যের মধ্যে আর এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা।...ও সোসাইটি (সমিতি) ছিল বিপ্লবী সমিতি।...এ মামলায় যেসব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অতি বিপজ্জনক প্রকৃতির এক বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন শিক্ষিত ভদ্র যুব সম্প্রদায়। এই আন্দোলন দারুণ অনিষ্টের সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। ......ঢাকা অনুশীলন সমিতির শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত থেকে দশ বৎসরব্যাপী বহু হত্যা, ডাকাতি ও অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধ অনুসৃত হয়েছে। (সিডিসান কমিটি রিপোর্ট, পৃঃ ২১১)

"জাগরণ ও বিস্ফোরণ"-এ সিডিসান কমিটি রিপোর্ট থেকে কিছু পৃথক তথ্য রয়েছে। জুলাই মাসে ধর-পাকড় আরম্ভ, ধৃতের সংখ্যা ৬০, স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের

সামনে হাজির করা হয় ৫৫ জনকে ১৫ই জুলাই। উপস্থিত বন্দীর সংখ্যা ৪৫। দায়রায় মামলা যায় ২২এ নবেম্বর। শেষ হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি। এসেসররা বন্দীদের নির্দোষ বললেও জজ পুলিনচন্দ্র দাস (কমিটি রিপোর্টে পুলিন-বিহারী দাস, সাধারণ্যে বিদিত পুলিন দাস), আশুতোষ দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়কে দণ্ড দেন—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; অশ্বিনীকুমার ঘোষ, গুরুদয়াল দাস, চারুচন্দ্র সেন, যোগেশচন্দ্র রাউত, ক্ষীরোদচন্দ্র গুহ, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, রাধিকাভূষণ রায়, নিশিভূষণ বসু, নিতাইচন্দ্র বণিক্য, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, সারদাচরণ দাশগুপ্ত, শান্তিপদ (প্রমথনাথ) মুখোপাধ্যায়, ভূপতিনাথ সেনগুপ্ত, মাণিক্যচন্দ্র গুহকে দশ বছর করে সশ্রম কারাবাস; বিজয়চন্দ্র রাহা, শচীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, অবনীমোহন গাঙ্গুলী, বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র ঘোষ, গোপীবল্লভ চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র সেন, যদুনাথ দাস, নিশিভূষণ মিত্র, নৃপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, পরেশ-চন্দ্র সেন ও প্রমোদবিহারী বসুকে সাত বছর ক'রে সশ্রম কারাবাস এবং সুখেন্দ্রমোহন সেনকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্টের আপীলে হয় পুলিন দাসের সাত এবং আশুতোষ দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়ের ছয় বছর ক'রে দ্বীপান্তর; গুরুদয়াল দাস ও বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; রাধিকাভূষণ, প্রফুল্ল-চন্দ্র শক্তিপদ, ক্ষীরোদচন্দ্র, ভূপতিমোহনের তিন বছর; গোপীবল্লভ, নিশিভূষণ, নৃপেন্দ্রমোহন, প্রমোদবিহারীর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বিজয় রাহা উন্মাদ হ'য়ে যাওয়ায় আপীল হয়নি, সরকারই দু'বছর সাজা কমিয়ে দেন। বাকী ২১ জন আপীলে মুক্তি পান।

'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা,' 'অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'র বৃত্তান্ত ঢাকা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে ৪৪ জনের বিরুদ্ধে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা রুজুর সরকারী অনুমতি চাওয়া হয়; ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করলে রজনীকান্ত দাস ও গিরীন্দ্রমোহনদাস রাজসাক্ষী হয়; প্রাক্-সোপর্দ তদন্তকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাত জনকে ছেড়ে দেন; দায়রা জজ দু'জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন। বাকী ক'জনার মধ্যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করেন, অবশিষ্টদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ তুলে নেওয়া হয়; দায়রা জজ বন্দীদের অপরাধ-স্বীকৃতি গ্রহণ ক'রে রায় দেবার সময় মন্তব্য করেন,—হাজতী বন্দীরা ১৯ থেকে ২৯ বছর বয়সের যুবক; পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি এরা সেই মূল গায়েনদের পুতুল; প্রায় এক যুগ ধরে এদের তৎপরতা। শিক্ষকদের মারফৎ ছাত্রদের মধ্যে তাঁদের ভাবনা ছড়ানোই

ছিল কাজ। যাঁরা অপরাধ স্বীকার করেছে তাদের কারও বাড়ি বাখরগঞ্জ (বরিশাল), কারও ঢাকা, তিনজনের ত্রিপুরা। বরিশালের নেতা রমেশ আচার্যের বয়স একুশ।

"যে-যুবকেরা এই সমিতিতে (এসোসিয়েশনে) যোগ দেয় তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনার মোহে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায়; কিন্তু নিরুপায় গ্রামবাসীদের বাড়িতে ডাকাতি বা তাদের হত্যা সাধারণ চোর-ডাকাতদের কাজ; ভাবী দেশপ্রেমিকদের নয়। ষড়যন্ত্রকারীরা মত্ততায় মেতে ওঠবার জন্য এমনি করেই নিজেদের বিকৃতি ঘটিয়েছে।"

জজ বলেন, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, সারা দেশে এক বিপজ্জনক সংগঠন বিস্তারিত করবার উদ্দেশ্যে ভদ্র যুবকেরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা কয়েকটি ডাকাতি করেছেন।...এই ষড়যন্ত্র বস্তুত ঢাকা ষড়যন্ত্রেরই একটা শাখা। ঢাকা ষড়যন্ত্রের আরও শাখা আছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল কুশাঙ্গল ডাকাতির পর, বীরাঙ্গলসহ আরও দুটি ডাকাতি হতেই পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। বরিশালে এক বে-সরকারী ভদ্রলোক মারফৎ প্রথম রাজসাক্ষী রজনী দাসের এক বিবৃতি পাওয়া যায়, তাতেই জানা যায়, কুশাঙ্গল-বীরাঙ্গল কাদের কাজ। কুমিল্লায় এক সাব-ইন্সপেক্টরের ছেলের কাছে পাঠানো এক চিঠির সূত্র ধরে পুলিশ সদলে হাজির হ'ল এক অন্ধকার গৃহে; ১২টি ভদ্রলোকের ছেলে, গায়ের জামা-কাপড় বেয়ে জল ঝরছে; তাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে ডাকাতির অস্ত্রপাতি, দুটি রিভলভার, ১২ বোরের একটি বন্দুক, কয়েকটি মুখোশ, ইত্যাদি। অর্থাৎ ডাকাতির প্রস্তুতির যাবতীয় সরঞ্জাম।

এর চাইতেও বড় রকমের আবিষ্কার হ'ল ২৮এ নবেম্বর। গিরীন্দ্রমোহন দাসের বাক্সে। গিরিনের বাবা অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, নিজেই খোলালেন গিরিনের বাক্স এবং গুপ্ত সমিতির সব খবর বের করলেন। গিরিনের হেফাজতে পাওয়া গেছল বন্দুক আর রিভলভারের বহু কার্তুজ, বারুদ, ছর্‌রা, বুলেট, পারকাসান ক্যাপ ইত্যাদি। বাক্সে রূপোর অলঙ্কারও পাওয়া যায়, কিছুদিন আগের লাঙ্গলবন্ধ ডাকাতির লুণ্ঠিত সম্পদের অংশ। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হল সমিতির কাগজপত্র, সদস্যদের তালিকা ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিসেব। গিরিনও রজনীর মত রাজসাক্ষী হয়েছিল।

এ ব্যাপারে ঢাকা পার্টি একক ছিল না। ফরিদপুরের মাদারিপুরে একটি স্বতন্ত্র

দল তৎপর হয়ে উঠেছিল। এঁরা গেরিলা পদ্ধতিতে পদ্মার ওপারে দূরে দূরে ডাকাতি করতে যেতেন, মশাল জ্বেলে, মুখোশ পরে, আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতেন, হৈচৈ ক'রে, বোমা ও গুলী ছুঁড়ে প্রতিরোধকামী লোকেদের দূরে হঠিয়ে রাখতেন। বিগল্ বাজলে সবাই এসে সারি দিয়ে দাঁড়াতেন, তারপর দল বেঁধে চলে যেতেন।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ড হয় রমেশচন্দ্র আচার্য (কালিদাস রায়) ও যতীন্দ্রনাথ রায় (দেবেন্দ্রনাথ রায়, ফেগু, মাখন)-এর বারো বছর করে দ্বীপান্তর ; নিবারণচন্দ্র কর, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ (চন্দ্র, নসা) ও রোহিণী (মণি) গুহের দশ বছর করে দ্বীপান্তর ; প্রিয়নাথ আচার্য ও গোপালচন্দ্র মিত্রের সাত বছর করে দ্বীপান্তর ; কুমুদবন্ধু নাহা ও দেবেন্দ্রচন্দ্র বণিক্যের সাত বছর করে সশ্রম কারাবাস ; শৈলেশমোহন মুখোপাধ্যায়, নিশিকান্ত ঘোষ ও চণ্ডীচরণ বসুর চার বছর করে সশ্রম কারাবাস। জজ খুব কঠোর দণ্ডের পক্ষপাতী ছিলেন।

মূল 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'য় যাঁরা "পলাতক" ছিলেন, বিভিন্ন তারিখে তাঁরা ধরা পড়লে হ'ল 'অতিরিক্ত বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা'। বিচারাধীন হলেন : মদনমোহন (চন্দ্র) ভৌমিক (কুলদাপ্রসাদ রায়), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (কালীধর চক্রবর্তী, বিরজাকান্ত চক্রবর্তী), খগেন্দ্রনাথ চৌধুরি (সুরেশচন্দ্র চৌধুরি), প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও রমেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরি (চৌধুরি, পরিতোষ)। দুটো মামলার তথ্যই জড়ানো হল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৯এ নবেম্বর দায়রা জজ পাঁচজনকে নানা মেয়াদে দণ্ড দেন ; হাইকোর্টে আপীল হ'লে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই দু'জন বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর দ্বীপান্তর দণ্ডকাল পনেরো থেকে দশ বছরে হ্রাস হয়। মদন ভৌমিকের ১০ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল থাকে ; খগেন্দ্র চৌধুরির ১০ বছর দ্বীপান্তরকাল হ্রাস ক'রে ছয় বছর করা হয়। কিন্তু বরানগর ডাকাতি মামলা বাবদ (১৯১৪) ছিল তিন বছর ; দুই মিলিয়ে হ'ল নয় বছর। রমেশ চৌধুরি ও প্রতুল গাঙ্গুলী ছাড়া পান।

হাইকোর্ট মন্তব্য করেন, ষড়যন্ত্র ফরিয়াদের অনুকূলে সাক্ষ্যসাবুদ এতই প্রবল ছিল যে, আপীলকারীদের পক্ষ থেকে তা নিয়ে কোন প্রশ্নই তোলা হয়নি। কৌসুলি জানতেন, ও বিষয়ে সুবিধে হবে না। এটি পরিষ্কার যে, বরিশাল সমিতি ঢাকা অনুশীলন সমিতিরই শাখা ; কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ফেণীতেও প্রশাখা আছে। ছেলে ধরবার জন্য বড়রা শিক্ষকতা বৃত্তি নিতেন। সোনারঙ ন্যাশানাল স্কুল তো একটা বেশ ভাল রকমের আড্ডা ছিল। বরিশাল সমিতি ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেরা

হলদিয়া হাট ডাকাতি (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১০), কলাগাও ডাকাতি (৭ নবেম্বর, ঐ), দাদপুর ডাকাতি (৩০ নভেম্বর, ১৯১০), পণ্ডিতচর ডাকাতি (৩০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১), গোয়াড়িয়া ডাকাতি (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১), সুকাইর ডাকাতি (৩১ মার্চ, ১৯১১), গোলকপুর বন্দুক চুরি (২০ জুলাই, ১৯১১), কাওয়াকুরি ডাকাতি (২৯ এপ্রিল, ১৯১২), বীরাঙ্গল ডাকাতি (২৩ মে, ১৯১২), পানাম ডাকাতি (১০ই জুলাই, ১৯১২), সারদা চক্রবর্তীর হত্যাকাণ্ড (জুলাই, ১৯১২), কুমিল্লা শহর ডাকাতি (১ নবেম্বর, ১৯১২) ও লাঙ্গলবন্ধ ডাকাতি (১৪ নবেম্বর, ১৯১২)-তে অংশ নেয়। এই সব কাণ্ড বড়ই তাৎপর্যময়। এই ধরনের অপরাধ শিক্ষিত বাঙালী যুবকের প্রকৃত প্রবৃত্তির একান্তই বিপরীত। এরকম ঘটনা সর্বতোভাবে এক নতুন ও অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি।"

"বরিশাল সমিতির জেলা সংগঠক ছিলেন যতীন ঘোষ নামে এক ভদ্রসন্তান, তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হন আর এক ভদ্রসন্তান রমেশ আচার্য ; রমেশ ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা সমিতিতে যোগ দেন ; পিতা ছিলেন গবর্মেণ্ট কোর্ট রীডার। আই-এ পাশ করলে তাঁকে সোনারঙ স্কুলে মাস্টারি করতে বলা হয় ; তিনি তাই করেন ও নানা অপরাধ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট হন। সুকাইর ডাকাতির পর সোনারঙ স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।"

আদালত মন্তব্য করেন ঃ "শিক্ষার্থী ও ভদ্রসন্তান ক্রমশঃ বৈপ্লবিক সংস্থায় আকৃষ্ট হয়েছে ও পরিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই দুর্দান্ত অপরাধপ্রবণ হয়েছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে এসেছে ; রমেশ আচার্য এমন এক দৃষ্টান্ত। তিনি প্রথমে শরীর চর্চার জন্য একটি সংস্থায় যোগ দেন এবং ২১ কি ২২ বছর বয়সে বৈপ্লবিক সংস্থার ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়েন। এই সংস্থার সংস্পর্শে না এলে তিনি অপরাধ-প্রবণ না হয়ে সমাজের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে পারতেন।"

দলের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সারদা চক্রবর্তীকে গুলী ক'রে মারা হয়, মাথাটা কেটে, মাথা ও ধড় দুইই একটা পুকুরে নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ এর কোন কিনারাই করতে পারেনি ; এ যে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ তাও আঁচ করতে পারেনি। বহুদিন পর ত্রিচিনপল্লী জেলে প্রিয়নাথ আচার্য এক স্বীকারোক্তি করলে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ঘটনাটা উদঘাটিত হয়।

মৌলবীবাজার থেকে রাজাবাজার

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ ময়নসিংয়ের বারহাটা থানার দিয়াপাড়া গ্রামের যোগেন ঘোষ (হরেন্দ্রজীবন ঘোষ) শ্রীহট্টের মৌলবীবাজারে মহকুমা হাকিম, আই-সি-এস, মিঃ গর্ডনের বাগানের দিকে গুটিগুটি এগোচ্ছিলেন বোমা ছুঁড়ে তাঁকে মারবেন ব'লে। বোমাটা যোগেনের হাতেই ফাটল এবং যোগেন শেষ হ'য়ে গেলেন। তাঁর পাশে সাক্ষী পড়ে রইল দুটি গুলী-ভরা রিভলভার। ছিন্নভিন্ন দেহে সনাক্ত করবার মত কিছুই ছিল না। অনেক দিন পর অন্য সূত্রে তথ্যোদ্‌ঘাটন হয়েছিল।

মিঃ গর্ডন কেন বিপ্লবীদের লক্ষ্য হলেন? শিলচরে থাকতে তাঁর কাছে খবর পৌঁছোয় সেখানকার 'জগৎসী আশ্রম'টা বিপ্লবীদের এক আড্ডা। ওঁরা নাকি বৃটিশ শাসন মানেন না। শুনে বৃটিশ শাসনের এক স্তম্ভ আই-সি-এসগর্ডন তাঁদের উচিত শিক্ষা দেবার ছল খুঁজতে লাগলেন। কোন এক কিশোরকে নাকি আশ্রমে জবরদস্তি আটক রাখা হয়েছে এই মর্মে তার "দাদা" অভিযোগ করে। বন্দীকে উদ্ধারের জন্য গর্ডন সদলে আশ্রমে আসেন তল্লাসী করবেন ব'লে। আশ্রমবাসীরা আপত্তি করলে পর-দিন তিনি একেবারে মারমূর্তি নিয়ে আসেন—লাঠি, বেয়নেট, নিয়ে চড়াও হলেন; ঠাকুরঘর, রান্নাঘর কিছু বাদ গেল না; স্ত্রীলোকদের চুল ধরে আছড়ে ফেলে, মাথা ফাটিয়ে, বিবস্ত্র ক'রে, জল্লাদী নৃত্যের চাপ চাপ রক্তে রাখল বৃটিশ শাসনের সাক্ষ্য। আশ্রমের সাধু স্বামী যোগানন্দ (মহেন্দ্রনাথ দে), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি, এম-এ। কলকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদ ত্যাগ ক'রে হয়েছেন হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সুশীল সেনের শিক্ষক। এই শিক্ষকতাও তিনি ছেড়ে যান এবং জগৎসী আশ্রমে যোগ দেন। ৭ই জুলাই তিনি গুলীবিদ্ধ হন, ১৬ই জুলাই পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামের বাণী দিতে দিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সরকার পক্ষ দুটি মামলাতেই হেরে যান। কিশোরকে আটকে রাখার অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় উল্টে অভিযোক্তা "দাদার"ই কারাদণ্ড হ'ল; আর জগৎসীর ব্যাপারে পরাজয় ও কুখ্যাতি বরণ ক'রে গর্ডন বদলি হলেন। তার আগেই তাঁর প্রাণ নিতে গিয়ে প্রাণ দিলেন যোগেন।

কিন্তু বিপ্লবীরা ছাড়েন নি; গর্ডনের পিছু নিয়েছিলেন লাহোরের লরেন্স গার্ডেন

অবধি, মরে এক চাপরাশি। এই অপরাধে হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা-নিক্ষেপ-খ্যাত বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হ'য়ে যায়।

সাংঘাতিক সব বোমা। বোমা, বোমা আর বোমা; কোত্থেকে আসে এত বোমা? এই সেদিন (২৯এ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩) কলেজ স্কোয়ারে লোকারণ্যে হেড কনস্টেবল হরিপদ দেব গুলীবিদ্ধ হ'লেন, আততায়ীরা ভীড়ের মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলা ময়মনসিং শহরে পুলিশ ইন্সপেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরির বাড়িতে পড়ল বোমা, তৎক্ষণাৎ চৌধুরির জীবনাবসান ঘটল। মৌলবীবাজারে যোগেনের হাতে বোমা। এ বছরেই এপ্রিলে রাণীগঞ্জে, ডিসেম্বরে ভদ্রেশ্বরের থানায় পড়ল বোমা। মেদিনীপুরে আবদুর রহমানকে লক্ষ্য ক'রে বোমা। কে জোগায় এত বোমা?

এ সেই বাঙলা সরকারের মুখ্য-সচিবকে লেখা মিঃ বুলারের লিপি: মৌলবী-বাজারের সূত্র টেনে নেয় ঢাকায়, ঢাকার সূত্র ধরে হদিস মেলে কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার এবং লাহোরের ঘটনা বৃত্তটা শ্রীহট্ট অবধি পূর্ণায়ত্ত করে।*

মৌলবীবাজারের বোমা বিস্ফোরণ সূত্রে শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার এক পরোয়ানা জারি করেন। ঐ পরোয়ানাবলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে পুলিশ কলকাতার বুকে রাজাবাজার এলাকার এক বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িটার নম্বর ২৯৬/১, আপার সার্কুলার রোড। বাড়িতে কে আছেন? শশাঙ্কশেখর (অমৃতলাল) হাজরা। ঘুমিয়ে আছেন শশাঙ্কশেখর (অমৃতলাল), দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে ও সারদাচরণ গুহ। ঘুমন্ত অবস্থায়ই হ'লেন গ্রেপ্তার, পুলিশের আচমকা আবির্ভাব। অনেক সিগারেটের টিন, বোমা তৈরির আরও সব উপাচার। পরে আরও দু'জন ধরা পড়েন; কালীপদ ঘোষ (উপেন্দ্রলাল রায়চৌধুরি) এবং খগেন্দ্র-নাথ চৌধুরী (সুরেশচন্দ্র চৌধুরি)। ষড়যন্ত্র ও বিস্ফোরণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনবার অনুমতি মঞ্জুর করলেন বাঙলা সরকার। (সিডিসান কমিটি রিপোর্ট, পৃঃ ২২৪)।

এ সম্পর্কে ধরা হয়েছিল ত্রিশজনেরও বেশি লোক। ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্টে হাজির করা হ'ল দুদিনে (২৫ নবেম্বর ও ২৮ নবেম্বর) দু' দফায় যথাক্রমে চারজন ও দু'জনকে। দায়রা সোপর্দ হ'লেন। দায়রার রায় বেরোলো ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন। ('জাগরণ ও বিস্ফোরণ', পৃঃ ৩৭৭) সিডিসান কমিটি রিপোর্টে আছে: "আলিপুরের দায়রা জজ খগেন্দ্র ছাড়া সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং বিভিন্ন মেয়াদে

* শ্রীমতী উমা মুখার্জি কৃত 'টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ', পৃঃ ৩১।

কারাদণ্ড দিয়েছেন। দণ্ডিত ব্যক্তিরা হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন এবং গভর্মেণ্টও খগেন্দ্রের মুক্তির বিরুদ্ধে আপীল করে পাঁচজন বন্দীর দণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুকূলে রুল পেয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে, "জাগরণ ও বিস্ফোরণে" আছেঃ "অমৃত ওরফে শশাঙ্ক হাজরার পনেরো বছরের দ্বীপান্তরের এবং সঙ্গের আসামী পাঁচজনের দশ বছর হিসাবে দ্বীপান্তর আদেশ হয়। এর ওপর ষড়যন্ত্র অপরাধে পাঁচজনের মধ্যে দুজনের প্রত্যেকের আর দশ বছর সমকালীন-ভোগ দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।...মামলা হাইকোর্টে আপীলে গেলে ৭ই ডিসেম্বর শুনানী [সওয়াল ?] আরম্ভ হয়।" এক্ষেত্রে কমিটি রিপোর্টই বেশি নির্ভরযোগ্য।

হাইকোর্টে আপীল শুনেছিলেন দুই বিচারপতি, মুখার্জী ও রিচার্ডসন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মতে, 'আপীলকারীদের পক্ষে যে বলা হয়েছে সস্তায় এসিটিলিন জেনারেটর তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ত ঘরে পাওয়া উপকরণগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল তা নয়, ফরিয়াদমত ওগুলো বোমা তৈরির জন্তই ছিল। ঐ বাড়িতে যে বোমা তৈরি করা হচ্ছিল সেগুলো ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ ড্যালহৌসি স্কোয়ারে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে রাজসাক্ষীর বাড়িতে, মৌলবীবাজারে (১৯১৩, ২৭ মার্চ), লাহোরে (১৯১৩, ১৭ই মে), ময়মনসিংয়ে (১৯১৩, ৩০ সেপ্টেম্বর) ও ভদ্রেশ্বরে (১৯১৩, ডিসেম্বর ১৩) যে বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল—সেই জাতীয় বোমাই। তামাক, সিগারেট অথবা কনডেন্সড মিল্ক (জমাট দুধ)-এর টিনগুলো বোমার খোল হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ত লোহার ডিস্ক ও ক্ল্যাম্প। বিশেষজ্ঞদের মতে এই যে বোমা তা একই মস্তিষ্ক-উদ্ভূত ও একই জাতের। মেজর টার্নার নামে এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এমন বোমা তিনি কোনদিন দেখেন নি। শশাঙ্ক এক বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের শরিক। প্রথম কারণ, এই জাতীয় বোমা বৃটিশ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায়—কলকাতা, লাহোর, দিল্লী, শ্রীহট্ট, ময়মনসিং ও মেদিনীপুরে—ব্যবহৃত হয়েছে এবং একাজে একাধিক ব্যক্তি লিপ্ত। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর ঘরে বৈপ্লবিক সব দলিল পাওয়া গেছে—রক্তপাত ও হত্যার পথে বীর দেশপ্রেমিকদের সহায়তায় স্বাধীনতালাভের আহ্বানসূচক বৈপ্লবিক দলিল। কিন্তু অন্যান্য বিচারাধীনের এঁর সঙ্গে সংস্রব প্রমাণিত হয়নি। (সিডিসান কমিটি রিপোর্ট, পৃঃ ২২৫) অতএব একজনেরই সাজা বহাল রইল,—তিনি অমৃতলাল (শশাঙ্কমোহন) হাজরা।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রসঙ্গত ড্যালহৌসি স্কোয়ারের যে বোমার কথা

উল্লেখ করেছেন সেটিকে ছুঁড়েছিলেন ১৬ বছর বয়স্ক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়—পুলিশের বড় অফিসার ডেনহামকে মারবেন বলে। কিন্তু ভুলবশে বোমাটা এসে পড়ে পি-ডবলিউ-ডি'র এক কণ্ট্রাক্টর মিঃ কাউলের গাড়িতে। বোমাটা ফাটে না, কাউল বেঁচে যান, আর ধরা পড়েন ননীগোপাল। বিশ্লেষণে কিন্তু জানা যায়, বোমাটা ছিল মারাত্মক।

৯ই মার্চ হাইকোর্টে'র বিশেষ দায়রা মামলা আদালতে ওঠে।

২৭এ মার্চ ননীগোপালের ১৪ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

এ নিয়ে পুলিশ বেশ ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করে; কিন্তু ননীগোপালের মুখে কোন রা কাড়তে পারে নি; সেলুলার জেলেও কারা কর্তৃপক্ষের অত্যাচার মোকাবিলায় অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। বিপ্লবী ননীগোপাল।

জার্মান পিস্তল মৌজারের ভূমিকা

সিডিসান কমিটি যত সংক্ষেপে জার্মান পিস্তল মৌজার (Mauser)-এর কাহিনী সেরেছেন ব্যাপারটা অত সংক্ষিপ্ত নয়। শুধু যে এর সংগ্রহটাই বাঙলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটা রোমাঞ্চকর সাফল্য, তাই নয়, এ বৈপ্লবিক দলগুলোকে যেমন দিয়েছিল অসামান্য শক্তি, ওগুলো হস্তচ্যুতির পরিণতিও তেমনি শোচনীয়। সিডিসান কমিটি অবশ্য কলকাতার বন্দুক নির্মাতা (a firm of gunmakers) রডডা কোম্পানীর পিস্তল লোপাটকে "বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের উত্তরণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা" বলেছেন। রডডা কোম্পানীর এক কেরাণীর কাজই ছিল কাস্টমস্ অফিস থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ইত্যাদি ছাড়িয়ে আনা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৬এ আগস্ট তিনি ২০২ পেটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ছাড়িয়ে নেন। সেকালের ড্যালহৌসি স্কোয়ার (বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ)-এর দক্ষিণ প্রান্তে ভ্যান্সিটার্ট রো-য়ে ছিল কোম্পানীর গুদাম ঘর। সেখানে আসে ১৯২ পেটি, অর্থাৎ দশ পেটি কম। বাকীটা আনতে যাচ্ছেন ব'লে কেরাণী সরে পড়েন। আর তিনি ফেরেন নি। তিনদিন পর পুলিশে এজাহার দেওয়া হয়। ঐ নিখোঁজ দশ পেটিতে ছিল ৫০টা মৌজার পিস্তল ও তারই ৪৬,০০০ গুলী। '৩০০ বোরের বড় পিস্তল ; প্রত্যেকটি নম্বরাঙ্কিত, আর, এই পিস্তলের গঠন এমনই যে, যে-বাক্সে পিস্তল আছে সেটা পিস্তলের কুঁদোয় লাগিয়ে দিলে রাইফেলের মত কাঁধে রেখে ছোঁড়া যায়। বড় কর্তারা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছিলেন, ৪৪টা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতে হাতে বিলি হ'য়ে গেছল—নটি স্বতন্ত্র বিপ্লবী দল এগুলো পেয়েছিল, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর যত ডাকাতি বা হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার অন্তত ৫৪টা ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল। পুলিশের তৎপরতায় ৩১টা "চোরাই" পিস্তল উদ্ধার করা গেছল।

শ্রীমতী উমা মুখার্জি এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, বিপ্লবীদের দুটি জিনিসের বড্ড অভাব ছিল : টাকা ও অস্ত্র। প্রথমটার জন্য ডাকাতি করা যেত, কিন্তু অস্ত্র? মাণিকতলা কেন্দ্রটি বিলীন হ'য়ে যাবার পর বিপ্লবীরা বড়ই সঙ্কটে পড়ে যান। একমাত্র চন্দননগরই হ'ল বোমা তৈরির কেন্দ্র। কিন্তু সেখানেও পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি। কারও কাছ থেকে কেড়ে বা কারওটা হাতিয়ে নিয়ে কিংবা কোন ফিরিঙ্গী, কি চীনা কি ইতালীয়ান বা অন্য কোন নাবিকের কাছ

থেকে কিনে নিতে হ'ত। আর দুটি উৎস ছিল,—একটি চেতলার বন্দুক-বিক্রেতা নুর খান; তাঁর কাছ থেকে জ্যোতীন্দ্র (শ্রীমতী মুখার্জি বলেছেন এই নামই দলিল-সম্মত) মুখোপাধ্যায় চেতলারই চারু ঘোষ মারফৎ রিভলভার কিনতেন। দ্বিতীয় উৎসটি ছিল চন্দননগরের নামজাদা বণিক কিশোরীমোহন সাপুই, তিনি ফ্রান্স থেকে নিয়মিত রিভলভার আমদানী করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটা সুযোগ এনে দিল এবং এই সময়-সুযোগেই রডডা এণ্ড কোম্পানীর পিস্তলগুলো বিপ্লবীদের হাতে এল।

ঠিক এরই আগের ঘটনাক্রম হচ্ছে 'মুক্তিসঙ্ঘ' ও 'আত্মোন্নতি সমিতি'র ঘনিষ্ঠতা স্থাপন। এই দুটি দলের ওপর পুলিশের নজর প্রখরতর হ'য়ে ওঠে বিশেষ ক'রে জগদ্দলে আলেকজান্ড্রা জুট মিলের ইঞ্জিনিয়ার ও' ব্রিয়েনকে হত্যার চেষ্টার পর। এই ইঞ্জিনিয়ার একজন মিলকর্মীকে লাথির চোটে মেরে ফেলেছিল; কিন্তু তার দণ্ড হয়েছিল মাত্র ৫০ টাকা জরিমানা। বিপ্লবীরা এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য মুক্তি সঙ্ঘের হরিদাস দত্ত (রংপুর) ও খগেন দাস (কুমিল্লা)-কে নির্দেশ দেন; এঁরা ঐ মিলে কাজ নেন এবং প্রতি রাত্রে সাহেব যে নৌকোয় চন্দননগর যাতায়াত করেন তার মাঝির কাজও করতে লাগলেন। কিন্তু গোয়েন্দারা এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে কয়েকজনকে ধরে ফেলে। এরপরই রডডা কোম্পানীর ব্যাপার।

সিডিসান-কমিটি-কথিত কেরাণীটির নাম শ্রীশ মিত্র (হাবু); তিনি আবার "আত্মোন্নতি সমিতি'র অনুকূল মুখার্জির অনুগামীও ছিলেন। তিনিই পিস্তল আমদানীর খবরটা দলে পৌঁছে দেন। শুনে 'মুক্তিসঙ্ঘে'র শ্রীশ পাল (নরেন) ও অনুকূল মুখার্জি ২৪এ আগস্ট রাত্রি ন'টার পর নানা দলের বিপ্লবীদের এক গোপন সভা ডাকেন ছাতাওয়ালা গলির একটা ছোট পার্কে। এঁরা দু'জন তো ছিলেনই, আরও যাঁরা ঐ সভায় ছিলেন তাঁরা হলেন মুক্তিসঙ্ঘের হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস, জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখার্জির দলের নরেন ভট্টাচার্য (এম এন রায়), বরিশাল পার্টির নরেন ঘোষ চৌধুরি, আত্মোন্নতি সমিতির শ্রীশ মিত্র, বিমান ঘোষ, জগৎ গুপ্ত ও আশু রায় এবং সুরেশ চক্রবর্তী (বরিশাল)। এ কাজ সম্ভব নয় বলে নরেন ভট্টাচার্য ও নরেন ঘোষ সভারম্ভের একটু পরেই চলে যান। বাকী সবাই রাজি হন, শ্রীশ পাল ২৬এ আগস্ট কার কি কাজ হবে তাই বলে দেন। সুরেশ চক্রবর্তী, বিমান ঘোষ, জগৎ গুপ্ত ও আশু রায় ড্যালহৌসি স্কোয়ারে গোয়েন্দাদের ওপর নজর রাখবেন, কিছু দেখলে তক্ষুণি আশু রায়কে জানাবেন, সঙ্গীত দক্ষ আশু গান গেয়ে শ্রীশ পাল, খগেন দাস ও হরিদাস দত্তকে সতর্ক ক'রে দেবেন। শ্রীশ পাল,

অনুকূল মুখার্জি, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস বৌবাজারে শ্রীনাথ দাস লেনে শ্রীশ মিত্রের বাড়িতে জমায়েত হন। অনুকূল মুখার্জির ওপর ভার পড়ে বলিষ্ঠ পশ্চিমা-বলদ-টানা একটা গাড়ি সরবরাহ্ করা, হরিদাস দত্ত হবেন মূক ও বধির হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান, নিয়ে যাবেন ড্যালহৌসি স্কোয়ারে দুপুর বারোটায়, দেরি হওয়ায় বকুনি খাবেন শ্রীশ মিত্রের কাছে, যেন আগেই গাড়িটা ভাড়া করা ছিল। শ্রীশ মিত্র তারপর আরও ছ'টা মোষ-টানা গাড়ি সমেত নিয়ে যাবেন কাস্টমস হাউসে। পরিকল্পনা মত সব গাড়িতেই মাল তোলা হ'ল, বলা বাহুল্য, একটিতে বিশেষ ক'রে। সারাটা পথ শ্রীশ পাল ও খগেন দাস গাড়িটার দু দিকে রইলেন পাহারা ; গাড়োয়ান হরিদাস দত্ত। চুলটা হিন্দুস্থানীদের মতই ছাঁটা, ওদেরই মত পরনে ময়লা ধুতি আর গেঞ্জি, গলায় হিন্দুস্থানীদের মতই একটা লকেট কালো সুতোয় ঝোলানো। হরিদাস দত্ত ছেলেবেলা থেকে গরুর গাড়ি চালনায় ওস্তাদ ; রংপুরে তাঁদের বাড়িতে দুটো গরুর গাড়ি ছিল। হিন্দীও ভাল বলতে পারতেন কিন্তু বোবা থাকাই বেশি নিরাপদ। কাজটাকে পাকা করবার জন্য সেদিনই সকালবেলা ন'টায় মলঙ্গা লেনে অনুকূল মুখার্জির বাড়ির কাছে অনাথ কবিরাজের বাড়িতে শেষবারের মত মিলেছিলেন অনুকূল মুখার্জি, শ্রীশ পাল, শ্রীশ মিত্র, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস। শ্রীশ, হরিদাস ও খগেনকে একটি করে গুলী-ভরা রিভলভার দেওয়া হ'ল। অনুকূল মুখার্জির আনা গাড়িতে একটা শাবলও রাখা হ'ল। স্থির হয়েছিল, ধরাই যদি পড়ে তো শ্রীশ পাল ও খগেন দাস গুলী ছুঁড়তে আরম্ভ করবেন, আর হরিদাস দত্ত শাবল দিয়ে পেটি ভেঙে তিনজনে তিনটি মৌজার পিস্তল নেবেন। শ্রীশ পাল আগেই কিভাবে এই পিস্তল চালাতে হয় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর শ্রীশ মিত্র অফিসে যথা সময়ে হাজির হয়ে যান।

হরিদাস দত্তের গাড়িটা ছিল আর ছ'টা গাড়ির পেছনে, কোম্পানীর অফিসের কাছাকাছি এসে হরিদাসের গাড়ি ম্যাঙ্গো লেনে ঢুকে পড়ে, তারপর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট হয়ে মলঙ্গা লেনে আসে ও অনুকূল মুখার্জীর বন্ধু কান্তি মুখার্জীর ভাঙ্গাচোরা লোহার আড়তে মালগুলো নামানো হয়। অনুকূল মুখার্জী ওগুলোর ভার নেন। এদিকে শ্রীশ মিত্র (হাবু) ছ'টা গাড়ির মাল জমা দিয়ে আর একটা গাড়ি কোথায় গেল তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন এবং সেই যে বেরোনো, সন্ধ্যেবেলা শ্রীশ পালের সঙ্গে দার্জিলিং মেলে কলকাতা থেকে হাওয়া। শ্রীশ পাল রংপুর জেলার নাগেশ্বরী গ্রামের মুক্তিসঙ্ঘ সদস্য ডাঃ সুরেন্দ্র বর্ধনের প্রযত্নে হাবুকে রেখে পরের মেলেই কলকাতা ফিরে আসেন।

কান্তি মুখার্জির আড়ত থেকে মালগুলো একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি করে হিদারাম ব্যানার্জি লেন ও জেলেপাড়া লেনের মোড়ে এক বাড়িতে নেওয়া হয়। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশমত ডিক্সন লেনের সতীশ দে, বসন্ত দাস ও জগৎ গুপ্ত কুলিবেশে ৩নং জেলেপাড়া লেনে ভুজঙ্গধরের বাড়িতে বাক্সগুলো নিয়ে যান ও একটা ছোট ঘরে রাখেন। মালপত্র সব নতুন নতুন ট্রাঙ্কে ভরে কাগজপত্রসমেত পেটিগুলো পুড়িয়ে ছাই করেন। দুপুর রাত অবধি এই কাজ চলে। এরপর বিলি করবার পালা—বিপিন গাঙ্গুলী, হরিশ সিকদার ও অনুকুল মুখার্জীর নির্দেশ মত।

যাদুগোপাল মুখার্জিও একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে এক ট্রাঙ্ক-বোঝাই পিস্তল নিয়ে রাখেন শ্যামবাজার স্ট্রীটে নিঝ'রিণী সরকারের বাড়িতে—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দিতে হবে ব'লে। বরিশাল পার্টির নরেন ঘোষ চৌধুরিও কিছু অংশ পান। বীরভূম জেলার নলহাটিতে নিবারণ ঘটক ও দু'কড়ি দেবীর হেফাজতে একটি বাক্স রাখেন রণেন গাঙ্গুলী। হরিদাস দত্ত ও শ্রীশ পাল প্রথমে জোড়াবাগান এলাকায় একটা ভাড়া করা ঘরে ১১টি বাক্স ২১,০০০ গুলী রাখার বন্দোবস্ত করেন, পরে, বড়বাজারের কাছে এক মারোয়ারি বিধবার বাড়িতে রাখেন; হরিদাস দত্ত এখানেই ধরা পড়ে যান। চন্দননগরেও ট্রাঙ্কে ক'রে কিছু নিয়ে যাওয়া হয়। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, ফুলচাঁদ প্রমুখ কয়েকজন মারোয়ারিও এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'র পর রাসবিহারী বসু এমনি একটি অস্ত্র সঙ্গে রাখতেন; ভারত ছেড়ে জাপান যাত্রার আগে তিনি ওটি শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও গিরিজাবাবুর কাছে দিয়ে যান।

ব্যাপক বিলি-বন্দোবস্তের ফলে পুলিশ স্বভাবতঃই প্রমাদ গুণতে লাগল।...... এর ফলে সরকারী আমলারা, পুলিশ ও জনসাধারণ কি ভয়ানক বিপদের মুখে পড়েছিল তা বাড়িয়ে বলার দরকার করে না। কলকাতা ও ঢাকা শহর, হাওড়া ও রংপুর, রাজসাহী ও ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও ২৪ পরগণা, নদীয়া ও বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংয়ে ছড়ানো অন্তত ২০টা ডাকাতি, ১২টি হত্যাকাণ্ড, তিনটি সজ্ঘর্ষ এবং একটি খণ্ড যুদ্ধে এই পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছে। কাল—১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ থেকে আগস্ট, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন। (টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ, শ্রীমতী উমা মুখার্জী, পৃঃ ৪৫-৫৬)।

মোট লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ২,৯২,৭০৪ টাকা। এর মধ্যে রংপুর জেলার কুরুলের ডাকাতিটি নানা কারণে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। লুণ্ঠিত সম্পদের মূল্য সর্বাধিক —৫০,০০০ টাকা—এইজন্যই নয়, এতাবৎকাল নির্বিঘ্ন উত্তরবঙ্গে এই জাতীয় অর্থ

সংগ্রহের প্রচেষ্টাও অভূতপূর্ব। এর পর অবশ্য রাজসাহী জেলার ধরাইলে হয়েছে, কিন্তু এখানে লুণ্ঠিত সম্পদের পরিমাণ অর্ধেক। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি ২০।২৫ জনের একটি যুবা দল কুরুলের এক বাড়িতে জোর করে ঢোকেন এবং গৃহ-মালিকের হিসেব মত পূর্বোক্ত টাকার সম্পদ নিয়ে নেন। তাঁরা যে মৌজার পিস্তল ব্যবহার করেন সেখানে ফেলে যাওয়া নিঃসার কার্তুজই তার প্রমাণ। এঁরা সবাই মুখোশ পরে এসেছিলেন। সন্দেহক্রমে অবশ্য ১১ই ফেব্রুয়ারি দুটি যুবককে কলকাতায় ধরা হয়। ডেঃ ইন্সঃ জেনাঃ অব পুলিশ, রংপুর জেলার পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রায় সাহেব নন্দকুমার বসু এই ডাকাতি সম্পর্কে তদন্ত করছিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি চারজন যুবক রায় সাহেবের খোঁজ নেন। দু'জন বাড়ির ভেতরে যান। যেই রায় সাহেব বেরিয়েছেন অমনি তিন চারবার পিস্তল গর্জে ওঠে। রায় সাহেব আর একটা ঘরে পালিয়ে বাঁচেন। তাঁর ভৃত্যের পায়ে একটি গুলী লাগে, আর, বাইরে দাঁড়ানো তাঁর যে আর্দালি আততায়ীদের ধরতে চেষ্টা করে সে দুটি গুলীতে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে,মারা যায়। চারটি মৌজার পিস্তলের খোল পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে লক্ষ্য ছিলেন রায় সাহেব, কেননা,তদন্তের নামে তিনি পীড়নের বাড়াবাড়ি করছিলেন। ধরাইলের ডাকাতিতেও ৩০।৪০ জন যুবক লাল মুখোশ পরে এক মহাজনের বাড়ি হানা দেন, ২৫,০০০ টাকার সম্পদ কেড়ে নেন, একজন দরোয়ান গুলীতে মারা যায়, অন্য দুটি লোক আহত হয়। এখানেও মৌজার কার্তুজের খোল পাওয়া যায়।

কলকাতার গার্ডেনরীচে যে ডাকাতি হয় তা একালের এক অভিনব ঘটনা: ট্যাক্সি-ডাকাতি। সিডিসান কমিটি বলেছেন, এ কাজটি যাঁরা করেছেন তাঁরা যতীন (কমিটি Jatin বানান করেছেন) মুখার্জী ও বিপিন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় করেছেন। খুব সযত্ন-রচিত প্ল্যান। কলকাতার চাটার্ড ব্যাঙ্ক থেকে বার্ড এণ্ড কোম্পানীর ভৃত্য ২০,০০০ টাকা নিয়ে হুগলীর ভাঁটিতে গার্ডেনরীচে কারখানার দিকে যাচ্ছিল। টাকাটা সাফল্যের সঙ্গে তুলে নেন যাঁরা এসেছিলেন ওটা নিতে এবং কলকাতায় ওঁদের "অর্থ-মন্ত্রীর" হাতে যথারীতি জমা দেন। গার্ডেনরীচের পরই বেলেঘাটার ডাকাতি। এটিও ট্যাক্সি-ডাকাতি এবং যতীন মুখার্জীর পরিচালনায়। এক চাল-কারবারীর টাকা। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সম্ভবত কোন রকম বেয়াড়াপনা করেছিল, পরদিন তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। চারদিন পর ইন্সপেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জি নিহত এবং তাঁর আর্দালি আহত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা উৎসবে বড়লাটের আসবার কথা। তাই ইন্সপেক্টর সেখানে এসেছিলেন বিপ্লবীদের (কমিটির ভাষায়

এনার্কিস্টদের) ওপর নজর রাখিবার জন্ত। তিনি দেখতেও পান একজনকে। ধাঁ ক'রে ছুটে গেলেন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। জানতেও পারলেন না, তিনি বিপ্লবীদেরই ফাঁদে পড়ে গেছেন। ধৃতপ্রায় বিপ্লবীর সঙ্গে সঙ্গে আরও চারজন গুলী করলেন সুরেশকে। সিডিসান কমিটি বলেছেন এই হত্যাকাণ্ডের প্ল্যানও যতীন মুখার্জীর। এই ব'লে কমিটি 'জার্মান প্লট' এড়িয়ে সোজা চলে গেছলেন একেবারে বালেশ্বর জেলার চাষখন্দের সংগ্রাম ক্ষেত্রে এবং যতীন মুখার্জীর ওপর অকস্মাৎ যবনিকা টেনে দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা বাঙলার বিপ্লব সাধনার সংক্ষিপ্ত তথ্য সমাবেশেও অত দ্রুত চলতে পারিনে। এত নৈপুণ্যে ও এত ঝুঁকি নিয়ে যে অস্ত্র সংগ্রহ হল শেষ পর্যন্ত তাদের কি গতি হয় সে তথ্য এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। পুলিশ তৎপরতায় ওগুলো ক্রমশ বিপ্লবীদের হাত-ছাড়া হয়েছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এক সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ৩নং রামলাল লেন থেকে ৯৬০টি, ৬১।১।১ ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে ১০০০ এবং বড়-বাজারে ৩৪নং শিবঠাকুর লেন থেকে ২১,০০০ কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এই শেষের ঠিকানাতেই হরিদাস দত্ত ধরা পড়েন। পিস্তলগুলোর মধ্যে চাষখন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যায় তিনটি, ৩৯ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটি, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কাছ থেকে পুরো গুলী ভর্তি একটি (অতিরিক্ত ৩০টি গুলী), ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের কাছ থেকে আর একটি, চন্দননগরে গোঁদলপাড়ায় তিনকড়ি ব্যানার্জীর বাড়ি থেকে চারটি (গুলী ২৪১), বীরভূম জেলার ঝাউপাড়ায় দুকড়ি দেবীর বাড়ি থেকে সাতটি (১১,০০০ গুলী), হাওড়া-সালকিয়ায় যুগলকিশোর দত্তের কাছ থেকে একটি এবং ঢাকার কলতা বাজারে তারিণী মজুমদার ও নলিনী বাগচীর কাছ থেকে দুটি উদ্ধার করা হয়। কিন্তু শেষ দুটি ক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধে পাওয়া যায়নি। শেষ যুদ্ধে তারিণী ও নলিনী প্রাণপাত করেন; অপর পক্ষে এক হেড কনস্টেবলের প্রাণ যায়; এক সাব-ইন্সপেক্টর আহত হন।

হরিদাস দত্ত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে বমাল গ্রেপ্তার হবার আগেই ৫ই সেপ্টেম্বর চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৩৯ মলঙ্গা লেন), কালিদাস বসু (৭ হালদার লেন) গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪।৩ মলঙ্গা লেন), নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪।৩ মলঙ্গা লেন), ভুজঙ্গভূষণ (দাস) ধর ও বৈদ্যনাথ বিশ্বাস (২৭।১ শিবনারায়ণ দাস লেন)-এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে এক মামলা রুজু হয়; সওয়ালের পর ৯ই অক্টোবর বৈদ্যনাথের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহৃত হয়। ২০এ অক্টোবর মামলা শুরু হয় হরিদাস (কুঞ্জ, অতুল্য) দত্ত (৪৬ বৈঠকখানা রোড),

আশুতোষ রায়, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা ও উপেন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে। প্রভুদয়াল ও উপেন ছাড়া পান। এরপর ২০এ অক্টোবরই দুই মামলা একীকৃত করা হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মার্চ অনুকূল,গিরিন ও আশু বেকসুর মুক্তি পান। হরিদাস, কালিদাস, বরেন ও ভুজঙ্গর দু'বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করা হ'লে হরিদাসের দণ্ড পাঁচ মাস কমিয়ে দেওয়া হয়। তখন সরকারপক্ষ হরিদাসের দ্বিতীয় মামলা থেকে অব্যাহতির বিরুদ্ধে আপীল করেন ; পুনর্বিচারের আদেশ হয় ; ফলে, এবার দু'বছর দণ্ড হয় ; সর্বসাকুল্যে দাঁড়ায় তিন বছর সাত মাস। আর এই সমগ্র নাটকের নায়ক শ্রীশচন্দ্র প্রথমে আশ্রয় নেন রংপুরের নাগেশ্বরী আশ্রমে। পরে একেবারে নিরুদ্দেশ।

মৌজার থেকে জার্মানী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)-কে বাঙলার বিপ্লব-সাধকেরা পুরোপুরি কাজে লাগাবার যে চেষ্টা করেন সিডিসান কমিটি তার নাম দিয়েছেন 'জার্মান প্লট' এবং সমগ্র প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় সহর্ষে এই ব'লে উপসংহার করেছেন যে, "জার্মান-অস্ত্র-প্রাপ্তির ব্যাপারটা আমরা খতিয়ে দেখে বুঝেছি যে, সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীরা অতিমাত্রায় আশান্বিত ছিলেন এবং যে-জার্মানদের সান্নিধ্যে তাঁরা এসেছিলেন তাঁরা (ঐ জার্মানরা) যে-আন্দোলনের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।"

কিন্তু বাঙলার বিপ্লবীরা ভারতের কোন কোন প্রান্তের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে কি এক অসাধারণ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন জার্মানীতে এবং সংযোগ স্থাপন করেছিলেন ভারতবর্ষে তা সিডিসান কমিটিও তাচ্ছিল্য করতে পারেন নি। একটা পুরো অধ্যায় ভরে তার বিবরণ দিয়েছেন। বার্লিন কমিটির অন্যতম ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর "ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা"য় লিখেছেন :

বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অবিনাশ ভট্টাচার্যকে জড়িয়ে ধরলেন যখন অবিনাশ বীরেন্দ্রকে খবর দিলেন : বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বীরেন্দ্রনাথ ফ্রান্স থেকে চলে এলেন জার্মানীতে যখন বুঝলেন সেখানে ইংলণ্ড-বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব নয়। বীরেন ও অবিনাশ দুজনই ছিলেন হালে (Halle) শহরে। চট্টোপাধ্যায় তখন আতস কাঁচ দিয়ে প্রুফ দেখছিলেন।

ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বৃটেনের প্রতিকূলে একটা জার্মান প্রশস্তি বেরোলো ; কিন্তু (জার্মান) সরকারপক্ষ থেকে কোনো সাড়া নেই। অবিনাশের তৎপরতায় একটা কূল পাওয়া গেল ; বীরেন জার্মান ফরেন অফিসে যাবার ডাক পেয়েছেন, বীরেন অবিনাশকে বললেন, ভট্টাচার্য, ভাই, তোমার দ্বারা যদি জীবন সার্থক হয়। অবিনাশকে বুকে ধরে রাখলেন কিছুকাল। টেলিগ্রাম চলে গেল :

"ব্যারণ বার্থাইম, পররাষ্ট্র দপ্তর, বার্লিন। কাল সকালবেলা ইওর এক্সেলেন্সির সঙ্গে দেখা করছি।" —চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী।"

ট্রাঙ্ককলে জার্মান ভাষায় উৎসাহব্যঞ্জক খবর দিয়েছিলেন চট্টোপাধ্যায় অবিনাশকে। তার পরদিন সশরীরে হাজির। বললেন, এতকাল বৃটেনের মিত্র

ফ্রান্সে ব'সে পণ্ডশ্রম করেছি। খেতে ব'সে ওঁরা স্থির করলেন ব্যারণের কাছে কি কি চাইতে হবে। এবার দু'জনে বার্লিনে গেলেন। যোগাযোগ হ'তে লাগল। হার নয়ম্যান নিয়ে গেলেন ব্যারণ ওপেনহাইমের কাছে। স্টেনোটাইপিষ্ট ভালটার ষ্টাইনহার্ট বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তাগিদে ছুটে এলেন। ওঁরা দু'জন কি কি চাই জানালেন: চাই অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, সুদক্ষ সেন্যাধ্যক্ষও; চাই সহকর্মীদের অগোচরে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা; স্প্যাণ্ডাও বিস্ফোরক কারখানায় শিক্ষা ব্যবস্থা; সামুদ্রিক মাইন প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা; বিবৃতি ইত্যাদি ছাপবার সুবন্দোবস্ত; ইস্তাহার প্রেরণ ও প্রচারের জন্য প্লেন; যে কোন প্রকারে ভারতের উপকূলে গোলা-গুলী, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রেরণের ব্যবস্থা; চাই ১০ টাকার ভারতীয় কারেন্সি নোট ছাপাতে; ইন্দো-জার্মান কমিটি গড়তে; বিপ্লব সফল হলে ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; ভারতীয় রাজন্যবর্গকে সাহায্য না করে অষ্ট্রো-জার্মান শক্তি পরিকল্পিত প্রজাতন্ত্রকেই সাহায্য করবেন; বিপ্লব ব্যর্থ হ'লে ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মানীতে আশ্রয়দান ও ফরাসী গবর্মেন্টের অনুকরণে সভারকরকে ইংরাজের হাতে অর্পণের মত কোন বিপ্লবীকে অর্পণ না করার প্রতিশ্রুতি।

ব্যারণ বললেন, অসম্ভব না হ'লে সব শর্তই পালন করা হবে। তিনি জাল নোট ছাপাবার শর্তটি গ্রহণ করলেন না।

চানজী কেরসাস্পকে পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল, ব্যারণের কাছে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নয়টি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের যত ভারতীয় ছাত্র ছিলেন ঠিকানা সমেত তার একটা নিখুঁত তালিকা। খবর পেয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাই ধীরেন সরকার এলেন, এলেন মারাঠি এন এস মারাঠে। অবিনাশের বাল্যবন্ধু ডঃ জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত বাসেল (Basel) থেকে এবং পি পদ্মনাভন পিল্লাই জুরিখ থেকে হাজির।

সিডিসান কমিটি লিখেছেন: "১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জুরিকে 'আন্তর্জাতিক ভারত-পন্থী কমিটি' নামে অভিহিত একটি সংস্থার প্রেসিডেন্ট, এক তামিলী যুবক, চম্পক রমন, জার্মানীতে বৃটিশ-বিরোধী সাহিত্য প্রচারের অনুমতি পাবার জন্য জুরিকে জার্মান কন্সালের কাছে এক আবেদন করেন। বার্লিনে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করার জন্য তিনি জুরিক ছেড়ে যান। সেখানে তিনি জার্মান জেনারেল স্টাফের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে 'ভারতীয় জাতীয় পার্টি' (ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল পার্টি) প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্যদের মধ্যে গদরের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়াল, তারকনাথ দাস, বরকতুল্যা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল গুপ্তও ছিলেন। শেষের

দু'জন স্যান ফ্রান্সিস্কোতে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন বন্দী ছিলেন।"

ডঃ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর "ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা"-র ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সিডিসান কমিটির এই রিপোর্টটি ভুল। "প্রো-ইণ্ডিয়েন সোসাইটি" ও "প্রো-ইণ্ডিয়েন" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সি পদ্মনাভন পিলাই, তাঁর ভাই চম্পক রমন নন। দ্বিতীয়ত কমিটির সভ্য বলে যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে তাঁরা কেউ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত বার্লিনে পদার্পণ করেন নি। পক্ষান্তরে, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' বলেছেন, ডঃ ভট্টাচার্য দুই পিলাইয়ের নাম গোলমাল করেছেন। শ্রীমতী উমা মুখার্জি তাঁর বইয়ে চম্পক রমন পিল্লাইকেই কমিটি সদস্য বলেছেন।

যে কারখানায় জার্মানীর বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি হয় সেই স্প্যাণ্ডাও কারখানা দেখে এলেন ডঃ বিষ্ণু সুকতাঙ্কর, ডঃ যোশী গোপাল পরাঞ্জপে, করণ্ডিকর, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র রায়, শম্ভাশিব রাও, মারাঠে, চানজী কেরসাস্প, ধীরেন সরকার ও অবিনাশ। বোমা, হাতবোমা, ল্যাণ্ডমাইন, ডিনামাইট ইত্যাদি দেখানো হ'ল। স্থির হ'ল, প্রথমত বাংলা ও মারাঠীতে ইস্তাহার লেখা হবে, তারপর তা থেকে অন্যান্য ভাষায়। শেষ পর্যন্ত অবিনাশচন্দ্রের বাংলা খসড়াটি থেকেই বাকীগুলো হ'ল, কেননা, ডঃ যোশী রচনা শেষ ক'রে উঠতে পারেননি। ইংরাজি ও হিন্দী অনুবাদ করলেন ডঃ সুকতাঙ্কর, উর্দু ও আরবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মারাঠী মারাঠে, পার্শি ও পুস্তু কেরসাস্প, তামিল কেরল শম্ভাশিব, গুজরাটি ও মালয়ালি যোশী এবং গুরুমুখী ও পাঞ্জাবী শ্রীশচন্দ্র। বাংলা টাইপ ছিল না, লিখে ব্লক করতে হ'ল।

আরও এসে যোগ দিলেন আরবী ভাষাতত্ত্বের ছাত্র মনসুর আহমেদ এবং হায়দরাবাদ স্টেট স্কলার সিদ্দিক। চীন ভাষাবিদ্ ডঃ হারবার্ট মূলার জার্মান সরকারের সম্মতিতে হলেন এঁদের লিয়াজোঁ অফিসার। ডঃ সুকতাঙ্করের সভাপতিত্বে "ভারত-বন্ধু জার্মান সমিতি" গঠিত হ'ল; সমিতির সভাপতি হলেন স্যার আলবার্ট ব্যালিন, সেক্রেটারি ধীরেন সরকার।

ভারত উপকূলে অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন: "আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা আমাদিগকে বিশেষ লজ্জা দিয়াছিল।" কারণ, "উড়িষ্যার উপকূলের চিত্র দেখিয়া কোন্ স্থান অস্ত্র নামাইবার পক্ষে উপযুক্ত তাহা আমরা বলিতে পারি নাই।" দেখা গেল, আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীদের মুক্ত

করা যতখানি আবেগপ্রবণতার কথা, তাঁদের মুক্ত ক'রে কোথায় নামানো হবে তা ঠিক ততখানি কঠিন প্রশ্ন। "এমডেন"-এর দৌরাত্ম্যে অবশ্য বৃটিশ শক্তি কাঁপছে কিন্তু বন্দীদের ব্যাটাভিয়ায় নামিয়ে দিলে ডাচ সরকার তাঁদের বৃটিশ সরকারের হাতে প্রত্যর্পণ করবেন ও বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড হবে। স্থির হ'ল ধীরেন সরকার ও এন. এস. মারাঠেকে আমেরিকায় পাঠানো হবে। তাঁরা ওয়াশিংটনে পৌঁছেও গেলেন।

অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে কোথায় নামাতে হবে তার ভার ছিল জার্মান এডমিরালটির ওপর। অস্ত্র-শস্ত্র ভারত উপকূলে পৌঁছোচ্ছে খবর পেলেই অবিনাশ প্রমুখের ভারত-যাত্রা স্থির হয়। তার আগে কাইজারের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর মনোভাব জানবার আশা তাঁদের পূরণ হয়নি; চ্যানসেলারের সঙ্গে আলাপ ক'রেও তৃপ্তি পাননি। পরে তাঁদের সঙ্গে কাইজারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স হাইনরিখের সঙ্গে দেখা হয়। অবিনাশ, সতীশচন্দ্র রায় ও শম্ভাশিব রাও স্বদেশ যাত্রা করেন ১লা অক্টোবর। এর আগে যাত্রা করেছেন ডঃ যোশী, অধ্যাপক শ্রীশ সেন প্রমুখেরা। ইতিমধ্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এসে বার্লিন কমিটিতে যোগ দিয়েছেন।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর "অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস"-এ লিখেছেন: "জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সময় দেশে ও বিদেশে ভারতবর্ষীয় বৈপ্লবিকেরা কি কি কর্ম করিয়াছিলেন, রোলাট রিপোর্টে* তাহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু এই রিপোর্ট 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' ও 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' করা হইয়াছে। এই পুস্তক পড়িয়া অনুভূতি হয় যে, ইংরেজের গোয়েন্দারা সব সংবাদ পায় নাই এবং যাহা পাইয়াছে তাহাও অসম্পূর্ণ পাইয়াছে।......অনেক সংবাদ এমন প্রকারে ভুল বা উল্টাপাল্টা হইয়াছে যাহা ঐতিহাসিক সত্যের একেবারে বিপরীত।"

অবিনাশচন্দ্রও তাঁর বইয়ে বলেছেন, ভূপেন্দ্রনাথও তাঁর বইয়ে বললেন—"কোমাগাটা মারু জাহাজের ব্যাপার জার্মান সাহায্যে ঘটিত হইয়াছিল, আর বিগত যুদ্ধের সময় ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে জার্মান সেনাপতি বার্নহার্ডি

* সিডিসান কমিটি রিপোর্ট ও রোলাট রিপোর্ট একই, এই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন Mr. Justice (S.A.T.) Rowlatt, Judge of the King's Bench Division of His Majesty's High Court of Justice, তাই তাঁর নামেও রিপোর্টটি প্রচলিত, ডঃ দত্ত লিখলেন রোলাট, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন রৌলট, সাধারণে বলে রাউলট। এই রিপোর্টের মলাটে ও টাইটেল পেজে লেখা আছে সিডিসান কমিটি, ১৯১৮, রিপোর্ট।

আমেরিকায় গদর পার্টির নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগত যুদ্ধের আভাষ দিয়া আসিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের পূর্বে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সহিত জার্মান গভর্ণমেণ্টের কোন সংস্রবই ছিল না।"

ডঃ দত্ত বলেছেন, বার্লিন কমিটির সরকারী নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি'। তিনি প্রসঙ্গত আরও বলেছেন, বর্তমানে (তাঁর বইয়ের প্রকাশকাল খৃষ্টাব্দ ১৯৫৩, এপ্রিল ; বঙ্গাব্দ ১৩৬০, বৈশাখ ; কিন্তু লেখা সম্ভবত খৃষ্টাব্দ ১৯৫২, ৩০ মার্চ বা বঙ্গাব্দ ১৩৫৯, ১৭ই চৈত্রের আগে) শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে এম এন রায় বার্লিন কমিটি ও তাহার কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ও মিথ্যা কথা সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছেন। (এইসব কুৎসার প্রতিবাদ করেছেন অবিনাশচন্দ্র শেষোক্ত তারিখে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে।)

রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার পক্ষে এ এক মস্ত অন্তরায়। এম, এন, রায় লিখেছেন বার্লিন কমিটির বিরুদ্ধে—যে কমিটির তিনি কেউ নন ; কমুনিষ্ট পার্টি ভেঙে দু'টুকরো হ'লে সি-পি-এম নেতা মজঃফর আহমেদ লিখলেন এম, এন, রায়, অবনী মুখার্জী, ডাঙ্গে প্রমুখের বিরুদ্ধে ; সি-পি-আইয়ের গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা লিখলেন মজঃফরের বিরুদ্ধে ; রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'সাহিত্য ধর্মে' চীৎপুরের রাস্তার ধুলো পাঁক নিয়ে হোলিখেলার মত। একমাত্র উপসংহার এই যে, দলবাজেরা অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতাবশত কুৎসিত কলহে প্রবৃত্ত হতে পারে, ইতিহাস লিখতে পারে না, সে যোগ্যতা বা দৃষ্টিই তাদের নেই। মুস্কিল এই, ওগুলো না পড়েও উপায় নেই, কিন্তু অশ্লীল বইয়ের মত পাঠককে পীড়িত করে মাত্র ; তাই ওগুলো অশ্রদ্ধেয়, অপাঙ্‌ক্তেয়।

ডঃ দত্ত বলেছেন, "তিনি যখন ছদ্মবেশে নানাস্থান হইতে ঘুরিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে (অবিনাশ বলেছেন মে মাসে) উপনীত হন, তখন কমিটির অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। তখন ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী-সম্পর্ক-বিরহিত ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতি ; নাম—ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি।......কমিটি লেখককে এবং মনসুরকে একটি নিয়ম প্রণালী (কন্সটিটিউসন) গঠন করিবার ভার দেন।" কাদের নেওয়া হবে এ নিয়ে দু'জনের মতানৈক্য হয় এবং কমিটি মনসুরের মত গ্রহণ ক'রে খৃষ্টানদের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ ক'রে দেন।

ডঃ দত্তের একথাগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ঃ "বাঙ্গলার সহিত বিদেশের বৈপ্লবিক কর্মের কি সম্বন্ধ এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার উত্তর এই যে, ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের বঙ্গের ও উত্তর ভারতের বিপ্লবোদ্যমের সহিত বাহিরের কর্মের বিশেষ সংযোগ ছিল।

······বঙ্গভাষী বৈপ্লবিকেরা দেশের সতীর্থদের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে কর্ম করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসের এক অধ্যায়।······

"ভারতীয় বৈপ্লবিকদের জার্মান সাহায্য গ্রহণ সমীচীন হইয়াছিল কিনা এই প্রশ্ন যুদ্ধের পরে উত্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বৈপ্লবিকেরা ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত দেখান যে, পৃথিবীর সর্বত্রই নিপীড়িত জাতি শাসকের শত্রুর সাহায্যলাভ করিয়াছে।······রাজনীতির প্রধান মন্ত্র, নির্মল বৈপ্লবিকতার শুভ্রপতাকাধারী বলশেভিকেরাও কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলেন; কেবল দোষ হইয়াছে ভারতবাসীদের, কারণ 'Nothing succeeds like success"···

"এই অজ্ঞাত নগণ্য বিদেশস্থ বৈপ্লবিক যুবকদের কার্যের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল।······তাঁহারা ভারতের (Foreign diplomacy) বৈদেশিক কূটনীতি স্থাপনের অগ্রদূত।···

"······যদি বার্লিন ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি প্রতিষ্ঠিত না হইত তাহা হইলে ভারতে ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের বৈপ্লবিক চেষ্টা হইত না, বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশে কোন প্রচেষ্টাই হইত না।

"সে এক সময় গিয়াছে!···যিনি তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি জানেন, সে কি উৎসাহ, আশা ও ভরসার দিন গিয়াছে। 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারও ঋণ' বৈপ্লবিকদের পক্ষে এ আখ্যান সত্যই ছিল। সাহসে ভর করিয়া দেশবিদেশে তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। বিনা পাশপোর্টে ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন; জিব্রাল্টারের পথ দিয়া ইউরোপে আসিয়াছেন। সে পথ বন্ধ হইলে ব্রিটেনের মাথা বেড়িয়া বার্লিনে উপস্থিত হইয়াছেন ও প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ···কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যুবকের দল তথায় গমন করিয়াছে।···সুয়েজ খাল রাত্রে সন্তরণ করিয়া মিশরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে; তৎক্ষণাৎ এক বাঙ্গালী ও এক মাদ্রাজি দুই তরুণ যুবক (বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীমাণ্ডেয়ম প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম ত্রিমূল আচারিয়া) জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল। মেদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক হিন্দু বাঙ্গালী তরুণ যুবক (বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) যাইতে প্রস্তুত হইল। সুদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত দেশসমূহে গিয়া অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে, অমনি বঙ্গভাষী ও পাঞ্জাবী যুবকের দল লাগিয়া গেল। ইরান ও বেলুচিস্থানের মরুভূমি পার হইয়া ভারতে অস্ত্র পাঠাইবার জন্ত যুবকের দল দৌড়িয়া যাইল।

"ভারতের সর্বদিকে বিশিষ্ট লোকদের কাছে লোক পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু …পাঞ্জাব ও বঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বৈপ্লবিকদের সাড়া পাওয়া যায় নাই।…

"বঙ্গে বার্লিন কমিটি সংস্থাপনের ও জার্মান সাহায্যের বার্তা ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রেরণ করা হয়। অর্থও লোক দ্বারা প্রেরিত হয় এবং সে অর্থ নিরাপদে পৌঁছায়।"

অবিনাশচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন, ভারত মহাসাগরে এমডেন থাকলেও ব্যারণ বলেছিলেন, সে এত দূরে যে আন্দামান সম্পর্কে কোন খবর তাঁকে পাঠানো অসম্ভব। তবু ভূপেন্দ্রনাথ আন্দামান আক্রমণ ও বন্দীমুক্তির গল্পটি তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, বার্লিন কমিটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে [অর্থাৎ যে-মাসে ভূপেন্দ্রনাথ বার্লিনে যান] ভিনসেন ক্রাফট নামে একজন জার্মানকে যবদ্বীপের রাজধানী ব্যাটেভিয়ায় পাঠাইয়া দেন।" তিনি নাকি আন্দামান মুক্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু "ক্রাফ্‌ট সিঙ্গাপুরে ইংরেজ কর্তৃক ধৃত" হন। সুতরাং, আন্দামান-প্রচেষ্টা ওখানেই শেষ হয়। ক্রাফটের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রেরিত, ফণী চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ভূপতি মজুমদার এক হোটেলে দেখাও করেন।

সিডিসান কমিটি রিপোর্টে আন্দামান সম্পর্কে কোন কথাই নেই।

সিডিসান কমিটি রিপোর্ট করেছেন: জার্মানরা ভারতীয়দের প্রধানত বৃটিশ-বিরোধী সাহিত্য রচনায় নিয়োগ করেছিলেন। গ্রেট বৃটেনের ক্ষতির উদ্দেশ্যে ওগুলো নানা জায়গায় বিলিও করা হয়েছিল। পরে অবশ্য এঁদের অন্যান্য কাজেও নিয়োগ করা হয়। জার্মানরা যেসব ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী ক'রে এনেছিলেন তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের ভার দেওয়া হয়েছিল বরকতুল্যার ওপর। বার্লিন অফিস কোড কোন এক সময়ে ন্যস্ত হয়েছিল পিল্লাইর ওপর; তিনি ওটা এনে আমস্টার-ডামে আমেরিকা হয়ে ব্যাঙ্ককে যাচ্ছেন এমন এক এজেন্টের হাতে অর্পণ করেন; সেখানে একটা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তপারে যুদ্ধসংবাদ পাচার করবেন। হেরম্বলাল গুপ্ত কিছুকাল আমেরিকায় জার্মানীর ভারতীয় এজেন্ট ছিলেন। পরে গুপ্তের স্থলাভিষিক্ত হন চক্রবর্তী। বার্লিন পররাষ্ট্রদপ্তর থেকে জিমারমান (Zimmerman)-স্বাক্ষরিত, ১৯১৬, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক চিঠিতে ছিল: "অতঃপর ভারতবর্ষসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ডঃ চক্রবর্তী যে কমিটি গঠন করবেন একান্তভাবে সেই কমিটিই দেখাশুনা করবে। অতএব বীরেন্দ্র সরকার ও হেরম্বলাল গুপ্ত এখানকার ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটির স্বতন্ত্র প্রতিনিধি রইলেন না। হেরম্বলাল গুপ্ত ইতিমধ্যে জাপান থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছেন।

সিডিসান কমিটির মতে জার্মান অভিসন্ধির তিনটি ভরসা ছিল ঃ উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের মোসলেম অসন্তোষ। স্যান ফ্রান্সিস্কোর গদর পাটি ও বাঙালী বিপ্লবীরা। এর কেন্দ্রস্থল ছিল ব্যাঙ্কক ও ব্যাটাভিয়া। ব্যাঙ্কক পরিকল্পনা নির্ভর করছিল প্রধানত গদর পার্টির শিখদের ওপর, আর ব্যাটাভিয়া পরিকল্পনা প্রধানত বাঙালী বিপ্লবীদের ওপর। দুটোরই পরিচালক ছিলেন ওয়াশিংটনে জার্মান-দূতাবাসের হুকুমত মত সাংহাইয়ের জার্মান কন্সাল (বাণিজ্যদূত)। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে মারাঠী পিংলে ও বাঙালী সত্যেন্দ্র সেন আমেরিকা থেকে সালামিস (Salamis) জাহাজে কলকাতা এলেন। সত্যেন্দ্র কলকাতায় থেকে গেলেন, পিংলে চলে গেলেন উত্তর প্রদেশাঞ্চলে। এই সময়ে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি, পুলিশের কাছে খবর আসে যে, স্বদেশী বস্ত্র বিপণি "শ্রমজীবী সমবায়ের" ভাগীদার রামচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী প্রচুর অস্ত্র সঞ্চয়ের জন্য যতীন্দ্র মুখার্জী, অতুল ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলার বিপ্লবীরা সম্মিলিত হয়ে স্থির করেন, জার্মানদের সাহায্যে সারা ভারতে এক অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা সুসংগঠিত করবেন এবং শ্যাম ও অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বাঙলার সংযোগ সাধন করবেন।

আমরা এবার এমন সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি যেখানে সারা ভারতে পর পর দুটি বিপ্লব-প্রচেষ্টার নায়ককে অনুসরণ না করলেই নয় ; একজন রাসবিহারী বসু, দ্বিতীয় জন জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখার্জি।

"বিপ্লব নিরন্তর"

ভদ্রেশ্বরের ছেলে ও চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজের ছাত্র রাসবিহারী শিক্ষকদের সঙ্গে কলহের ফলে ঐ বিদ্যামন্দির ছাড়তে বাধ্য হন ও কলকাতার মর্টন স্কুলে ভর্তি হন। লাঠি-খেলায় দক্ষ এই মানুষটি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে ঢোকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন; বাঙালীকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয় না। সিমলার কপি-হোল্ডারের কাজ ছেড়ে তৃতীয়বারের জন্য ঘর-ছাড়া হন। দেরাদুনে 'টেগোর ভিলা'র তত্ত্বাবধায়ক অতুলচন্দ্র বসুর সৌজন্যে আশ্রয় পান ও এক যুবকদল গঠন করেন; বোমা তৈরির আয়োজনও করেন। একাজে সহযোগী ছিলেন অতুল, হরিপদ বসু, শৈলেন ব্যানার্জি, মাঝে মাঝে এলাহাবাদের উকিল যোগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। কালক্রমে এক গুপ্ত সমিতির উদ্যোগী জিতেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জির সংস্পর্শে আসেন। পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশ তখন ছিল বাঙালী বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে মনোমালিন্য হবার পর যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কলকাতা ছেড়ে ভারত সফর ক'রে বেড়াচ্ছেন; স্বরাজের জন্য পাঞ্জাবে লালচাঁদ ফালক, ভগৎ সিংহের পিতা কিষণ সিং, লালা লাজপত রায়, সর্দার অজিত সিংকে আম্বালার ডাঃ হরিচরণ মুখার্জি, পেশোয়ারের চারুচন্দ্র ঘোষ ও শিয়ালকোটের লালা অমর দাসকে অনুপ্রাণিত করেন। লালা হরদয়ালও এই স্বরাজসাধনায় যোগ দেন। হরদয়াল ইউরোপ যাত্রাকালে জিতেনের ওপর নেতৃত্বভার দিয়ে যান এবং দিল্লী স্টেশনে আমীরচাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমীর চাঁদেরও একটা দল ছিল, তাতে ছিলেন অবধবিহারী, বালরাজ, বালমুকুন্দ। রাসবিহারীর সৌজন্যে জিতেন্দ্রমোহন চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। সর্দার অজিত সিংয়ের ঝংসাল (Jhangsyal) পত্রিকা অফিসে হানা দিয়ে জিতেন্দ্রমোহনের গোপন পাণ্ডুলিপি পুলিশ হস্তগত করলে ও জারি পরোয়ানাবলে ধরা পড়বার উপক্রম হলে শাহারাণপুরে রাসবিহারী বসুকে তিনি সব ভার বুঝিয়ে দেন এবং আইন পড়তে ইংলণ্ড রওনা হ'য়ে যান। ইতিমধ্যে রাসবিহারীও চেষ্টা করছিলেন বিস্ফোরক দ্রব্য ও গোর্খা অফিসারদের কাছ থেকে পুরোনো রিভলভার সংগ্রহ করতে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মা'র অসুখের খবর পেয়ে চন্দননগর আসেন ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে মতিলাল রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। মা মারা গেলে

দেরাদুনে ফিরে আসেন। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে আবার সেপ্টেম্বরে এলেন চন্দননগরে। এই সময়ে তাঁদের অনুশীলন সমিতির প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে দিল্লী দরবারে কাটা বাঙলা জোড়া লাগাবার পরই লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলার কথা ওঁদের মাথায় আসে। রাসবিহারী তাঁর পাচক ও পরিচালকরূপে দেরাদুনে নিয়ে আসেন বসন্তকুমার বিশ্বাস নামে এক যুবককে। বসন্তকুমার ছিলেন কলকাতায় হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে, যেখানে পরে ওয়াই-এম-সি-এ ভবন ওঠে, সে জায়গায় 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে এক স্বদেশী বস্ত্রালয়ের কর্মী। রাসবিহারী বসন্তকে খুব যত্নের সঙ্গে দেরাদুনে তালিম দেবার পর বালমুকুন্দের সাহায্যে লাহোরের পপুলার ডিসপেন্সারিতে কমপাউণ্ডারের কাজ জুটিয়ে দেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর আগরওয়াল আশ্রম-সংলগ্ন এক ঘরে গোপন বৈঠকে আবারও লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলার কথা ওঠে। ব্যাপারটা পাকাপাকি করবার জন্য তিনি চন্দননগরে আসেন; অনুশীলন সমিতির শ্রীনলিনী-কিশোর গুহকে দিয়ে প্রস্তাবিত উৎসবের নিন্দা ক'রে 'স্বাধীন ভারতে' একটি প্রবন্ধ লেখান। বসন্তকুমার ২১এ ডিসেম্বর লাহোর থেকে দিল্লী রওনা হ'য়ে যান, দিল্লী এসে আমীর চাঁদের বাড়ি ওঠেন। নির্দিষ্ট দিনে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর, রাসবিহারী স্বয়ং দিল্লী হাজির হ'য়ে গেলেন।

রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে বড়লাটের শুভাগমনের মিছিল চলেছে এগিয়ে—অকস্মাৎ হ'ল বজ্রপাত সেই হাতীর ওপরই, নিহত হ'ল এক পার্শ্বচর, স্বয়ং বড়লাট হ'লেন আহত। ডামাডোলের মধ্যে রাসবিহারী ও বসন্ত অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

মিছিলেরই অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় হাতীর ওপর ছিলেন স্যার গাই ফ্লিটউড উইলসন, ১৯০৯ থেকে ১৯২৩ অবধি ভারত সরকারের ফিনান্স মেম্বার। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি এ সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ১৯২১-এর ১৬ই জুলাই স্টেটসম্যান সে বিবরণটি প্রকাশ করেন:

"আমার মনে পড়ছে, এসপ্ল্যানেড রোড যেখানে এসে চাদনী চকে এসে মিশেছে মিছিলটি সবে সে-জায়গাটা অতিক্রম করে গেছে, এমন সময় কি একটা যেন (ঠিক কি ধরতে পারিনি) কোন এক অলিন্দ থেকে প্রথম হাতীর দিকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখলাম। একটা নীলাভ শাদা রেখা ও পিকরিক এসিড-সঞ্জাত ধোঁয়ার মত অলিন্দ থেকে নিক্ষিপ্ত বোমাটা যে পথে গেছে সে-পথ বরাবর দৃষ্টিগোচরে স্থির হ'য়ে রইল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমি এ-বিষয়ে নিঃসংশয় যে, ঐ নিক্ষিপ্ত বস্তুটি তেতলা

থেকে এসে পড়েছে। পুলিশ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, আমার কথাই ঠিক।

"প্রথম আমি মনে করেছিলাম হার্ডিঞ্জ দম্পতির কোন হানি হয় নি কিন্তু যে সরকারী ছত্রধারী ও পরিচারক—দুটি লোক—পেছনে বসে ছিল তাদের এলিয়ে পড়তে দেখেছিলাম। বড়লাট সাহস-ভরে ঋজু দেহে বসে ছিলেন, আহত হবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করেন নি। অথচ এরপর ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ত্রিশ গজ এগিয়েছি, দেখি কি ঐ দীর্ঘ ঋজু মূর্তি বড়লাট যেন ভেঙে গুটিয়ে গেলেন।"

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি বলেছেন, জনমণ্ডলীর মধ্যেও কেউ কেউ আহত হন।

কিন্তু বোমাটা ছুঁড়েছিলেন কে ? এবং কোত্থেকে ? মতিলাল রায় বলেছেন, লক্ষ্মীবাঈ-নামা স্ত্রীবেশে বসন্তকুমার মেয়েদের ভীড় থেকে, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী বলেছেন, বসন্তকুমারই, কিন্তু স্ত্রীবেশে নয় এবং রাস্তা থেকে, রাসবিহারী বসু নিজে বলেছেন, তিনি নিজে। মুখরোচক বলে "বসন্ত সুন্দরী" কথাটা রটেও ছিল খুব এবং একাধিক গ্রন্থে এ গল্প প্রতিধ্বনিত হয়েছে। প্রসঙ্গত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "অগ্নিযুগের অগ্নিকথা" উল্লেখ করা যায়। একটা অধ্যায়ের নাম ঃ 'বসন্ত বিশ্বাস বড় সুন্দরী।' নাম বাসন্তী। "সাড়ীতে ঢাকা হাত বার করে লাটের হাতীর দিকে ফেরালো" ইত্যাদি। মোটকথা, সমগ্র পরিকল্পনার মূল গায়েন ছিলেন নিঃসন্দেহে রাসবিহারী, দিল্লীতে সশরীরে বসন্তের কাছাকাছি উপস্থিত ছিলেন এও ঠিক, বোমা ছোঁড়ার কাজটা, মনে হচ্ছে, বসন্তই করেছেন, নইলে তাঁকে বেশ ক'দিন ধরে সযত্নে তালিম দেবার কথাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মানুষের আত্মপক্ষ অনেক সময় অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনা, লাহোরের লরেন্স গার্ডেনের পানালয়ে শ্রীহট্টের প্রাক্তন মহকুমা হাকিম ও পাঞ্জাবের তৎকালীন এসিস্ট্যান্ট কমিশনার মিঃ গর্ডনের প্রাণনাশের চেষ্টাকালে বসন্ত স্নায়ুবল হারিয়ে ফেলেন ; বোমাটা ছুঁড়তে পারেন নি। কিন্তু তাতেই তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

দিল্লী বিস্ফোরণের পরই রাসবিহারী চলে আসেন দেরাদুনে, বসন্তকুমারও কিছু-দিন পর কিছুকালের জন্য কলকাতা হয়ে নদীয়া চলে যান। এই দিল্লী বিস্ফোরণের ফলে রাসবিহারী লণ্ডন থেকে জিতেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কোন এক পুস্তক-বিক্রেতা মারফৎ রিভলবার আমদানীর যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে, রাসবিহারী ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের কর্মীদের নিয়ে একসভায় এমনভাবে এই ঘটনার নিন্দা করেন ও তদনুরূপ তৎপরতা দেখান যে, তিনি বিভ্রান্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের

সুনজরে পড়ে যান। তাঁদের একজন—সুশীল চন্দ্র ঘোষ—তো এই মতলবে রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যান যে, তাহলে রাসবিহারীর আত্মীয় চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষের কিছু সংবাদ পাওয়া যাবে। রাসবিহারী বরং সুশীলকেই নিজের উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যবহার করতে থাকেন। পুলিশ চরেরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হ'য়ে রিপোর্ট দেয় যে; রাসবিহারীকে বাঙালী মহল পুলিশ স্পাই ব'লে জানে। লর্ড হাডিঞ্জ যখন দেরাদুনে চিকিৎসার জন্য আছেন তখন পুলিশ তাঁকে সার্কিট হাউসেও ঢুকতে দিয়েছিল।

এর পরের ঘটনাই লাহোরে গর্ডনের প্রাণনাশের ব্যর্থ চেষ্টা এবং একে উপলক্ষ ক'রে 'দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'য় বসন্ত বিশ্বাস, আমীর চাঁদ, অবধ বিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসীর হুকুম হয়। দিল্লীর এবং লাহোরের বোমা দুটোই চন্দননগরে মনীন্দ্র নায়েকের তৈরি, রিপন কলেজে সুরেশ চন্দ্র দত্ত-পরীক্ষিত। দিল্লীর বোমা কলকাতায় নিয়ে আসেন নলিন চন্দ্র দত্ত, তারপর ওটা নিয়ে দিল্লী বা আর কোথাও নিয়ে যান চন্দননগরের জ্যোতিষ সিংহ।

ইতিমধ্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'অনুশীলন সমিতি' নামে গঠিত বারাণসী বিল্পবী দলের নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বাঙলার বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' বেআইনী ঘোষিত হলে শচীন বারাণসী দলের নাম দিয়েছিলেন 'ইয়ংমেন্স এসোসিয়েশন। শচীন মূল সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেই এক স্বতন্ত্র দল গড়েন। শচীন মাখনলাল সেন ও অমৃতলাল (শশাঙ্ক মোহন) হাজরার সংস্পর্শে আসেন। ওদিকে বারাণসীর বিপ্লবীদের সঙ্গে রাসবিহারীরও আলাপ জমে ওঠে। প্রতুল গাঙ্গুলী শচীনকে চন্দননগর বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেন। এইভাবে বাঙলা, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে একটা ব্যাপক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী বসু ও জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেও একটা সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির উদ্যোগে তিন বিপ্লবী দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি তলে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ধাঁচে সেনাবাহিনীর সাহায্যে একটা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হয়। মতিলাল রায় পণ্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সম্মতি নিয়ে আসেন।

প্রতুল গাঙ্গুলী বারাণসী আসেন; অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা ঘুরে যান। রাসবিহারী বারাণসী, দিল্লী ও লাহোর সফর করেন। জ্যোতীন্দ্রনাথও রাসবিহারীর সঙ্গে বারাণসী আসেন। কিন্তু আমীর চাঁদ ওঁরা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীকে চন্দননগরে এসে গা-ঢাকা দিতে হয়। একদিন সেই আশ্রয়স্থানে ডেনহাম, টেগার্ট সদলে হানা দেন; কিন্তু রাসবিহারী নিকটেই এক আমবাগান থেকে তামাসাটা

দেখেন। রাসবিহারীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তো ছিলই, কেউ ধরিয়ে দিতে পারলে প্রথমে ৫০০০, পরে ১২,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণাও ছিল। তিনি চন্দননগর ছেড়ে আবার বারাণসী চলে যান। সেখানে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি অবধি গোপনে কাজ চালিয়ে যান। শচীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে অভ্যুত্থানের অয়োজন করতে থাকেন। শচীন্দ্রনাথ ছাড়াও তাঁর সহচর ছিলেন নলিনীমোহন মুখার্জি, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ হালদার, আশুতোষ রায়, মন্মথ বিশ্বাস প্রমুখ। রাসবিহারী চন্দননগরে একবার, বারাণসীতে আর একবার বোমা তৈরি ও গঠন প্রণালী দেখাতে গিয়ে আহত হন। বারাণসীর বিস্ফোরণে শচীন্দ্রনাথও আহত হন। রাসবিহারী বাড়ি বদলান।

ইতিমধ্যে, বাঙালীটোলায় থাকতেই, ভি জি পিংলে নামে এক মারাঠি রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করেন। পিংলে আমেরিকায় থাকতে গদরপন্থী হয়ে এসেছেন। জ্যোতীন্দ্রনাথের দলে বিজয়কৃষ্ণ রায়ের ভাগ্নে সত্যেন সেনের সৌজন্যে পিংলে জ্যোতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁরই পরিচিতিপত্র নিয়ে বারাণসীতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করেন। পিংলে রাসবিহারীর নির্দেশক্রমে শচীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাঞ্জাবের অবস্থা সরেজমিনে দেখে আসেন। গদর পার্টির কয়েক হাজার শিখ ভারতে বিপ্লব সাধনের জন্য এসে গেছেন। কয়েকটা ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তাঁদের খানিকটা যেন স্তম্ভিত করেও রেখেছিল। পিংলে আসার পর তিনি একজন বাঙালী বিশেষজ্ঞ আনার সুপারিশ করেন। অমৃতসরের নেতা মূলা সিং (জানুয়ারী ১২. ১৯১৫) সদলে রাসবিহারীর আসবার ব্যয়বহন করতে রাজি হন ও তাঁর থাকবার একটা বাড়ি ঠিক করেন।

২১-এ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। কে কোথাকার নেতৃত্ব নেবেন? দামোদর স্বরূপ এলাহাবাদে, বিভূতি, প্রিয়নাথ যাবেন বারাণসী লাইনে সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করতে, একই উদ্দেশ্যে নলিনী মুখার্জি যাবেন জব্বলপুরে। নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য বাঙলা দেশ থেকে অস্ত্র সরঞ্জাম নিয়ে আসবেন; বিনায়ক রাও কাপলে ও হেমচন্দ্র দত্ত সেসব পাঞ্জাবে নিয়ে যাবেন। পাঞ্জাবী বিপ্লবীরা ফিরোজপুরে কাজ করবেন। কালীপদ মুখার্জি ও আনন্দচরণ ভট্টাচার্য রিজার্ভ থাকবেন বারাণসীতে।

রাসবিহারী বারাণসী-পরিকল্পনার সর্বাধিনায়কত্ব নিলে ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও মতিলালের চন্দননগর কেন্দ্র বারাণসীর বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে কাজ শুরু করেন।

রাসবিহারীর ইচ্ছা ছিল, জার্মান অস্ত্র আমদানীর অপেক্ষা না করে, ভারতের অভ্যন্তরীণ শক্তিবলেই অভ্যুত্থান হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে নরেন সেন-প্রেরিত কেদারেশ্বর গুহ আমেরিকা হয়ে কলকাতা ফেরেন (১৯১৪, অক্টোবর) এবং জানান যে, তিনি ধীরেন সরকারের কাছে 'বার্লিন ইণ্ডিয়া কমিটি' গঠন ও জার্মান সরকারের অস্ত্র সরবরাহে সম্মতির খবর পেয়েছেন। কিন্তু রাসবিহারী এই অনিশ্চিত প্রত্যাশায় অভ্যুত্থান-পরিকল্পনা পিছিয়ে দিতে রাজি হন না। তিনি অনুকূল চক্রবর্তী ও নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু)-কে বারাণসীতে খবর দিয়ে আনালেন। সারা বাঙলা দেশে একই সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটাবার ও ঢাকার বারাণসী রেজিমেণ্টকে দলে ভেড়াবার নির্দেশ দিলেন। প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে গেলেন। রাসবিহারীর আমন্ত্রণে জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখ্যার্জি ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষও বারাণসী ঘুরে গেলেন। রাসবিহারী জ্যোতীন্দ্রনাথকে নেতৃত্ব ভার নিতে বললেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দেও জানুয়ারির মাঝামাঝি রাসবিহারী ঘাঁটী গাড়লেন অমৃতসরে। ঝাবেওয়ালে একটা বোমার কারখানা খুললেন, পরে লোহাটবাড়িতে। কয়েকটা ডাকাতিকালে পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হওয়ায় রাসবিহারী লাহোর চলে এলেন (২রা ফেব্রুয়ারি)। সৈন্যদের দলে ভেড়াবার জন্য লোক পাঠালেন জলন্ধর, বান্নু, কোহাট, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার ঝিলাম, কর্পূরতলা, ফিরোজপুর, মীরাট, আম্বালায়। সাড়া পেয়ে স্থির হ'ল, বাঙলা থেকে পেশোয়ার অবধি ২১এ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান হবে, এক তেরঙা পতাকা উঠবে, ইত্যাদি।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল কৃপাল সিং নামে এক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায়। ২১ থেকে ১৯এ তারিখ বদলে দিয়েও নিস্তার পাওয়া গেল না। এ তারিখও পুলিশ জেনেছিল প্রথম তারিখের মতই। আপাতত রাসবিহারী ও পিংলে বারাণসী থেকে পালিয়ে বাঁচলেন কিন্তু অভ্যুত্থান আর হ'ল না। নাদির খান নামে এক আফগান জমাদারের বিশ্বাসঘাতকতায় পিংলে বমাল ধরা পড়ে গেলেন ও রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য তাঁর ফাঁসী হ'ল। সেপাইদের মধ্যে কাজ করার পণ্ডশ্রম ও ঝুঁকিটা রাসবিহারী বুঝতে পেরেছিলেন এবং দেশত্যাগের যে সিদ্ধান্ত তিনি এতদিন স্থগিত রেখেছিলেন পিংলে ধরা পড়ার পর আর গত্যন্তর রইল না। চন্দননগরে এলেন, মতিলাল রায়ের সঙ্গে পরামর্শ ও তাঁরই ব্যবস্থাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় পরিচয়ে পি এন টেগোর নামে 'সানু কিমারু' জাহাজযোগে কলকাতা থেকে জাপান রওনা হ'য়ে যান—যেন কবির জাপান সফরের উদ্যোগপর্বে সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে গেলেন।

বাকী রইলেন বারাণসী বিপ্লবী কেন্দ্রের বিশ্বস্ত সঙ্গীরা। তাঁরা একে একে ধরা পড়ে গেলেন এবং হ'ল 'বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলা'। সিডিসান কমিটি লিখেছেন ঃ

"বারাণসী কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন যুক্তপ্রদেশের; অধিকাংশই বাঙালী এবং সবাই হিন্দু...সহযাত্রীরা প্রেরণা পাচ্ছিলেন বাঙলা থেকে এবং পরিচালনা করছিলেন রাসবিহারী...।"

আর ক্লিভল্যাণ্ডের নজরে বাঙালী ও পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য ধরা পড়েছিল।

"তাঁর মতে বাঙালী বিপ্লবীরা ছিলেন কঠিন ধাতুতে গড়া। গদর পার্টির শিখ ও মুসলমানেরা এমনই বাগাড়ম্বরপ্রিয় ও ধরা পড়বার পর স্বীকারোক্তিপ্রবণ যে বাঙালী সাথীরা সম্ভবত খুব শিগগিরই তাঁদের ওপর বিশ্বাস রাখতে কুণ্ঠিত হবে।"*

সিডিসান কমিটির মামলার বিবরণ সংক্ষিপ্তঃ শচীন্দ্র, গিরিজাবাবু ও আর সবাইকে ধরে ভারতরক্ষা আইনে গঠিত এক আদালতে মামলা হয়। জন কয়েক রাজসাক্ষী দাঁড়ায়, দশ জনের নানা মেয়াদে কারাদণ্ড হয়; শচীন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

"জাগরণ ও বিস্ফোরণে" আছে ঃ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি রায় বেরোয়। শচীন্দ্রনাথের তিন দফায় সমকালীন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। গণেশীলাল খাস্তা দামোদর স্বরূপ (মাস্টারজীর) সাত বছর ক'রে, লছমীনারায়ণ, নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ দত্ত (গিরিজাবাবু) ও প্রতাপ সিংয়ের পাঁচ বছর ক'রে, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের তিন বছর করে—এবং আর একজনের (?) দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২২ মে গৌহাটিতে ধৃত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঁকিপুরে ধৃত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের, 'বারাণসী অতিরিক্ত মামলা'য় যথাক্রমে সাত ও দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

* টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ, পৃঃ ১৩৫-এ উদ্ধৃত

"মুক্তির-মন্দির-সোপানতলে"

দ্বিতীয় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার যে সূত্রটি আমরা রেখে এসেছি এবার সেটিতে এসে পড়া গেছে। সিডিসান কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে ইতি-পূর্বেই ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয়েছিল। জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মার্চের প্রথম দিকে ইউরোপ থেকে এলে বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে জার্মান-সাহায্যের সংবাদ দেন। স্থির হয়, ব্যাটাভিয়ায় নরেন ভট্টাচার্যকে পাঠানো হবে; 'সি মার্টিন' ছদ্মনামে তিনি এপ্রিলে রওনা দেন। ঐ মাসেই অবনীনাথ মুখার্জিকেও জাপানে পাঠানো হয়, নেতা যতীন্দ্রনাথ (জ্যোতীন্দ্রনাথ) মুখার্জি গোপনবাসের জন্য বালেশ্বরে চ'লে যান। একই সময়ে কালিফোর্ণিয়ার সান পেড্রো থেকে ২২এ এপ্রিল নাগাদ 'মাভেরিক' জাহাজটি যাত্রা করে। মাভেরিকটা ছিল স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর তেলের জাহাজ, স্যান ফ্রান্সিস্কোর এফ জেবসেন এণ্ড কোং নামে এক জার্মান ফার্ম ওটা কেনে। সান পেড্রো থেকে রওনা দেবার সময় এর ত্রিশজন অফিসার, পরিচারকের সবাই আসলে ছিলেন ভারতীয়। হরি সিং নামে গদর পার্টির এক পাঞ্জাবীর ট্রাঙ্ক-ভরতি ছিল গদর-সাহিত্য। মাভেরিক প্রথম যায় সান জোস ডেল কাবোতে, জাভায় যাবার অনুমতি পায়। তারপর যাত্রা করে মেক্সিকোর ৬০০ মাইল দূরে 'সোকোরো' দ্বীপের উদ্দেশে; কথা ছিল, এইখানে 'এনি লার্সেন' নামে একটা স্কুনার আসবে; এই স্কুনারেই ছিল জার্মাণ অস্ত্র-পাতি; মাভেরিকের ওপর নির্দেশ ছিল রাইফেলগুলো তৈলাধারে ঢেলে তেলে ডুবিয়ে দেওয়া, আর গুলী-গোলা আর একটা তৈলাধারে—যেন প্রয়োজন হ'লে জাহাজটাই ডুবিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ স্কুনারের আর দেখা নেই। মাভেরিক কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রে হনলুলু হয়ে জাভায় চলে গেল।

এদিকে "মার্টিন" ব্যাটাভিয়ায় পৌঁছোলে জার্মান কন্সাল তাঁকে থিয়োডোর হেলফ্রিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। হেলফ্রিস জানান যে, ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যে এক অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ করাচী রওনা হয়ে গেছে। "মার্টিন" ওটাকে বঙ্গদেশের দিকে ঘুরিয়ে দেবার অনুরোধ জানান। "মার্টিন" এর পর সুন্দর-বনের রায়মঙ্গলে ঐ জাহাজটি—অর্থাৎ মাভেরিককে, 'অভ্যর্থনা' জানাবার আয়োজনে দেশে ফিরে আসেন। জাহাজটিতে ৩০,০০০ রাইফেল, প্রত্যেকটির জন্য ৪০০ ক'রে

গুলী ও দু'লাখ টাকা থাকবার কথা। 'মার্টিন' ইতিমধ্যে 'হ্যারি এণ্ড সন্স' নামে এক ভূয়া কোম্পানীকে তারযোগে জানান, কারবার বেশ চলছে। হ্যারি এণ্ড সন্স মার্টিনের কাছে টাকা চেয়ে পাঠায়; দফায় দফায় টাকা আসতে থাকে; মোট ৪৩,০০০ টাকার মধ্যে বিপ্লবীদের হাতে আসে ৩৩,০০০। তারপরই বৃটিশ সরকার ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। 'মার্টিন' ভারতে ফিরে আসেন জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ; যতীন্দ্রনাথ (বা জ্যোতীন্দ্রনাথ), যাদুগোপাল মুখার্জি, 'মার্টিন' (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য), ভোলানাথ চ্যাটার্জি ও অতুল ঘোষ 'মাভেরিক'কে, অভ্যর্থনা জানাবার জন্ম প্রস্তুত হতে থাকেন। স্থির হয়, অস্ত্রগুলো তিনভাগে ভাগ করে হাতিয়া, কলকাতা ও বালেশ্বরে পাঠানো হবে। বিপ্লব দমনে পাছে বাইরে থেকে সৈন্ম আমদানী হয় এজন্য কতকগুলো রেলসেতু উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। যতীন্দ্র, ভোলানাথ ও সতীশ চক্রবর্তীর ওপর ভার রইল যথাক্রমে মাদ্রাজ রেলওয়ে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের। নরেন ভট্টাচার্য ও বিপিন গাঙ্গুলীর ওপর রইল কলকাতার অস্ত্রসরঞ্জাম নেওয়া, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করা ইত্যাদি। যাদুগোপাল মুখার্জি 'মাভেরিক' অভ্যর্থনা ব্যবস্থাপনার জন্য এক জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন।

এই অবস্থায় ব্যাঙ্কক থেকে এক বাঙালী খবর নিয়ে আসেন যে, শ্যামের জার্মান কন্সাল ৫০০০ রাইফেল, গুলী ও এক লাখ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন। তাঁকে আবার এই বলে ফেরত পাঠানো হয় যে, তিনি হেলফ্রিসকে গিয়ে পূর্ব কার্যক্রমের পরিবর্তন না ঘটানোর অনুরোধ জানাবেন।

এর মধ্যে সব খবর এসে গেল সরকারের গোচরে। ৭ই আগস্ট 'হ্যারি এণ্ড সন্সে' তল্লাসী ও গ্রেপ্তার হ'ল। ১৫ই আগস্ট নরেন্দ্র (মার্টিন) ব্যাটাভিয়া রওনা হয়ে যান হেলফ্রিসের জন্ম দেখা করবেন ব'লে।

থাক্ মার্টিন, ব্যাটাভিয়া, হেলফ্রিস, আমরা বুরি বালামের তীরে এসে পড়েছি, আমরা ছুটে চলেছি চাষ-খন্দের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। তার আগে একবার স্মরণ করি সেই মহৎ প্রাণের আবির্ভাবকে। যতীন্দ্রনাথ বা জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। "বাঘা যতীনকে"। আবির্ভাব স্থান—নদীয়া জেলার কয়া, মামা বসন্তকুমার চ্যাটার্জির বাড়ি। মাতৃক্রোড়ে দেশাত্মবোধের শিক্ষা, খেলাধূলায় অধীর আগ্রহ, যেমন সাঁতারে তেমনি ঘোড়া চড়ায় কি ব্যায়ামে অথবা লোকসেবায়। ১৯০৩এ অরবিন্দ-দর্শন, যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গেও। নিলেন স্বাধীনতাযুদ্ধের শপথ। এসে বসলেন স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদাদেবীর চরণতলে, সান্নিধ্য পেলেন ভগিনী

নিবেদিতার। স্বামী বিবেকানন্দর কুস্তির গুরু ক্ষেত্রমোহন গুহের কাছে শিখলেন কুস্তি। একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ। দক্ষ দ্রুতলিপিকার (স্টেনোগ্রাফার), প্রথমে সওদাগরি অফিসে, পরে সেই মজঃফরপুরের ব্যারিস্টার কেনেডির চেম্বারে, পরে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে, তারও পর ১৯০৪এ অর্থসচিবালয়ে মাসিক ১০০ টাকার স্টেনোগ্রাফার। একদা এই সময়ে, ২৬ বছর বয়সে, ১৯০৬এ কয়ার কাছাকাছি ছোরা দিয়ে মারলেন রয়াল বেঙ্গল টাইগার। বিস্তর ক্ষতদুষ্টি থেকে রক্ষা করেন ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। সংগ্রাম। সংগ্রাম। দার্জিলিং থাকতে ('বেঙ্গলী'তে বেরিয়েছিল, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তুলেছিলেন), ১৯০৮এ, দুই মিলিটারী সাহেব যাচ্ছে পথাবরোধ ক'রে ও নেটিবদের উদ্দেশে বুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে; দিলেন দুটোকেই ধরাশায়ী করে। ক্ষমতামদমত্ত বৃটিশ সরকার, আর কিছু না পেরে, দিলেন তৎক্ষণাৎ বদলির আদেশ। তিন বছরের সব কিছু সম্পদ, স্মৃতি ফেলে আসতেই হ'ল কলকাতায়। শপথ ছিলই, এবার হ'ল আরও ভয়ঙ্কর বজ্রমুষ্ঠি। ১৯১০ অবধি রাজনৈতিক মিশনারি ১৯০৮ থেকেই। হাওড়া, নদীয়া, খুলনা, যশোর, রাজসাহী ২৪ পরগণায় ঘূর্ণায়মান। সহচর বলদেব রায়, জ্ঞান মিত্র, জ্যোতিষ মজুমদার, সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়,সতীশ সরকার, চারু ঘোষ, ননীগোপাল সেন, ফণীন্দ্র-নাথ রায়, ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল, নলিনীকান্ত কর ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে মিলে গড়লেন এক মেস—বিপ্লবী কেন্দ্র। সামসুল আলম হত্যাকাণ্ডে বিপাকে পড়ে গেলেন। ১৯১০-এর ২৭এ জানুয়ারিতে বন্দী। এ থেকে পুলিশ কমিশনার ছেড়ে দিলেও ডাকাতির অভিযোগে হাওড়ায় চালান হয়ে গেলেন। আবার আনা হ'ল আলিপুর জেলে, সামসুলের আততায়ী বীরেন দত্তগুপ্তের বিবৃতিবলে সামসুল হত্যাকাণ্ডে আরও একবার জড়াবার শেষ ব্যর্থ চেষ্টা হ'ল। জেলে থাকতেই আর এক লম্বা অভিযোগ, হাইকোর্টের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে সোপর্দ—মামলা উপসংহারের আগেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারি ছাড়া পেয়ে গেলেন।

এবার জীবিকার্জনের জন্য ঠিকাদারির কাজ। সারা ব্রীজ, ঝিনাইদা যশোর রেলওয়ে, স্ক্রু পাইপ ব্রিজের মাটি তোলা কাজ হতে হতে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গেও সেতুবন্ধ। জ্যোতীন্দ্রনাথের চারিদিকে হ'ল এক বলয়ের সৃষ্টি। বর্ধমান-মেদিনীপুরের প্লাবনে দেশসেবক সমাজসেবকের ভূমিকাশেষে কথা উঠল দল-মিলনের। শঙ্কু ঘোষ লেনের এক মেস বাড়ীর ছাদে (১৯১৫, মার্চ) বৈঠক বসল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যাদুগোপাল মুখার্জি, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ আর

বরিশাল দলের নরেন ঘোষ চৌধুরি, যোগেন বসু, মনোরঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে। একাকার ঠিক হ'লেন না, তবে সবাই কাছাকাছি এসে জ্যোতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নিলেন। রডডা কোম্পানির মৌজার পিস্তলগুলো তাঁদের পরস্পরকে আরও কাছে টানল। পূর্ণ দাসের মাদারিপুর দলটিও ঘনিষ্ঠ হ'ল। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরি, মনোরঞ্জন সেন গুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত, রাধাচরণ প্রামানিক ও পতিতপাবন ঘোষ কলকাতায় এসে থাকতে থাকতে জ্যোতীন্দ্রের সঙ্গে হাত মেলালেন। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ দলগুলো সত্যিকারের শতদলের রূপ নিল। 'শ্রমজীবী সমবায়ে'র মাধ্যমে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' ও চন্দননগর দলের সঙ্গেও আঁতাত গড়ে উঠল। চন্দননগরেই রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়; বলেছি, দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটিতে অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে নিয়ে তিনের এক বৈঠকও হয়। সারা ভারত অভ্যুত্থানে জ্যোতীন্দ্রনাথ পান বাঙলার নেতৃত্ব। প্রথম অভ্যুত্থান চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে জ্যোতীন্দ্রাথের ওপর। একটা দুটো তিনটে—গার্ডেনরীচ, বেলেঘাটা, নদীয়া প্রাগপুর ডাকাতির নীট ফল দাঁড়ালো শূন্য তহবিল, সুশীল সেনের মত বিরল কর্মীর বিসর্জন এবং চিত্তপ্রিয়ের পুলিশ-চর নীরদ হালদারকে গুলী ও নরেন ঘোষ চৌধুরির গোয়েন্দা সাব-ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জিকে হত্যার পর জ্যোতীন্দ্রনাথের চারদিকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বেড়াজাল। চাই চিত্তপ্রিয়কেও কিন্তু নীরদ নাম বলেছে জ্যোতীন্দ্রনাথেরও। গা-ঢাকা দেবার আশ্রয়স্থল চাই-ই; নিজের, সঙ্গীদের। প্রথমে বাগনান। সেখান থেকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এস্টেটের অন্তর্গত কাপ্তিপদা। কাপ্তিপদাও একটা এস্টেট। সেখানে উঠেছে এক খড়ের ঘর।

কিন্তু পুলিশ খবর পেয়ে গেল। "হ্যারি এণ্ড সন্সে"র তল্লাসী ও গ্রেপ্তার থেকে প্রথম সূত্র; ঐ সূত্র ধরে পাওয়া গেল বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের অস্তিত্ব। তৃতীয় সূত্র মাদ্রাজ থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের টেলিগ্রাম যাদুগোপাল মুখার্জির কাছে। টেগার্ট-ডেনহাম-বার্ড সদলে এসে তল্লাসী করলেন 'এম্পোরিয়াম'। পাওয়া গেল গোপালের একখানি চিঠি। কাপ্তিপদা এস্টেটের দেওয়ান দেখিয়ে দিলেন গোপাল বাবুর বাড়ি, কাপ্তিপদা থেকে এক মাইল দূরে।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর, স্থানীয় এক ব্যক্তি জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখার্জিকে এসে খবর দিলেন যে, হাতী চড়ে একদল পুলিশ কাপ্তিপদা ডাকবাংলোয় এল। জ্যোতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ মনঃস্থির করে ফেললেন এবং চিত্তপ্রিয় ও মনোরঞ্জনকে নিয়ে ঐ রাত্রেই তালদিহা রওনা হয়ে গেলেন। পরদিন সকালেবেলা পুলিশ এসে দেখে

সব হাওয়া। জ্যোতীন্দ্রনাথ আবার রাত্রির অন্ধকারে আর একবার কাপ্তিপদা ফিরে এসে মণীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বালেশ্বর স্টেশনে যান ; কিন্তু তাঁরা মত পরিবর্তন করে গ্রামের দিকে চলে যান। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বুরি বালাম নদী পার হলেন ৯ই সেপ্টেম্বর। গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয় ; তারা পরিচয় জানতে চায় ও তাঁদের পিছু নেয়। বিপ্লবীদল রিভলভার বের ক'রে জনতাকে ভয় দেখান ; জনমণ্ডলী এবার কিছু দূর থেকে অনুসরণ করতে থাকে। দু'তিনটি গুলী ছুঁড়তেও হয়। তাড়াতাড়ি আর একটা ছোট স্রোতস্বতীও পার হয়ে যান সাঁতরে ; তারপর চাষখন্দের এক ধানের মাঠে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন। চিন্তামণি সাহু নামে এক সাব-ইন্সপেক্টর ভিখিরীর বেশে জনতার সঙ্গে মিশে যায় এবং বিপ্লবীদের অগোচরে এগোয় এবং এই লোকটিই বালেশ্বরের পুলিশ দলকে সঙ্কেত করে। পুলিশ দল খোলা ময়দান বরাবর এগোতে থাকলে বিপ্লবীরা গুলী চালান। পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে এক খণ্ড যুদ্ধ চলে। অকস্মাৎ বিপ্লবীদের দু'জন—নীরেন ও মনোরঞ্জন—হাত তুলে যুদ্ধবিরতি সঙ্কেত দেন। পুলিশ সদলে এসে দেখে চিত্তপ্রিয় মারা গেছেন ; জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখ্যার্জি ও জ্যোতিষ পাল বিশ্রীরকমে আহত, তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হ'ল ; মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্র বন্দী হলেন। ১০ই সেপ্টেম্বর জ্যোতীন্দ্রনাথ—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আত্ম-বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প উদ্‌যাপন করে—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।* বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের হয় মৃত্যুদণ্ড, জ্যোতিষের ১৪ বছরের দ্বীপান্তর। বালেশ্বর জেলে নীরেন, মনোরঞ্জনের ফাঁসী হয়ে যায়। জোতিষ পাল আন্দামান সেলুলার জেলে অকথ্য নিপীড়নের ফলে পাগল হয়ে যান ; দেশে বহরমপুর জেলে নিয়ে এসে চিকিসান্তে নিরাময় হন। মুক্তির দিনও আসন্ন হয়ে এল ; তারপর জেলের ভেতরেই কি কাণ্ড হ'ল কে জানে, প্রথম খবর : সাংঘাতিক পীড়িত ; দ্বিতীয় খবর : সব শেষ ; ১৯২৪, ডিসেম্বর ৪।

* শ্রীমতী উমা মুখার্জি কৃত 'টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভলিউসানারিজ'

'আঘাত সংঘাত মাঝে'

"মাভেরিক" জাহাজের বিপর্যয়ের সাথী ছিল আর একটা জাহাজ। জাহাজটির নাম 'হেনরী এস'। সে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে ম্যানিলা থেকে সাংহাইর উদ্দেশে। কাস্টম্‌স কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে মাল নামাতে পীড়াপীড়ি করলে, সে পন্টিয়ানকের দিকে তার গতি পরিবর্তন করে। জাহাজটির মোটর ভেঙে গেলে সে সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জের এক বন্দরে নোঙর ফেলে। এতে দুজন জার্মান-আমেরিকান, (Wehde) ও বোয়েম (Boehm) ছিলেন। অভিপ্রায় ছিল, কিছু অস্ত্র ব্যাঙ্ককে নামিয়ে শ্যাম-ব্রহ্মের সীমান্তে পাকোর একটা সুরঙ্গে লুকিয়ে রাখা এবং ব্রহ্ম অভিযানের জন্য ভারতীয়দের তালিম দেওয়া। বোয়েমকে সিঙ্গাপুরে যাবার পথে গ্রেপ্তার করা হয়; তিনি সেলিবিস থেকে ব্যাটাভিয়ায় পৌঁছেছিলেন। তিনি হেরম্বলাল গুপ্তের পরামর্শক্রমে ম্যানিলা থেকে 'হেনরী এস'-এ উঠেছিলেন; ম্যানিলার জার্মান কন্সালের নির্দেশ ছিল ব্যাঙ্ককে ৫০০ রিভলার নামিয়ে দেওয়া, বাকী ৪৫০০ চট্টগ্রামে; সম্ভবত, মৌজার পিস্তল।

এদিকে 'মার্টিন' বা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কোন পাত্তা নেই। ব্যাটাভিয়ায় তাঁর উদ্দেশে তার করতে গিয়ে দু'জন ধরা পড়ে গেলেন—গোয়ায় বিনয় দত্ত ও ভোলানাথ চ্যাটার্জি। ভোলানাথ এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন, বিশদ বলার আগেই পুনা জেলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জানুয়ারি, সম্ভবত অনুশোচনায়, আত্মহত্যা করেন।*

মহাকালে জ্যোতীন্দ্রনাথের অপসৃতির পর চন্দননগরকে কেন্দ্র ক'রে বিপ্লবীদের আরও একবার পরস্পরের কাছাকাছি এসে বিপ্লব-প্রচেষ্টার ছিন্ন সূত্রকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা হ'ল। কয়েকটা বাড়ি ভাড়া করা হ'ল গোপন-সঞ্চারী বিপ্লবীদের আশ্রয়ের জন্য; অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও ভোলানাথ চ্যাটার্জির দুই আত্মীয়া এঁদের সংসার আগলাবার জন্য হ'লেন ছোট পিসীমা ও বড় পিসীমা। "পশ্চিম বাঙলায়" বিপ্লবীদলের নেতৃত্বভার-পড়ল যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ওপর এবং তাঁর সহচর রইলেন অতুল ঘোষ।**

---

*:সিডিসান কমিটি রিপোর্ট, পৃঃ ১২৩।

** সিডিসান কমিটি লিখেছেন শুধু অতুল ঘোষ, শ্রীমুখার্জি লিখেছেন অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাঁর "অবিস্মরণীয়"তে লিখেছেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। সিডিসান কমিটি পুলিন মুখার্জিকে নেতা এবং "অবিস্মরণীয়"তে তাঁকে এঁদের সহচর বলা হয়েছে, শ্রীমতী মুখার্জির বইয়ে পুলিন মুখার্জির নাম নেই।

'অনুশীলন সমিতি'র অমৃতলাল সরকার, নলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ বিশ্বাসও এলেন চন্দননগরে। একদিকে যাদুগোপাল ও সতীশ চক্রবর্তী এবং অপর দিকে নলিনীকান্ত ঘোষ ও বিনায়ক রাও কাপলের উদ্যোগে দু'টি দল কিছুকালের জন্য একীকৃত হ'য়ে গেল। কিন্তু টাকার বড় অভাব; জার্মানী থেকে টাকাও আর আসছে না। সিডিসান কমিটি সাতটি ডাকাতি বা ডাকাতির চেষ্টার মধ্যে চারটি ব্যর্থতার কথা বলেছেন; কিন্তু এই ব্যর্থ ও সার্থক ডাকাতির সূত্র থেকে অনেকে ধরা পড়ে গেলেন নদীয়া জেলায়। শিবপুর ডাকাতিতে ছিল বরিশাল দল ও উত্তরবঙ্গ দল। বরিশাল দলের নরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরিসুদ্ধ কয়েকজন ধরা পড়লেন। ২০,৭০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়েছিল, সঙ্ঘর্ষে কনস্টেবলসহ চারজন নিহত হয়, ১১জন আহত হয়। কিন্তু লুণ্ঠিত টাকা বিপ্লবীদের কাজে লাগেনি। তবে তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে সাব-ইন্সপেক্টর গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও সাব-ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

মার্টিন ও পেইন (Payne)-এর (ফণী চক্রবর্তীর) যখন কোন খবরই নেই তখন যাদুগোপাল ভূপতি মজুমদারকে সিঙ্গাপুর হ'য়ে আমেরিকা পাঠান। বিনয় ভূষণ দত্ত ও ভোলানাথ চ্যাটার্জির পরিণতি ইতিপূর্বেই বলেছি। আর এক বিপ্লবী শৈলেন ঘোষও পালিয়ে আমেরিকা যান। শৈলেন ঘোষ তাঁর মার্কিণ বান্ধবীর সঙ্গে মিলে রুশ বিপ্লবী ট্রটস্কির কাছে আবেদন প্রেরণ করেন। আইরিশ নেতা ইমন ডি ভ্যালেরা লিনকন (Lincoln) জেল থেকে পালিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন; শৈলেন ঘোষ তাঁর সঙ্গেও হাত মেলান। বিনয় ও ভোলানাথ ধরা পড়বার পর যাদুগোপাল আরও একজনকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের খোঁজে জাভায় পাঠান। তাঁর নাম শান্তিপদ পদ মুখার্জি (নিয়াজুল্লা খান)। পক্ষান্তরে সিডিসান কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস যে, 'মাভেরিক' ব্যর্থতার পর সাংহাইর জার্মান কন্সাল-জেনারেল আরও দুটি জাহাজ রায়মঙ্গল ও বালেশ্বরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। প্রথমটিতে থাকবে ২০,০০০ রাইফেল, ৮০ লক্ষ কার্তুজ, ২,০০০ পিস্তল, হাতবোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক এবং দুই লাখ টাকা; দ্বিতীয়টায় ১০,০০০ রাইফেল, ১০ লক্ষ কার্তুজ, হাতবোমা ইত্যাদি।

এসব উদ্যোগের মূলে ছিলেন রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও তারকনাথ দাস। সিডিসন কমিটিই বলছেন, 'মার্টিন' ব্যাটাভিয়ার জার্মান কন্সালকে বলেছিলেন, রায়মঙ্গল আর নিরাপদ অবতরণ ঘাঁটি নয়। হাতিয়াই ভাল। হেলফ্রিস রাজি হন। স্থির হয়, হাতিয়ায় সরাসরি জাহাজ আসবে সিঙ্গাপুর থেকে, ডিসেম্বর শেষ

নাগাদ পৌঁছে যাবে। বালেশ্বরে যেটি আসবে সেটি জার্মান স্টীমার, ওলন্দাজ বন্দরে ছিল, এটি মাঝপথে মাল তুলে নেবে। আর একটা জার্মান জাহাজ আসবে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে, ওখান থেকে বিপ্লবী-বন্দীদের এবং সিঙ্গাপুর রেজিমেণ্টের বিদ্রোহী সেনাদের তুলে নেবে; তাঁদের নিয়ে রেঙ্গুন হানা দেবে। এছাড়াও বাঙালী বিপ্লবীদের সাহায্যে হেলফ্রিস এক চীনাম্যানকে ৬৬,০০০ গিল্ডার দিয়ে পাঠান পেনাঙে, সেখানে কোন এক বাঙালী বিপ্লবীর হাতে তুলে দেবার জন্য। টাকাসুদ্ধ সিঙ্গাপুরে তিনি ধরা পড়ে যান।

অর্থাৎ, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দননগরে তল্লাসীর পর যাদুগোপাল ও নলিনীকান্ত কর চন্দননগর ছেড়ে যান এবং নানান্ জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আরও অনেকের সঙ্গে আসাম-ভুটান সীমান্তে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সূচনা অবধি বিদেশী অস্ত্র সাহায্যের আশায় বৃথাই অপেক্ষা করেন। নলিনীকান্ত কর এঁদের সঙ্গে চন্দন-নগরের সংযোগ রক্ষা করেন। এদিকে অতুল ঘোষ ও সতীশ চক্রবর্তী চন্দননগর ছেড়ে এসে শালকিয়ায় দুটি বাড়িতে আশ্রয় নিলে পুলিশ সেখানেও হানা দেয়; অতুল ঘোষ ও সতীশ চক্রবর্তী বৃষ্টি ও অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন এবং যুগলকিশোর দত্ত ও সুধীর সোম পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যান। অতুল ঘোষ ও অমর চ্যাটার্জি আবার যাদুগোপাল ও নলিনীকান্ত করকে চন্দননগরে ফিরে আসতে বলেন। তাঁরা ছিলেন আসামে। নতুন কর্মপন্থা নিয়ে সম্মেলন চলতে চলতে পুলিশ আবার চন্দননগরে জাল ছড়ালো; যাদুগোপাল ও নলিনী কর আবার আসামে পালিয়ে গেলেন। অমর চ্যাটার্জিও নলিনী ঘোষকে গৌহাটি পর্যন্ত অনুসরণ করলেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি সংগ্রাম-শুরু সেখানে থাকেন। যাদুগোপাল, নলিনী ও মন্মথনাথ বিশ্বাস অজ্ঞাতবাসে ঘুরতে ঘুরতে পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরে চার বছর ডাঃ সামসুদ্দিন, গফুর ও মিঞাভাই নামে ১৯২১ অবধি বসবাস করেন; ঐ বছর মতিলাল রায় তাঁদের রাজকীয় ঘোষণানুসারে বন্দীমুক্তির সংবাদ গোচরে আনেন।

ইতিমধ্যে আমেরিকার চিকাগোতে দুই জার্মান, ওয়েদে (Wehde), ও বোয়েম (Boehm), এবং বাঙালী হেরম্বলাল গুপ্ত এক রাষ্ট্রীয় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হন; স্যান ফ্রান্সিস্কোতেও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আর এক অনুরূপ মামলায় অনেকের দণ্ড হয়। ওদিকে সাংহাই পৌর-পুলিশও দু'জন চীনাম্যানকে গ্রেপ্তার করে; তাদের কাছে পাওয়া যায় ১২৯টি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও ২০,৮৩০টি গুলী। নীলসেন (Nielsen) নামে কোন এক জার্মান নাকি তাদের

ওগুলো গোপনে কলকাতায় নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ঠিকানা ছিল— অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রমজীবী সমবায়, কলকাতা। নীলসেনের ঠিকানাটা—৩২, ইয়াংসিপু (Yangtsepoo) রোড—অবনীনাথ মুখার্জি স্বদেশযাত্রাপথে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়লে তাঁর নোট বইয়ে পাওয়া গেছল। সিডিসান কমিটির মতে এসব ষড়যন্ত্রই রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে হয়েছে ; রাসবিহারী তখন ছিলেন নীলসেনের বাড়িতে। ঐ বাড়িতে আর একজন বিপ্লবী ছিলেন, তাঁর নাম অবিনাশ রায়। অবনীনাথের নোট বইয়ে মতিলাল রায়সহ চন্দননগর, কলকাতা, ঢাকা, কুমিল্লার প্রখ্যাত বিপ্লবীদের নাম ছিল ; শ্যামের অন্তর্গত যে পাকো (Pakoh)তে 'হেনরী এস'-এর অস্ত্রগুলো লুকোবার কথা ছিল সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার অমর সিংয়ের নামও নোট বইয়ে ছিল। অমর সিংয়ের মান্দালয়ে ফাঁসী হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস'-এ বলেছেন, "অবনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসবিহারীর সহিত সাংহাইয়ে আসেন। রাসবিহারী অবনীকে দেশে পাঠাইবার সময় ৩৫ জন ভারতীয়ের নাম ও ঠিকানা তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া দেন। অবনী প্রত্যাবর্তনকালে অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে তাঁহার মারাত্মক নোটবুকসমেত ধরা পড়েন এবং পরে জেল হইতে পলায়ন করেন বলিয়া কথিত আছে।" (পৃঃ ২১—২২) ডঃ দত্ত আরও লিখেছেন, "যতীন্দ্রনাথের সহিত রাসবিহারীর প্ল্যানের গরমিল হওয়ায় তিনি জনৈক উকীলকে টাকা দিয়া বাটাভিয়াতে পাঠাইয়া দেন। এই উকীল বর্মায় ওকালতী করিতেন।......উকীলবাবু নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যবশতঃ সিঙ্গাপুরে আসিয়া গভর্ণমেণ্টকে সব বলিয়া দেন। ...সমস্ত প্ল্যান জানিতে পারিয়া ইংরেজের রণতরী (H.M.S.Cornwall) অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আন্দামান দ্বীপের নিকট ডুবাইয়া দেয় ও জার্মান কন্সালকে কয়েদ করে। ......দক্ষিণ এসিয়ায়......ধরপাকড় আরম্ভ হইলে বাংলা হইতে আগত বৈপ্লবিকরা চীনে পলায়ন করেন। ফণী চক্রবর্তী ওরফে পাইন সাংহাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও ইংরাজাধিকৃত এলাকায় ঢুকিলে ধরা পড়েন।" ইংরাজ পুলিশ এক জার্মান এজেণ্টকে নাকি বলেছিল, পাইনকে গুলী ক'রে মারা হয়েছে। "কিন্তু অবনী মুখোপাধ্যায় যখন সিঙ্গাপুরে বন্দী হন তখন ফণী চক্রবর্তী ওরফে পাইনকেও সেই জেলে রাখা হয় ও তাহার কাছ হইতে গুপ্ত কথা বাহির করিবার জন্য তাহাকে নির্য্যাতন করা হয়। অবনী বলে যে, এক বৎসর নির্য্যাতন ভোগের পর চক্রবর্তী যখন

রক্তবমি আরম্ভ করেন তখন নাকি তিনি বলেন, 'আমি আর সহ্য করতে পারি না, সব কথা বলিয়া দিব।' ইহার ফলে নাকি চক্রবর্ত্তী খালাস পায়। এইসব ধরপাকড়ের পর যাহারা বাকী ছিল তাহারা জাপানে চলিয়া যায়।" (পৃঃ ২১—২৮) ডঃ দত্তই পরিশিষ্টে অবনীনাথের সম্বন্ধে নানা (বিতর্কমূলক) বিপরীত কথা বলেছেন এবং এক্ষেত্রে বলেছেন, "অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলিয়াছিলেন, ফণী ও আমি সংহাইয়ের এক হোটেলে থাকিতাম। তথায় তিনি ধৃত হন এবং বৈকালে আমিও ধৃত হই।' তিনি পরে মুক্তি পান। ফণী চক্রবর্ত্তী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।...... জার্মান এজেণ্টকে ইংরেজ-পুলিশ কথা বাহির করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছিল।" (পৃঃ ১৭৫)।

ডঃ দত্ত লিখেছেন, "ইত্যবসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে।......ভারতীয় বৈপ্লবিকদের ধরপাকড় আরম্ভ হয়।......জনকতক মেক্সিকো সহরে পলাইয়া য্যান, কিন্তু বেশীর ভাগ, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন, বৈপ্লবিককে আমেরিকার পুলিশ কয়েদ করে। তাহাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা ও তদ্দেশ হইতে একটি মিত্র গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার অপরাধের চার্জ দেওয়া হয়। এই মামলায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধান জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিশের ডেনহাম নামক একজন কর্মচারী তথায় আগমন করে। এই মামলাটি কুৎসিৎ 'হিন্দু ষড়যন্ত্রের মামলা' নামে আখ্যাত হয়।......এই মামলা আরম্ভ হইবার অগ্রে এবং ধরপাকড়ের ঠিক পরেই ইউরোপীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল যে, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী সমস্ত স্বীকার করিয়াছে।......সানফ্রানসিস্কোতে এই মামলার বিচার হয়। ব্যাংকক হইতে ধৃত ও 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার'* রাজসাক্ষী যোধসিংকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আনা হয়। সাক্ষ্য দিতে অস্বীকারের ফলে পুলিশ তাহার উপর এইরূপ নির্যাতন করে যে, সে উন্মাদ হইয়া যায়।......এই মামলার বিচারে অনেক ভারতবাসীর চারি বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়।......আর একটি মামলা আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট খাড়া করে। [এই মামলায় তারকনাথ দাসের] চারি বৎসর কারাদণ্ড হয়; শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষও ধরা পড়েন।" তাঁরা নাকি Indian Provisional Government গঠন করেছিলেন। (পৃঃ ৬৫—৬৮)

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যার জন্য লণ্ডন-পুলিশ গুণ্ডা লাগিয়েছিল।

"সুইস পুলিশই চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণ বাঁচাইয়া দেয়।" কিন্তু নিরপেক্ষ দেশে ইংরাজ গুণ্ডারও যেমন, বাঙালি বিপ্লবীরও তেমনি নির্বাসন দণ্ড হ'ল।

এইভাবে বার্লিনকে কেন্দ্র ক'রে বাঙালির বিপ্লব সাধনা সুদূর প্রাচ্যে, পশ্চিম এশিয়ায়, তুরস্কে, সুইডেনে, আমেরিকায় ব্যর্থ হয়ে যায়। তারপর অকস্মাৎ এক নতুন মোড় নেয়। সে ইতিহাস পৃথক। তার প্রকৃতি পৃথক। কিন্তু বাঙলাদেশের আগ্নেয়গিরি একটা কালের জন্য স্তিমিত হ'লেও নির্বাপিত হয় নি।

'অহিংস সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'

গান্ধীজীর শান্তিপূর্ণ বৈধ অসহযোগ আন্দোলনের নৌকো চৌরিচৌরা চরে এসে ঠেকলে বাঙলার বিপ্লবীরা আর একবার গোপন আস্তানায় আস্তানায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে লাগলেন।

এই পুনর্জাগরণের পটভূমিকায় থাকল চৌরিচৌরা ঘটনায় হিংসা-প্রতিহিংসার পটভূমিকাও প্রলম্বিত। চৌরিচৌরা উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার এক চৌকি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পুলিশ-নিপীড়িত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে চৌকিতে আগুন লাগিয়ে দেয়; একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও জনা কুড়ি কনেস্টেবল পুড়ে মরে।

২২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। হাজতে মারা গেল ছ'জন, সম্ভবত নির্যাতনেই, একজনের দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিল; ব্যাধিগ্রস্ত কারামুক্তি পেল। দু'জনের দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল, অবশিষ্টের মধ্যে ৪৭ জনকে মুক্তি দিয়ে ১৭২ জনের বিরুদ্ধে আনা হল হত্যা, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগের অভিযোগ। সবারই মৃত্যুদণ্ড। আপীল হ'ল; রায় বেরোলো ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল। মৃত্যুদণ্ড বহাল রইল ১৯ জনের; ১১০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আর সব বিভিন্ন মেয়াদে; ৩৮ জন পায় মুক্তি। সে প্রলম্বিত পটভূমিকায় রইল মৃত্যুদণ্ডিত আবদুল্লা (সুখী, সুখাই), ভগবান, বিশ্রাম, দুধাই, কালীচরণ, লাল মহম্মদ, লাল্টু, মহাদেও, মেঘু (মহম্মদ), নজর আলি, রঘুবীর, রামলগন, রামরূপ, রূপালি, সহদেও, সম্পত ১, সম্পত ২, শ্যামসুন্দর, সীতারামের রক্তস্বাক্ষর।

পুনর্জাগরণে প্রথম পদক্ষেপ করল চট্টগ্রাম, রেড বেঙ্গল পার্টি। পরৈকোড়া ডাকাতির পর পাহাড়তলী ডাকাতি। আসাম বেঙ্গল রেলের টাকা এল বটে গোপন আড্ডায়, পুলিশের সার্চলাইটও পড়ল সেখানে। ঝোপ-জঙ্গলে ছুটোছুটি, আর পুলিশের সঙ্গে গেরিলা লড়াই। জন তিনেককে বন্দী করা গেল, শাস্তি দেওয়া গেল না। হাওড়ার কোনা, কলকাতার উল্টাডিঙি, গোয়াবাগান, গড়পার—ছোটখাট ছিটেফোটার ডাকাতি। শাঁখারিটোলা ব্রাঞ্চ পোস্টাফিসে ঘটল গুরুতর কাণ্ড। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট বেলা সাড়ে তিনটা। এল তিনজন যুবক। টাকার থলি ছিনিয়ে নিতে গেলে পোস্টমাস্টার অমৃতলাল দিলেন বাধা। সঙ্গে সঙ্গে গুলী ও

মৃত্যু। এবার পলায়ন। লোক ধাওয়া করছে পেছনে। বরেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে এক রকে বসতেই ধরে ফেলল পুলিশ। হাইকোর্টের দায়রায় ফাঁসীর আদেশ হয়, ফুলবেঞ্চে (সেপ্টেম্বর ২৬) ও প্রিভিকাউন্সিলে (১৯২৪, ৩১এ জুলাই) একই দণ্ড বহাল থাকে। সর্বশেষে লাটের করুণায় দণ্ড হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

জের হিসেবে হ'ল 'আলিপুর বোমার মামলা'। কাউকে আদালতে দণ্ড দেওয়া গেল না বটে কিন্তু বাঙলার এই পুনরভ্যুত্থান অঙ্কুরে বিনাশের জন্য সংশোধিত ফৌজদারি আইনে বৃটিশ সরকার সাপটে ধরলেন সন্তোষকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ বাগচী প্রমুখ ১৮৭ জনকে ; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন-এ সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, মনমোহন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, রবি সেন, অমৃত সরকার, রমেশ চৌধুরি বন্দী হলেন। সব বিনাবিচারে। সারা ভারতবর্ষে এক বাঙলাদেশেই।

বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার, বিপ্লবী নিপীড়নের নায়ক, টেগার্টকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিতে হবে। খবর নিয়ে জানা গেল, টেগার্ট রোজ প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন। শ্রীরামপুরের এবং হুগলী বিদ্যামন্দিরের শান্ত ছেলে গোপীমোহন সাহাও বেরোলেন শিকারে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারির সকাল। ঐ তো শিকার। নিশ্চিন্তে দেখছেন চৌরঙ্গীর শো-কেস। গোপীমোহন অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়লেন রিভলভার ; পিঠে গুলী খেয়ে আহত ফিরে দাঁড়ালেন। গোপীমোহনের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ; আর একটা গুলী ; ভূপতিত দেহে আরও। তারপর পলায়ন। সমান্তরালে চলেছে একটা গুলী। তার দিকে আর একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলী। পেছনে লোক ছুটছে, সংখ্যা বাড়ছে। একটা মোটর গাড়ি, কিন্তু ড্রাইভার নারাজ ; ব্যর্থ সেটিও। একটা ঠিকা গাড়ীর পা-দানিতে পা রাখতে যেতেই বন্দী—একটা পিস্তল, একটা রিভলভার, ৪০টা কার্তুজ সঙ্গে। পেলেন জনতার নির্বিচার দণ্ডও, সব-ক্ষত নিয়ে আদালতে হাজির—বাম উরুতে তিন, ডান হাতের কনুইয়ের কাছে এক, ডান-চোখের পাশে বুলেট চিহ্ন তিন, পিঠের বামদিকে বুলেট চিহ্ন এক।

বন্দী চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, "টেগার্ট ছিল আমার লক্ষ্য, দুর্ভাগ্য-বশত হত্যা করেছি এক নিরীহ সাহেবকে—দেখতে টেগার্টের মতই। ভাগ্যগুণে টেগার্ট গেলেন বেঁচে ; দুর্ভাগ্য আমার ; আমার হাতে তাঁর মৃত্যু হ'ল না। বাঙলায় যদি একজনও দেশপ্রেমিক থাকেন তিনি আমার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবেন। আমি যে ভুল করেছি তিনি তা করবেন না।"

নিরীহ সাহেবটির নাম ডে (Ernest Day)। ব্যর্থতায় গোপীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর,

ক্ষত স্থানে স্থানে ব্যাণ্ডেজ, বিচারকার্যে উদাসীন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত; তাড়া দিয়ে চলেছেন সরকারী উকিলকে। ম্যাজিস্ট্রেটের সিঁড়ি বেয়ে দায়রায়। ১৬ই ফেব্রুয়ারি রায় উচ্চারণের মুখে বললেন, “আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু ভারতের প্রতিগৃহে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে।” অনিবার্য প্রাণদণ্ড। ফাঁসীর দিন ঘনিয়ে আসছে, ওজন বাড়ছে। ১৯২৪এর ১লা মার্চ; সেই শুভদিন। বিচারকালে গোপীমোহন বার বার বলেছেন। মায়ের ডাক তিনি শুনেছেন, মায়ের কোলে তিনি যাচ্ছেন। তুচ্ছ ফাঁসীমঞ্চ; উঠে গেলেন বলিষ্ঠপদে; দড়িটাই শুধু থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল নিষ্কম্প শহীদের ভারে। সারা ভারতে তখন অহিংসার তপস্যা; চৌরিচৌরার দীর্ঘশ্বাস; তবু বাঙালী বিপ্লবী গোপীমোহনের স্বপ্নে সমগ্র ভারত। মা'র কাছে চিঠিতে লেখা : ভারতের প্রত্যেক মা যেন তোমার মত সন্তান প্রসব করেন।

কিন্তু অবশিষ্ট ভারত তখন রুষ্ট; গোপীনাথ তাঁদের অহিংস তপস্যায় ঘটিয়েছেন বিঘ্ন। বাঙলার মানসিকতা ও অবশিষ্ট ভারতের মানসিকতায় বিরাট ফারাক। আবারও টেগার্টের পেছনে গুলী ছুটেছিল এবং আবারও ভুল। ১৯২৪এর ২৩এ এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটা। টেগার্ট নয়—ব্রুস (Bruce)। গুলী গা ঘেঁষে চলে যায়।

বাঙলার বিপ্লব-সাধনা চলেছে অব্যাহত। না, বাঙলার বাইরে ভারতে সর্বত্রই যুবসমাজ বাঙলার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পারেনি। বিহার সীমাতিক্রম করে সে শিখা লেগেছে উত্তর প্রদেশেও।

১৯২৫ এর ৯ই আগস্ট। রাত্রি সাড়ে আটটা। লক্ষ্ণৌ জংসন থেকে ১৪ মাইল দূরে কাকোরী থেকে ট্রেন ছাড়বার মুখে চারজন আগন্তুক গার্ডের গাড়িতে উঠে পড়ে বলেন, ট্রেন থামাতে হবে। মালপত্র স্টেশনে পড়ে আছে। তুলতে হবে। গার্ড নারাজ। কাকোরী ও আলমনগরের মাঝামাঝি ট্রেনের শেকলে টান পড়ে; দু'জন নবাগত যাত্রী রিভলভার উঁচিয়ে ধরেন। আরও জন পাঁচেক উঠে আসেন। ওদিকে দু'জন ড্রাইভারকে উবুড় হয়ে পড়ে থাকতে হুকুম দেন। তিন চারজন টাকা ভরতি একটা লোহার সিন্দুক নামিয়ে নেন। উৎসুক অজ্ঞ যাত্রীদের মধ্যে এক গোর্খা বন্দুক তুলে ধরতেই সে পাল্টা গুলীতে ধরাশায়ী হয়। এমন সময় এসে পড়ে দুন এক্সপ্রেস। ফাঁকা সিন্দুকটা পড়ে থাকে রেল লাইনের ধারে। টাকা নেওয়া হয়ে গেছে।

জনা পঁচিশেককে গ্রেপ্তার করা হ'ল ১৯২৬-এর ৪ঠা জানুয়ারি অবধি। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তশেষে ২৩ জন হলেন দায়রা সোপর্দ (১৬ই এপ্রিল)। ১লা

মে থেকে লক্ষ্ণৌতে দায়রা বিচার। রায় বেরোলো ১৯২৭ এর ৬ই এপ্রিল। দু'জন পলাতক—আসফাক উল্লা ও শচীন বক্সী—পৃথক মামলায় দণ্ডিত হন। দায়রা-হাইকোর্ট মিলিয়ে শেষ দণ্ড দাঁড়ায় : রামপ্রসাদ বিসমিল, রৌশন সিং, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, আসফাক উল্লা—মৃত্যুদণ্ড। শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, শচীন্দ্রনাথ বক্সী, গোবিন্দ-চরণ কর, যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুকুন্দিলাল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। মন্মথনাথ গুপ্ত—১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; রাজকুমার সিংহ, বিষ্ণুচরণ দুবলিস, রামকিষণ ক্ষেত্রী, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য —১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; প্রেমকিষণ খান্না, রামদুলারি তেওয়ারি, ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়, বনোয়ারি লাল—চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড; রামনাথ পাণ্ডে—তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ফাঁসী হ'ল ১৯২৭ এর ১৭ ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর; ১৯এ ফয়জাবাদ ও গোণ্ডা জেলে যথাক্রমে আসফাক উল্লা ও রমাপ্রসাদ বিসমিলের; ২১এ নৈনী জেলে রৌশন সিংয়ের।

এদিকে বিপ্লবীদের দুটি আড্ডা গড়ে উঠেছিল, একটি দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতি-পাড়ার জীর্ণ এক দোতলা বাড়িতে, আর একটি ৪নং শোভাবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে। পুলিশ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার সূত্র টেনে এনেছিল এদিকটায়। একদা ১৯২৫ এর ১০ই নবেম্বর—কাকোরী ট্রেন ডাকাতির দু'মাস পর—দক্ষিনেশ্বরের বাড়িতে পুলিশের ছায়াপাত হ'ল। এক সঙ্গে অনেক ছেলেকে পাওয়া গেল, উপকরণ উপাচারও প্রচুর। একেবারে হাতে-নাতে। পুলিশ সূতোটা আরও খানিকটা টেনে আনলো শোভা-বাজারের বাড়িতে; তার আগেই চট্টগ্রামের সূর্য সেন খবর পেয়ে হাওয়া। দু'জনকে পাওয়া গেল, রিভলভার কার্তুজ—তাও।

দুটি স্বতন্ত্র মামলা, দুটি স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনাল। ১৯২৬ এর ৯ই জানুয়ারি প্রথম মামলার রায়ে হরিনারায়ণ চন্দ্র, অনন্তহরি মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর দশ বছর দ্বীপান্তর (রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর কাকোরী দণ্ড তখনও অবগুণ্ঠিত); বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখাল দে—পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আপীলে রাজেন্দ্রনাথের ১০ থেকে পাঁচ হয় (তখনও কাকোরী রায় বেরোয়নি)। শোভাবাজারের রায় বেরোলো। হাইকোর্টে দণ্ড বহাল, ১৯২৭ এর ৫ই জানুয়ারী। প্রমোদ চৌধুরি ও অনন্তকুমার চক্রবর্তী—পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

ওঁরা কারাজীবন যাপন করছিলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বম্ ইয়ার্ডে। লক্ষ্য

করতে লাগলেন গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়েরডেটিনিউ ওয়ার্ডে বড্ড বেশী যাতায়াত সুরু হয়েছেগুপ্ত কথা বের করার জন্যে। যাতায়াতের পথটা পড়েছিল ওঁদের কারাকক্ষের পাশ দিয়েই। ১৯২৬ এর ২৮এ মে দিবসটিও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভূপেন ফিরছেন ওঁরা দেখলেন দোতলা থেকে, ইয়ার্ড বন্ধ হবার মুখে একজন ছুটে এসে, যে ওয়ার্ডারের হাতে চাবির গোছা তাকে বললেন এক মিনিট অপেক্ষা করতে, ওপর থেকে একখানা কাপড় পড়ে গেছে। দরজাও খোলা হয়েছে, ভূপেনও সে-জায়গাটা পার হয়ে যাচ্ছেন, একজন কলারটা ধরে নাকে এক ঘুষি। ওয়ার্ডার ভূপেনের সাহায্যে ছুটে আসতে না-আসতেই আর একজনের হাতে লোহার ডাণ্ডা দেখে পলায়ন, সেই ডাণ্ডাই পড়ল ভূপেনের মাথায়—এক দুই তিন। তারপর যে যার সেলে। এতক্ষণে পাগলা ঘণ্টি বাজল, সশস্ত্র পুলিশের দঙ্গল ছুটে এলো বম্-ইয়ার্ডে, আততায়ীদেরও প্রাণ নেয় আর কি। জেলার বললেন, না, ওরা জেলের এক্তিয়ারে। ওয়ার্ডারের বেটনটা পাওয়া গেল রক্তমাখা অবস্থায় কিন্তু ডাণ্ডাটা ? বার তিনেক খোঁজাখুঁজির পর সেটাও পাওয়া গেল কুস্তি লড়বার নরম মাটির নীচে। অবিস্মরণীয় লেখক বলেছেন, ঐ লোহার ডাণ্ডার আবিষ্কার হয়েছে তিনদিন পর।

পরিষ্কার মামলা ; আরম্ভ হ'ল ১৯২৬এর ১৫ই জুন, রায় বেরোলো ছ'দিনেই, ২১এ : ফাঁসী—প্রমোদরঞ্জন, বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তহরি মিত্র ; যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—হরিনারায়ণ চন্দ্র, নিখিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর চৌধুরি, ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, রাখালচন্দ্র দে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। হাইকোর্টের আপীলে—ফাঁসী—প্রমোদরঞ্জন, অনন্তহরি ; যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—ধ্রুবেশ, অনন্ত, রাখাল ; মুক্তি—নিখিলবন্ধু, সুধাংশু, হরিনারায়ণ, দেবীপ্রসাদ। ১৯২৬এর ২৮এ সেপ্টেম্বর প্রমোদ ও অনন্তহরি ফাঁসীর মঞ্চ হয়ে যে পথে গেলেন, কানাই-সত্যেন তার পথিকৃৎ।

পুলিশ যেমন সূত্র থেকে সূত্রান্তরে যায়, বিপ্লবীরাও তেমনি বিপ্লব-প্রচেষ্টার সূত্র রাখেন অবিচ্ছিন্ন। এর পরের যোগসূত্রটা পাওয়া গেল দেওঘরে। কিন্তু নিতান্তই প্রস্তুতি-পর্বে সবাই ধরা পড়ে' দাঁড়ালেন "দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা" শিরোনামার নীচে : দণ্ড হ'ল (১৯২৮, ১লা জুলাই) : শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রচন্দ্র ধর—সাত বছর ; সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র (ধীরেন্দ্র) নাথ ভট্টাচার্য, সুখেন্দুবিকাশ দত্ত, বিজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার সেন—পাঁচ বছর ; অতুলকৃষ্ণ দত্ত, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, বিশ্বমোহন সান্যাল—তিন বছর।

হিসাওয়াড়ের কাছাকাছি দারুণ বিস্ফোরণ ঘটলো ট্রেনে। ১৯২৮-এর ৭ই অক্টোবর। যাত্রীদের তিনজন বাইরে ছিটকে পড়ে, দু' জন নিষ্প্রাণ, আর একজনের শেষ নিঃশ্বাস পড়ল মনমদ পৌঁছোবার আগেই। হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মনমোহন গুপ্তের হ'ল সাত বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড; হরেন্দ্রের বন্ধু মার্কণ্ডেয় বিস্ফোরণে প্রাণ দিয়েছেন আগেই।

বোমা ফাটল কেন্দ্রীয় আইন সভায় ১৯২৯-এর ৮ই এপ্রিল। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতার কংগ্রেসে গান্ধীজী প্রমুখ মহান্ নেতারা ঠিক ক'রে ফেলেছেন তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পেলেই খুশি হবেন। প্রতিবাদে যুব ভারতের বিস্ফোরণ—একপ্রান্তে জালিনওয়ালাবাগের পাঞ্জাব, আর এক প্রান্তে বহু নির্যাতিত বাঙলা—ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত—আঘাতের লক্ষ্য কোন ব্যক্তি নয়, আঘাতের লক্ষ্য সেই ব্যক্তিসত্তাহীন নির্দয় সরকার আর তার অহিংস সমর্থন, কথার কচকচি, মিথ্যা বয়ানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির এই আইনসভা। দণ্ড? হ্যাঁ, দণ্ডের জন্য এঁরা প্রস্তুত, হাতের বোমা হলের শূন্য গর্ভে ফেলে, রিভলভার রেখে হাত বাড়িয়ে দিলেন। নতুনতর সত্যাগ্রহ। সরকারী বিচারালয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর তার দণ্ড।

ভগৎ সিং পড়লেন আদালতে: "আমাদের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ছিল সেই সংস্থাটির বিরুদ্ধে যেটি জন্মাবধি কেবল যে তার অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে তাই নয় এর হানিকারক শক্তিরও স্বাক্ষর রেখেছে।

"যতই আমরা ভেবেছি ততই এই গভীর উপলব্ধি হয়েছে যে, এ শুধু ভারতের অবমাননা ও নিঃসহায়তা জাহির করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে এবং এ হচ্ছে দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের দম্ভ ও আধিপত্যের প্রতীক। জন-প্রতিনিধিগণ বার বার এখানে জাতীয় দাবী উত্থাপন করেছেন—সে যেন শুধু আবর্জনাস্তূপে সমাধিলাভের জন্যেই।...একদিকে দমনমূলক আইন ও স্বেচ্ছাচারী কানুন বাতিল করবার প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশে নিস্পৃহ উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে, আর একদিকে নির্বাচিত সদস্যরা গ্রহণের অযোগ্য সরকারী বিধি-ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করলে তাদের কলমের খোঁচায় সঞ্জীবিত করা হয়েছে।...

"আরও অনেকের আমাদের মতোই তীব্রানুভূতি হয়েছে এবং এই মানব-সমুদ্রের বাহ্যিক প্রশান্তির অন্তস্তল থেকে এক অপ্রতিরোধ্য ঝড় আসন্ন হয়ে উঠেছে।... আমরা অবাস্তব অহিংসার কালাবসান চিহ্নিত করেছি মাত্র; এই অবাস্তব অহিংসার ব্যর্থতা সম্পর্কে উদীয়মান তরুণ সমাজের লেশমাত্র সংশয় নেই।...কোনো

আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ করলে তা নিঃসন্দেহে হিংসাত্মক, সুতরাং, নৈতিক বিচারেও অসঙ্গত। কিন্তু কোনো সঙ্গত লক্ষ্যে-এর প্রয়োগ নৈতিক বিচারেও সমর্থনযোগ্য।"*

ভারতবর্ষে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের তদন্তে এসেছিলেন সাইমন কমিশন; কমিশনে কোনো ভারতীয় ছিল না বলে অভিমান হয়েছিল কংগ্রেসের; সুতরাং সিদ্ধান্ত হ'ল বয়কটের। আর বিক্ষোভ। পাঞ্জাবে বিক্ষোভের বুকে পড়ল লাঠি—এবং লালা লাজপৎ রায়ের বুকে। আঘাতের বেদনা জুড়োলেন মৃত্যুতে—অঙ্গুলি-সঙ্কেত হ'ল নিপীড়ক পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সণ্ডার্সের দিকে; বিপ্লবীর অগ্নিনালিকার তপ্ত আশীর্বাদ লাগল সণ্ডার্সের স্পর্ধিত দেহে। বৃটিশ সরকার উল্লাসে রচনা করলেন ষড়যন্ত্র মামলা, আবার সেই পাঞ্জাব থেকে বাঙলা। বিচার স্থান—লাহোর সেণ্ট্রাল জেল।

"অভিযুক্তের সংখ্যা ৩২; এর মধ্যে সাতজন মুক্তি-প্রতিশ্রুত, অর্থাৎ রাজসাক্ষীর কলঙ্ক-কালিমা নিয়েছে মেখে; ন'জন আপাতত পুলিশের বেড়াজালমুক্ত, পুলিশের ভাষায় পলাতক। আসলে ষোলো জন বন্দী বিচারকের সম্মুখীন।...লায়ালপুরের শুকদেব...কিশোরীলাল রতন...শিব বর্মা...গয়াপ্রসাদ...জয়দেব...যতীন্দ্রনাথ দাস ভগৎ সিং...কমলনাথ ত্রিবেদী...বটুকেশ্বর দত্ত...যতীন্দ্র নাথ সান্যাল...আগিয়ারাম ...দেশরাজ...প্রেম দত্ত...সুরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে...মহাবীর সিং...অজয় কুমার ঘোষ।

"রাজসাক্ষীদের মধ্যে জয়গোপাল...হংসরাজ ভোরা...রামশরণদাস...ললিত মুখার্জি...ব্রহ্ম দত্ত...ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ...মনমোহন মুখার্জি।"

সরকারপক্ষের অভিযোক্তা বিস্তারিত এক কাহিনীতে "সণ্ডার্স ও চমন কিভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় নিহত হয়েছে তার উল্লেখ ক'রে বললেন, ধৃত ব্যক্তিরা একটি বিপ্লবী-দলভুক্ত এবং সারা উত্তর ভারত জুড়ে তাদের ক্রিয়াকলাপ।...

"উদ্দেশ্য: হিন্দুস্থান রিপাব্লিক এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সাহায্যে রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা...।" **

হয়তো এই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাও আগেকার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সারিতেই দাঁড়িয়ে যেত, কিন্তু তাকে সবিশেষ করে তুললেন এক সত্যিকারের অনশনব্রতী যতীন্দ্রনাথ দাস। এ সেই সরকারী কারুণ্য বা বেসরকারী আবেদনছলে অনশন-ভঙ্গের সম্ভাবনাপূর্ণ বহু-বিজ্ঞাপিত আমরণ অনশনের ভঙ্গি মাত্র নয়। মৃত্যু এখানে ধ্রুব, মৃত্যু এখানে সত্য। যতীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক জীবন তিলমাত্রও ফাঁকির মধ্যে গড়ে

---

*লেখকের ছদ্মনাম সত্যানন্দ স্বামী লিখিত 'হে অতীত কথা কও', পৃঃ ৬৯—৭১।

** লেখকের সত্যানন্দ স্বামী ছদ্মনামে লিখিত 'হে অতীত কথা কও', পৃপৃ ঃ ৯৯-১০৪

ওঠে নি। ১৯০৪-এর ২৭ অক্টোবরে যাঁর জন্ম তাঁর গায়ে আঁচ লেগেছে ১৯০৫-এর ; কৈশোর কেটেছে আর্তের সেবায় বস্তিতে বস্তিতে ; তারুণ্যে কংগ্রেস-স্পর্শে বন্যাপীড়িতদের পাশে এবং পুলিশের কণ্টক-স্পর্শও লেগেছে তিনবার ; জেল অভিজ্ঞতার স্বল্প সঞ্চয়। অহিংস অসহযোগের ব্যর্থতায় দৃষ্টি পড়েছে বিপ্লবীর হাতের ওলিম্পিক অনির্বাণ মশালে—ধারক শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—অনুশীলন সমিতিরই একাংশ নতুন নাম ধরেছে—'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন।' ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ চেষ্টায় যতীন হলেন রহমত মিঞা, বসলেন পানের দোকান সাজিয়ে খিদিরপুর ডকে। দক্ষিণেশ্বরের কারবার আবিষ্কারে তুলতে হ'ল দোকানপাট। মীরাটের বৈঠক থেকে এসেই কলকাতায় একেবারে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের জালে। তিন বছর। প্রথম অনশনের মহড়া ২৩ দিনের। ঢাকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নতি স্বীকার করলেন বটে কিন্তু যতীন চালান হয়ে গেলেন একেবারে বাঙলার বাইরে মিয়াঁবালী জেলে। ১৯২৮-এ মুক্তি। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে মেজর যতীন দাস। আবার লাহোর ষড়যন্ত্র নামে বন্দী—শেষবারের জন্য। কুখাদ্য, অসদ্ব্যবহার, অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আমরণ অনশন। রাজনৈতিক বন্দী —সাধারণ ক্রিমিনাল তো নয়, চাই এই স্বীকৃতি। নইলে খাব না। ওরা খাওয়াবেই, আট ন'জন চেপে ধরে নাক দিয়ে নল ঢুকিয়ে জবরদস্তি খাওয়াবেই—যতীনও খাবেন না। নাসারন্ধ্র, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী ছিন্নভিন্ন ক্ষতদুষ্ট হয়ে গেল। যতীন দাস দুই বাহু বাড়িয়ে দিলেন মৃত্যুর দিকে, লাঞ্ছনার নিগড় পরাজয় মানতে লাগল। নিশ্চিত নিশ্চিন্ত বৃটিশ সরকার যতীনের কাছে শপথবদ্ধ ভাই কিরণদাসকে থাকতে দিলেন শয্যাপাশে—এই শপথ যে, মুহূর্তের দুর্বলতায় সে সংজ্ঞাহীন অথবা অবচেতনা-নিমগ্ন আমরণ অনশনব্রতীকে ওষুধ বা খাদ্যবিন্দু দেবেন না। সরকারের এক কমিটি এল আশ্বাসের ঝুড়ি নিয়ে। প্রত্যাখ্যান করলেন। সঙ্গীরা অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, একা যতীন দাস অচঞ্চল নিস্কম্প অগ্নিশিখা, প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞাই। সর্বাঙ্গ অসাড়প্রায় কিন্তু সচেতন ব্যক্তির সামনে জামিনের আবেদন—মৃত্যুবক্ষলগ্ন যতীন অপরিসীম ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করলেন—স্বর্গদ্বার প্রবেশের পাশপোর্ট মঞ্জুর। বৃটিশ সরকারের শেষ সাজানো দৃশ্যটি ধরা পড়ে গেল।

তারপর ১৩ই সেপ্টেম্বর দেহ-শিখা স্তিমিত হ'ল, চৌষট্টি দিনের প্রান্তরেখা শপথে সমুজ্জ্বল। বোম্বাই বলেছিল, ঐ মরদেহ আমাদের চাই, পাঞ্জাব বলেছিল দাবী আমাদের। সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি, টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গমাতাগর্ভজাত অনশনব্রতীর দেহ মাতৃ-অঙ্কে ফিরিয়ে আনতে—এমেচার

তো নয় ; শ্মশানযাত্রাপথ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ১৪ই—উৎকণ্ঠিত হাওড়া স্টেশন থেকে আগ্রহাকুল কেওড়াতলা শ্মশান—এ. আই. সির ৫ই অক্টোবরের বুলেটিনে লেখা :: On September 13, whole of India deeply stirred. এই লাহোরেই অনিচ্ছুক ভারতীয় নেতৃত্ব স্বাধীনতার প্রস্তাবে বিপ্লবী ভারতকে মুক্ত নিঃশ্বাস নিতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মামলা যথারীতি হয়েছিল, রায় (১৯৩০, ৭ই অক্টোবর)—ভগৎসিং, শিবরাম রাজগুরু, শুকদেবের মৃত্যুদণ্ড ; কিশোরীলাল, মহাবীর সিং, শিব বর্মা, গয়াপ্রসাদ, জয়দেব, কমলনাথ তেওয়ারি, বিজয়কুমার সিংহের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আসন্ন ১৯৩০-এর উত্তালতরঙ্গতীরে সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯২৯এর ১১ই আগস্ট "নির্যাতিত রাজনীতিক দিবস" পালনের জন্য মিছিল ও সভানুষ্ঠান হয়েছিল ; তাকে উপলক্ষ ক'রে সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে ১৯৩০-এর ২৩এ জানুয়ারি রাজদ্রোহ এবং রাজদ্রোহের জন্য ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযোগ তোলা হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'ক্রাইম অব প্যাট্রিয়টিজম' ('দেশাত্মবোধের অপরাধ') শিরোনামায় প্রসঙ্গত লিখেছিলেন : পরাধীন দেশে দেশাত্মবোধ সর্বদাই অপরাধ ব'লে গণ্য হয়ে এসেছে। সুতরাং, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর সহকর্মীদের মতো উচ্চশিক্ষায় মার্জিত ও সামাজিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও অতি সাধারণ দুষ্কৃতকারীদের সমতুল্য বিচারে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল।

কি অপরাধ ক'রেছিলেন সুভাষচন্দ্র ওঁরা ? জজ বলেছেন, "মিছিলের নেতা বিচারাধীন সুভাষচন্দ্র বসু সেই সন্ধ্যায় তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতায় অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেটা কি, না, আমরা যেন মুক্ত আকাশ-তলে স্বাধীন মানুষের মত বাস করতে পারি।" কি নিদারুণ অপরাধ !!

'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখলেন : "এ দেশের রাজদ্রোহের আইন যেমন ইচ্ছে টেনে নেওয়া যায় ; এর ব্যাখ্যা বহুলাংশে নির্ভর করে তৎকালে দেশে বিরাজিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার ওপর, বিশেষ ক'রে, আমলাতন্ত্রের মেজাজ ও মর্জির ওপর।"

এই দণ্ডের সংবাদ শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং এর প্রতিবাদে এক সভানুষ্ঠানের আবেদনে স্বাক্ষর দিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাবা গুরদিৎ সিং, শেখ মুজিবর রহমান, শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, রমাপ্রসাদ মুখার্জি, সামসুদ্দিন আহমেদ, জালালুদ্দিন হাসেমী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জি, এবং আরও অনেকে। *

* লেখকের সত্যানন্দ স্বামী ছদ্মনামে লিখিত 'হে অতীত কথা কও', পৃঃ ১৭৬-১৭৯।

"ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়"

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক গোয়েন্দা তাঁর গোপন ডায়েরীতে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর পার্টি, কমুনিষ্ট পার্টি, নিউ ভায়োলেন্স পার্টি, শ্রীসঙ্ঘ, বি-ভি ইত্যাদির ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে বলেছেন, সম্মিলিত একটা পার্টি গঠনের কল্পনা প্রথম আসে তিনজন ভূতপূর্ব রাজবন্দীর মাথায়। তাঁরা হ'লেন: জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র; এঁরা যুগান্তরের নেতা। তাঁদের গোপন বৈঠকে আসেন চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতির চারুবিকাশ দত্ত ও স্বতন্ত্র পথচারী সূর্য সেন। গোপন বৈঠকটা হয় ১৯২২এ যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বসে চট্টগ্রামেই। যুগান্তরের নেতারা সূর্য সেন ও তাঁর অনুগামীদের যুগান্তরে ভেড়াতে সফলকাম হন। কয়েক মাস পর নরেন সেন-প্রতুল গাঙ্গুলী পরিচালিত অনুশীলন সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন চারুবিকাশ দত্ত ও তাঁর দলের সঙ্গে নলিনী দত্ত এসে যোগ দেন। এই দলটি অস্ত্রে-শস্ত্রে অন্য যে-কোন গোষ্ঠির চেয়ে প্রবলতর। শচীন সান্যাল এলেন কলকাতার ভবানীপুরে থাকতে; সংযোগ হ'ল ঢাকার নরেন সেনের সঙ্গে। শচীন সান্যাল ছিলেন অবিলম্বে বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী, এজন্য অস্ত্রশস্ত্র, লোক, চাইলেন নরেন সেনের কাছে। নরেন অবিলম্বে কিছু করার পক্ষপাতী ছিলেন না, আরও লোকবল না হওয়া পর্যন্ত তিনি শচীনকে নিবৃত্ত থাকতে বললেন। ব্যর্থমনোরথ শচীন চট্টগ্রামের সূর্য সেন ও চারু বিকাশের দল, ঢাকার নলিনী দত্তের দল ও নিজের বারাণসী দল মিশিয়ে দিয়ে গড়লেন 'ভায়োলেন্স পার্টি।' ১৯২৫-এর ২৫এ ফেব্রুয়ারি ধরা যখন পড়লেন তখন তাঁর কাছে পাওয়া গেল সেই সব পুলিশ অফিসার ও পুলিশ ব্যারাকের তালিকা যেগুলো তাঁর আক্রমণ-লক্ষ্য হয়েছিল। ১৯২৫-এর ৭ই আগস্ট খবর পাওয়া গেল, প্রত্যেক পার্টি থেকে একজন ক'রে নিয়ে একটা সেণ্টাল বোর্ড (কেন্দ্রীয় পর্ষদ) হয়েছে এবং তাতে আছেন: হরিনারায়ণ চন্দ্র—উত্তরপাড়া গোষ্ঠি; অনন্তহরি মিত্র—নদীয়া গোষ্ঠি; সুধীর বসু—ঢাকা গোষ্ঠি; চারুবিকাশ দত্ত—চট্টগ্রাম গোষ্ঠি; দেবেন্দ্র দে ওরফে খোকা—কলকাতা; বীরেন্দ্র ব্যানার্জি—শালকিয়া। এই হ'ল 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি'। সংগঠন, বোমা তৈরি, অস্ত্রসংগ্রহ চলতে লাগল; বলেছি, তারই এক আবিষ্কার হ'ল গিয়ে দক্ষিণেশ্বর, শোভাবাজার স্ট্রীটের ৪নং বাড়ি। শালকিয়া গোষ্ঠির সুধাংশু চৌধুরিকে বন্দুকটি

পাচারের দায়ে রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার করা হয় ; এঁদের ষড়যন্ত্র বর্মা অবধি ছড়িয়েছিল এবং 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' জাপানে রাসবিহারী ও চীনে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে যোগপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। যে কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'সুকিয়া স্ট্রীট বোমা মামলা'য় দণ্ড হয়েছিল তিনি জাপান গেছলেন। বারাণসীর কেশব চক্রবর্তীও মস্কো গিয়ে এম এন রায়ের সঙ্গে যোগ-প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপ গেছলেন।

সংশোধিত ফৌজদারি আইনে অনেকেই বন্দী হন ; চারুবিকাশ দত্ত ১৯২৫-এর ১৮ই আগস্ট ঢাকার ডি-আই-ওকে হত্যার উদ্দেশ্যে ওঁর বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। সূর্য সেনও ১৯২৬ এর অক্টোবর ধরা পড়ে যান। চট্টগ্রাম গোষ্ঠি সুখেন্দুবিকাশ দত্ত ও দেবেন্দ্রলাল গুপ্তের নেতৃত্বে সব চাইতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভূতি গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ভবানীপুরের গোষ্ঠি, বিজন ব্যানার্জি পালিয়ে থাকায় লক্ষ্মী ঘোষের নেতৃত্বে শালকিয়া গোষ্ঠি ও সন্তোষ মুখার্জির নেতৃত্বে ডোমজুর গোষ্ঠিও কিছু কম যায়নি। ১৯২৭-এর ১৩ই জানুয়ারি বিজন ব্যানার্জি ধরা পড়ে যান, সঙ্গে পাওয়া যায় অতুল দত্ত ও প্রসাদ চ্যাটার্জিকে। এর আগে সুকিয়া স্ট্রীটের এক বাড়িতে ১১টি বোমার খোল পাওয়া গেলে কালীপ্রসাদ ও রবীন্দ্র কর গুপ্তকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিজন ব্যানার্জি ধরা পড়ায় বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য বারাণসীর ভার নিয়ে বাঙলায় আসেন এবং ছিন্ন সূত্রগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করেন। বারাণসী ফিরে যাবার সময় দুটি মৌজার পিস্তল ও আটশতাধিক কার্তুজ, তাঁর ভাই সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও জলপাইগুড়ির তেজেশ ঘোষসহ ধরা পড়ে যান। এই মামলা চলাকালে ভবানীপুর দল অত্যন্ত সক্রিয় হ'য়ে উঠে পুলিশ অফিসারদের হত্যার চক্রান্ত করে। বারাণসীর রায়বাহাদুর জে এম মুখার্জিকে লক্ষ্য করে মণিভূষণ ব্যানার্জি গুলী চালালে গুলীটা রায়বাহাদুরের পেটে লেগেছিল এবং মণির দশ বছর জেল হয়েছিল এ বছরের গোড়ায়। আরও চেষ্টা হ'ল কিন্তু সতর্কতার জন্য সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

চট্টগ্রামের দলও নতুন ক'রে সংগঠনে লেগে যায় এবং নেতাদের বন্ধনমুক্তির অপেক্ষা করতে থাকে।

১৯২৭-এর আগস্ট থেকে ১৯২৮ অবধি বেঙ্গল অর্ডিনান্সে, পরে সংশোধিত ফৌজদারি আইনে বন্দীরা একে একে মুক্তি পেতে লাগলেন এবং যুগান্তর অনুশীলনের নেতারা মিলে হরিকুমার চক্রবর্তীকে প্রেসিডেন্ট ও খুলনার সতীশ চক্রবর্তীকে সেক্রেটারি ক'রে ১৬ জনের এক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন।

ডায়েরী-লেখক-গোয়েন্দার মতে এই সুরু হ'ল বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টার তৃতীয়

পর্যায়। ১৯২৮-এ সব নেতাই ছাড়া পেয়ে যান। ১৯২৯-এর বরিশাল সম্মেলনে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নেতারাও মিলিত হন যাতে এক কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে একই সঙ্গে অভ্যুত্থান করা যায়। কিন্তু নেতারা একমত হ'তে পারেন না। ফলে, অনুশীলন সমিতির একদল যুবক বেরিয়ে এসে অনুশীলন রিভোল্ট গ্রুপ (এ. আর. জি.) গঠন করেন; যুগান্তরের কিছু বিপ্লবীও এতে যোগ দেন। সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন সেন গুপ্ত, শচীন কর গুপ্ত, প্রতুল ভট্টাচার্য ছিলেন এ. আর. জি'র প্রধান; যুগান্তরের নলিনী দাসও যোগ দেন।

'মেছুয়াবাজার বা কলাবাগান বস্তি বোমার মামলা' এরই এক পরিণতি এবং এও "যে ফুল না ফুটিতে লুটালো ধরণীতে"-র দৃষ্টান্ত। প্রথম ধরা পড়লেন নিরঞ্জন সেন গুপ্ত, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র পাকড়াশি, বিভূতি ঘোষ, সুধাংশু দাশগুপ্ত, নির্মল দাস, রমেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস, আনন্দকুমার দাস, দেবপ্রিয় চ্যাটার্জি, ধরনীকান্ত বসু, নিশিকান্ত রায় চৌধুরি, সুধাংশুকুমার আইচ। এরপর কলকাতারই নানা জায়গা থেকে ধরা পড়লেন মহিমারঞ্জন সেন গুপ্ত, সুবোধরঞ্জন চক্রবর্তী, শচীন্দ্রলাল কর গুপ্ত, মহেন্দ্র লাহিড়ী, রবীন্দ্র বসু, সুধাংশু মজুমদার, বিহারীলাল বিশ্বাস, সুধীর রায় চৌধুরি, সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, সত্যব্রত সেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত, নৃত্যগোপাল রায়, তারাপদ গুপ্ত।

গোয়েন্দা তাঁর ডায়েরীতে বলেছেন, জেলা সংগঠনের যে তালিকা তল্লাসী করে পাওয়া গেছল তাতে দেখা যায়, অধিকাংশ নামই শঙ্কর মঠ গোষ্ঠির। কলাবাগানে বোমা আবিষ্কার সম্পর্কে জনা চল্লিশকে ধরা হয়, ২৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়; পরে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, একজন প্রমাণাভাবে মুক্তি পান, একজন রাজসাক্ষী হয়ে যায়। ট্রাইবিউনালের রায় (১৪. ৬. ৩০) ছেঁকে হাইকোর্টের রায়ে (২২. ৪. ৩১) দণ্ড দাঁড়ায় নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সাত বছর দ্বীপান্তর; সতীশচন্দ্র পাকড়াশি, শচীন্দ্র নাথ কর গুপ্ত, মুকুল রঞ্জন সেনগুপ্ত—সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড; রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস, সুধাংশুলাল দাশগুপ্ত, নিশিকান্ত রায় চৌধুরি—পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ন'জন মুক্তিলাভ করেন।

গোয়েন্দার ডায়েরীতে আছেঃ মেছুয়াবাজার বোমার মামলার পর যুগান্তর পার্টি ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে ভায়োলেন্স বা বলপ্রয়োগের পথানুসরণই স্থির করে; কিন্তু পৃথ্বীশ বসু, সুধীন্দ্র রায় ওরফে খোকা, বিধু সেন সঙ্গীসাথী নিয়ে ময়মনসিংয়ে যুগান্তরের প্রধান দল ছেড়ে 'অগ্রসর দলের সঙ্গে যোগ দেন। যুগান্তরের চট্টগ্রাম গোষ্ঠিও বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী। প্রতুল ভট্টাচার্য আলোচনার জন্য সূর্য সেন ও

গণেশ ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতুল ভট্টাচার্য কলকাতায় ফিরলে ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় তাতে উপস্থিত থাকেন বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরি, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, পৃথ্বীশ বসু, প্রতুল ভট্টাচার্য, লোকনাথ বল প্রমুখেরা এবং ১৯৩০-এর জুন মাসে একই সঙ্গে অভ্যুত্থান স্থির হয়। বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরি, অনন্ত সিং ও পৃথ্বীশ বসুর ওপর যথাক্রমে কলকাতা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংয়ের ভার ন্যস্ত হয়। বিনয়েন্দ্র ঢাকায় গিয়ে ব্রজেন দাস ও সতীন রায়কে কলকাতার অভ্যুত্থানে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। ময়মনসিংয়ের পুলিশী তৎপরতায় চট্টগ্রামের দল সংশয়াচ্ছন্ন ও অধৈর্য হয়ে অভ্যুত্থানের তারিখটা এগিয়ে দেয়। ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামদল অস্ত্রাগার আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল অর্ডিনান্সের জালে সারা বাঙলা ছেঁকে বিস্তর বিপ্লবীকে ধরে ফেলে পুলিশ; রাজসাহীর রাজনৈতিক সম্মেলনও পুলিশকে সুযোগ এনে দিয়েছিল।

"ধন্য চট্টগ্রাম" সেকালের সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার একটি প্রবন্ধের শিরোনাম। বাঙলার বিপ্লব সাধনায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ব্যাপকতায় ও দুঃসাহসিকতায় নিঃসন্দেহে বৃহত্তম কর্মকাণ্ড এবং চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদের সহযোগে বৃটিশ প্রশাসকেরা দীর্ঘকাল ধরে যে অকথ্য নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালিয়েছে তার তুলনা নেই। বাঙলার কোন অঞ্চল বা অপর কোন দল এমন সামরিক শৃঙ্খলায় ও পরিকল্পনায় এত বড় কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। এর কাছাকাছি তুলনা মেদিনীপুর (তা বলেছি) আর ঢাকার বিনয়-বাদল-দীনেশের অবিস্মরণীয় কীর্তি (তা যথাস্থানে বলব)।

জালালাবাদ-যুদ্ধের সেনাপতি লোকনাথ বল ছিলেন স্বাধীনোত্তরকালে কলকাতার পৌরসভার এক ডেপুটি কমিশনার; শ্রীফকির সেন ও শ্রী বিনোদ দত্তের অনুরোধক্রমে মৃত্যুর দু'এক বছর আগে স্মৃতিচারণায় রাজি হন এবং আমি হই তাঁর অনুলেখক। শেষ ক'রে যেতে পারেন নি, শেষ করবার তেমন প্রবল উদ্যম ও উৎসাহও ছিল না। শরীর ও মনে সর্বদাই কেমন একটা অবসাদ লক্ষ্য করেছি। তবু দু'টো ছোট খাতা ভরবার মত নোট আমার হয়েছিল। * হৃদ্‌রোগে কাতর গাঢ় পীতবর্ণ লোকনাথ মৃদুভাষে বলেছিলেন:

"১৮ই এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে লবণ সত্যাগ্রহের নামে বেশ আড়াল করা

---

* আমার সত্যানন্দ স্বামী ছদ্মনামে লেখা 'হে অতীত কথা কও'-য়ে এর উদ্ধৃতি দিয়েছি।

গেছল। যাঁরা লবণ সত্যাগ্রহে প্রস্তুত তাঁদের মধ্যে গুপ্ত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সৈন্যদের আনাগোনা চালিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করা কঠিন হয় নি। তাদের আরও নিঃসংশয় করার জন্যে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সূর্য সেনের স্বাক্ষরে এক ইস্তাহার বেরোলো : 'দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি শোনা যাইতেছে। সর্বত্র আইন অমান্যের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।......কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবণ-আইন ছাড়া অন্য আইন (যেমন রাজদ্রোহ আইন) অমান্যও আরম্ভ হইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া আমরাও আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি—ইহার জন্য সর্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই—লোক ও টাকা চাই।'

"১৮ই এপ্রিল সকালবেলা কংগ্রেস অফিসে এল ছোট ছোট দল—এবং এরাই সেই বাছাই দল। মাস্টারদা প্রত্যেক দল ও দলনেতাকে সুস্পষ্ট কার্যক্রম স্থির ক'রে দিলেন। যাঁরা রেল লাইন তুলবেন তাঁরা আগের দিন রওনা হ'য়ে গেছেন। আজ রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটে যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় এরা সক্রিয় হয়ে উঠবেন।...

"রাত দশটা। আমাদের গাড়ি এসে থামল গেটের কাছে। কিন্তু যে-ছেলেটির গেট খুলে দেবার কথা সে তো নেই। জীবন ঘোষাল নেমে গেল গাড়ি থেকে, ঠেলে গেটটা খুলে দিল। তারপর উঠে এল গাড়িতে। গাড়ি গেট পেরিয়ে অস্ত্রাগার ভবনের প্রাঙ্গনে ঢুকল—অস্ত্রাগারের দিকে এগোতে লাগল।"

"সান্ত্রী হাঁক দিয়ে উঠল : হল্ট, হুকুমদার।"

"ফ্রেণ্ডস।"

"ফ্রেণ্ডসদের গাড়ী সিঁড়ি ঘেঁষে থামল। আমি একাই নামলাম। আমার ডান হাতটা পেছনে, হাতে রিভলভার। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এলাম। সান্ত্রী আর আমার দূরত্ব সাত কি আট হাত। ওকে ডাকলাম। ও এগিয়ে এসে আমায় একটা 'বাট স্যালিউট' করল। আমি তড়িৎগতিতে ওর রাইফেলটা বাঁ হাতে ধরে ফেললাম। ডান হাতের রিভলভার উদ্যত করে বললাম, ছোড়ো। সে কিন্তু ছাড়ল না। সে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। আমাকে চিনেছে। ফ্রেণ্ড নই একেবারেই! সে ছিনিয়ে নিল ওর বন্দুক এবং তা দিয়ে আমায় মারতে উদ্যত হল। উপায় ছিল না। আমার হাতের রিভলভার গর্জন ক'রে উঠল, ও পড়ল লুটিয়ে।

"কাছেই আর তিনটি সান্ত্রী ছিল বসে। অদূরেই ছিল রাইফেল রাখার র‍্যাক। গুলীর শব্দে ওরা লাফিয়ে উঠল—আমার বন্ধুরাও লাফ দিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। আর কেউ হতাহত হয়নি। সান্ত্রীরা মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সাক্ষী রইল র‍্যাকের রাইফেলগুলো।

"সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেলের ওপর ছিল এই অস্ত্রাগারের ভার। অস্ত্রাগার প্রাঙ্গনেই ছিল তাঁর বাংলো। আমার রিভলভারের প্রথম গুলীর শব্দ তাঁর কানে গেছল। তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন তক্ষুণি। হাঁক দিলেন, কে তোমরা?

"আমরা জবাব দিলাম: আমরা ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির সেনানী। প্রেসিডেন্টের আদেশমতো আমরা অস্ত্রাগার দখল করেছি। তুমি যদি কোন অনিষ্ট করার চেষ্টা করো, মারা যাবে।

"বলা বাহুল্য, ইংরেজীতেই বলেছিলাম কথাগুলো। সাহেব মুহূর্তকাল ভাবল, তারপর ছুটে বাংলোর ভেতরে গেল। কিন্তু বাংলোর দিকে তাক্ করে আমাদের শান্তি নাগ তাঁর হাতের বি-এল গান ধরে ছিল। আমি তাকে প্রস্তুত থাকতে বললাম। অনুমান ঠিকই হয়েছিল। ফ্যারেল একটি রিভলভার নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছিলেন। শান্তির গুলী গিয়ে লাগল তাঁর গায়ে। ফ্যারেলের গতিরোধ হ'ল। ফ্যারেল পড়ে গেলেন।

"আমরা গলা ফাটিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে চলেছি। গর্বে বুক ফুলে উঠেছে, কণ্ঠে শতকণ্ঠের শক্তি পেয়েছি, আকাশ হাত বাড়িয়ে আমাদের ধ্বনি নিয়েছে, ঈথর তরঙ্গমালায় ছড়িয়ে দিয়ে চাঁটগায়, চাঁটগা ছাড়িয়ে আরও দূরে, বহু দূরে। আমাদের রিজার্ভ ফোর্স এসে জুটল। স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছি বাতাসে, নতুন দৃষ্টিতে দেখছি পৃথিবীকে—এই অস্ত্রাগার আমাদের।...

"অক্সিলিয়ারী অস্ত্রাগারটি ছিল রাস্তার ওপরেই। তাই আমি নির্দেশ দিলাম যে, কোনো গাড়ি যেন এ পথে না যায়। কড়া নজর রাখতে হবে। নজর রাখতেই একটা গাড়ীকে শহরের দিক থেকে এদিক পানে আসতে দেখা গেল। ড্রাইভারকে থামতে বলা হ'ল। আমাদের গ্রাহ্য না করেই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে গুলী করা হ'ল।"

"এরপর একটা উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। আমাদের হাতের রিভলভার ও পিস্তলগুলো 'জাম' হয়ে গেল। এই অস্ত্রাগারে কোন কার্তুজও আমরা পাইনি। অস্ত্রাগার দখল করেও এই অবস্থায় অত্যন্ত নিরুপায় বোধ করতে লাগলাম।

"আর ঠিক এই সময়ে পাহাড়তলীর দিক থেকে একটা গাড়ি আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমরা উদ্বিগ্ন হলাম, আমাদের সান্ত্রী তাদের থামতে বলল। কিন্তু গাড়িটি আমাদের সান্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অস্ত্রাগারের বড় গেটের সামনে এসে থামল। চারজন বৃটিশ মিলিটারী অফিসার। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার।

আমাদের চরম সঙ্কট। অস্ত্রাগারে ওদের সান্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া রাইফেলেও কার্তুজ নেই, আমাদের রিভলভার পিস্তলগুলো তো 'জাম'।

"হাল ছাড়লাম না। বৃটিশ অফিসারদের উদ্দেশে বললাম, তারা যদি অস্ত্রাগার প্রাঙ্গনে প্রবেশের চেষ্টা করে তবে আমি তাদের চার্জ করার আদেশ দেব। তখন আমাদের সংখ্যা হবে ১২।

"বিফল হলাম। ওরা বলল, 'ক্যা তোম লোক বাঙালী কুত্তা চার্জ করেগা'?

"আমি বললাম, Bombs ready, dynamite ready, fire!

"অবিশ্বাস্য ফল পাওয়া গেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নের এমন প্রত্যক্ষ রূপ আর কোথাও দেখিনি; যে বীরেরা রিভলভার হাতে এই মাত্র আমাদের বাঙালী কুত্তা বলে সম্ভাষণ করছিল, তারা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।"

"আমরাও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। দেশমাতৃকাকে আর একবার ভরা গলায় বন্দনা করলাম। পরে জেনেছি, ঐ বীর চতুষ্টয়ের মধ্যে মেজর বেকার ও ক্যাপ্টেন টেটও ছিলেন।

"আমাদের চেষ্টা হ'ল স্ট্রং রুমটা ভাঙবার। ওটা আটকানো ছিল, চাবিও নেই। একটা মোটা দড়ির মাথা স্ট্রংরুমের গেটটার হাতলে জড়ালাম আর একটা মাথা বাঁধলাম ডজগাড়িতে, তারপর স্টার্ট দিয়ে—এক ঝট্‌কা। বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হ'ল। ভেতরে গেলাম। পেলাম লুইস গান, রাইফেল আর রিভলভার। কিন্তু কার্তুজ পাওয়া গেল না একটাও। তছনছ ক'রে খোঁজা-খুঁজি হ'ল, না, নেই, একটাও নেই।

"কিছুক্ষণ পর পুলিশ অস্ত্রাগার থেকে অনন্ত সিং, টেগরা, নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা মাস্কেট নিয়ে এল। মনোবল আমাদের কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ হয়নি, ওরা এসে পড়াতে তা চতুর্গুণ বেড়ে গেল, আর ঠিক এই সময় এল আর একটি গাড়ি। হাঁক দিয়ে পরিচয় চাওয়া হল। বৃটিশ কণ্ঠে জবাব এল—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সঙ্গে সঙ্গে মাস্কেটগুলো গর্জন করে উঠল এবং আমাদের কেউ কেউ গাড়ীর দিকে ছুটে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের গার্ড মারা গেল। ড্রাইভার আহত হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটকে রক্ষা করেছে প্রকৃতির অন্ধকার। পালিয়েছেন।...

"আমরা গাড়ি চালিয়ে পুলিশ অস্ত্রাগারে এলাম।"...

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম বীর আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর কাহিনীতে লিখেছেন: ৬৫ জন কর্মীকে নিয়ে ছয়টি স্কোয়াড গঠিত হয়েছিল। পুলিশ লাইন আক্রমণের জন্য ৩২ জনকে নিয়ে প্রথম স্কোয়াড। এই স্কোয়াড পরিচালনা করেছিলেন গণেশদা (গণেশ ঘোষ) ও অনন্তদা (অনন্ত সিং)। অক্সিলিয়ারি অস্ত্রাগার আক্রমণের

দায়িত্ব ছিল ছ'জন নিয়ে দ্বিতীয় স্কোয়াডটির ওপর; এই স্কোয়াড পরিচালনা করেছিলেন নির্মল সেন ও লোকনাথ বল। ছয় জনকে নিয়ে গঠিত তৃতীয় স্কোয়াডটির ওপর ভার ছিল টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করা; পরিচালনা করেছিলেন অম্বিকাদা (অম্বিকা চক্রবর্তী)। চতুর্থ স্কোয়াডটিতে ছিলেন ছয় জন, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য; ক্লাব বন্ধ থাকায় তাঁরা পুলিশ লাইনের আক্রমণে যোগ দেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কোয়াডের ওপর ভার ছিল ধুম স্টেশন ও লাঙ্গলকোট স্টেশনের রেল-টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।" (১)

"ঘড়ি ধরে ঠিক দশটা তের মিনিটের সময় মোটরে করে আমরা ছজন উপস্থিত হলাম আমাদের গন্তব্য স্থানে।…প্রথমেই সোজা গিয়ে ঢুকলাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কক্ষে।…সুইচবোর্ড ভেঙ্গে চুরমার করবার পর অফিস ঘরগুলিতে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। (২)

"পুলিশ লাইন।…গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তদা, গণেশদা ও আরও কয়েকজন নেমেই আক্রমণ সুরু করলেন।……অস্ত্রাগার থেকে পাওয়া গেল অনেকগুলো মাস্কেট,অনেকগুলো বাক্সভর্তি কার্তুজ ও বিস্তর নতুন কোল্ট ও ওয়েবলী রিভলভার ও রিভলভারের কার্তুজ। এ ছাড়া আরও নানারকমের সরঞ্জাম……। (৩)

"রাত প্রায় ২টা……অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা চূড়ান্ত অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি ঠিক এমনি সময় অতিক্রুত গুলী বর্ষণের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল—ঠক্ ঠক্ করে পুলিশ লাইনের দেওয়ালে এসে লেগেছিল সেই গুলী……মুহূর্তের ভিতরে কমাণ্ডারের (অনন্তদা) আদেশ এলো: 'লাই ডাউন'……আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। গুলী আসছিল নিকটস্থ জলের কলের ছাদ থেকে।……আমাদের সব কটা মাস্কেট থেকে অগ্নিবর্ষণ সুরু হ'ল জল কল লক্ষ্য করে।……ডবলমুরিং নামক স্থানের অস্ত্রাগারটি অনধিকৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। শত্রুপক্ষ আমাদের এই গুরুতর ভুলের সুবিধা নিয়ে প্রথমেই সেখানকার মেশিনগানটি হস্তগত করে প্রতি-আক্রমণের সব চাইতে উপযুক্ত স্থান, জল কল বেছে নিয়ে সেখান থেকে আক্রমণ শুরু করল।…… (৪)

(১) চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী, আঃ গুঃ, পৃপৃঃ ২৭-২৮।
(২) ঐ পৃঃ ৩৫।
(৩) ঐ পৃঃ ৩৭।
(৪) ঐ পৃঃ ৪৫।

"দুই পক্ষেরই গুলীর আওয়াজ থেমে গেছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই এবার তৈরী হ'ল সহরের বাইরে পাহাড়ের দিকে যাবার জন্য......। যথাসম্ভব অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেওয়া হল—আর যেগুলো বয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না, সেগুলো যাতে শত্রুর কাজে আসতে না পারে তার জন্য পুলিশ লাইনের কক্ষগুলিতে আগুন লাগাতে হবে। হিমাংশু সেনের উপর ভার ছিল এ কাজের। পেট্রল ঢেলে আগুন লাগাবার সময় ঘটল গুরুতর ঘটনা—হিমাংশুর সারা দেহে আগুন লেগে গেল।...... অনন্তদা, গণেশদা, জীবন ঘোষাল ও আমি......হিমাংশুকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে উপস্থিত হলাম আমাদের বাসায়......।"(৫)

এই চারজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন প্রধান দল থেকে। লোকনাথ বলেছেন, অনন্ত সিং ছিলেন কমাণ্ডার। তিনি নেই। কে এই দলকে নির্দেশ দেবেন? এর পর কোথায় তাঁরা যাবেন? ভোর হয় হয়। বিহ্বল বিদ্রোহী বাহিনী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাহাড় অঞ্চলের দিকে সরে পড়ল। তারপর ক্রমে ক্রমে জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানেও নিস্তার নেই। ইংরাজের দেশী চরেরা খবর পৌছে দিয়েছে বিদ্রোহীদের গতিবিধির।

২২এ এপ্রিল; অর্ধাশন অনশনে পথচলায় শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।

লোকনাথ বললেন: "শত্রুপক্ষীয় সেনাদল ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে।......এক একটা ক্ষণ যেন এক একটা যুগ। জাতীয় পতাকা সাক্ষী রেখে আমি শত্রু সেনাদের উদ্দেশে চীৎকার করে উঠলাম: 'হল্ট'।......শত্রুপক্ষের সেনাদল এই অপ্রত্যাশিত আদেশে হকচকিয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীদের বললাম: ফায়ার! শত্রুপক্ষের ওপর অগ্নিবর্ষণ হল অবিশ্রান্ত। ইংরাজের বীর সেনাদল পলায়নের পথ খুঁজে পায় না, পড়ি-মড়ি করে দৌড়......। জানতাম শত্রুপক্ষ......আবার ফিরবে।......ওরা এ পাহাড় থেকে ৫০ গজ দূরে একটি, ১০০ গজ দূরে আর একটি পাহাড়ে ঘাঁটি পাতল, তারপর শুরু করল গুলীচালনা। আমরাও বিরতি দিলাম না।......ওদিকে ইংরাজ-শাসনরক্ষী প্রথম সৈন্যদের পেছনে আরও সৈন্য এসে ওদের শক্তিবৃদ্ধি করতে লাগল।......ক্রমে তিন দিক থেকে আমাদের ওপর গুলীবৃষ্টি হতে লাগল। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম, আমাদের কারো কারো মধ্যে ক্রমেই একটা বেপরোয়াভাব সঞ্চারিত হচ্ছে।......ফল হাতে হাতেই ফলল, আমার ভাই (হরিপদ বল)......শত্রু লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই লুইসগানের অনর্গল গুলী ওর দেহ ঝাঁঝরা ক'রে দিল।......আমার

(৫) চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী, পৃঃ ৪৬।

নির্ভয় সাথীরা একে একে ভূমিলগ্ন হতে লাগল, জালালাবাদ পাহাড়ের মাথায় শহীদদের রক্ততর্পণ ও আখর পড়তে লাগল......" *

আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত জালালাবাদ যুদ্ধে আত্মোৎসর্গের যে-তালিকা দিয়েছেন, তা এই : অর্ধেন্দু দস্তিদার (চট্টগ্রাম), জিতেন্দ্র দাস (চট্টগ্রাম) ত্রিপুরা সেন (ঢাকা), নরেশ রায় (ময়মনসিং), নির্মল লালা (চট্টগ্রাম), পুলিন ঘোষ (চট্টগ্রাম), প্রভাস বল, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (কুমিল্লা), মতিলাল কানুনগো (চট্টগ্রাম), মধু দত্ত (চট্টগ্রাম) শশাঙ্ক দত্ত (চট্টগ্রাম), হরিগোপাল বল (টেগরা) (চট্টগ্রাম)।

জালালাবাদের প্রথম সজ্ঘর্ষদিনে (২২এ এপ্রিল) রাত দু'টোয় চট্টগ্রাম থেকে ৬১ মাইল দূরে ছোট্ট একটা সজ্ঘর্ষ হয়েছিল। ১৮ই রাতে দল-বিচ্ছিন্ন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল ২২এ এপ্রিল চট্টগ্রাম ছেড়ে কুমিল্লা রওনা হন। ওঁরা ছদ্মবেশে ভাটিয়ারি স্টেশনে এসে কুমিল্লার টিকিট কাটতে গেলে সন্দিগ্ধ স্টেশন মাস্টার কুমিল্লার টিকিট নেই এই মিথ্যা অজুহাতে লাকসামের চারখানি টিকিট দিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। ট্রেন ফেনী স্টেশনে থামতেই ওঁরা ধরা পড়ে যান। কিন্তু দেহ তল্লাসী করতে এলে ওঁরা গুলী চালিয়ে আপাততঃ পিঞ্জর-মুক্ত হন ও নানা বিপর্যয় ও কষ্টের মধ্য দিয়ে কলকাতা পরে চন্দননগরে আসেন। এই চন্দননগরে গোঁদলপাড়ার আশ্রয়গৃহে থাকতেই অনন্ত সিং পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে পূর্বাহ্নেই জানান দিয়ে, চন্দননগর ছেড়ে এসে, ২৮এ জুন ১৩নং ইলিশিয়াম রোতে স্বেচ্ছায় ধরা দেন। আরও দু'মাস পর আরও একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। তাতে একপক্ষে ছিলেন গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল ও লোকনাথ বল (ইতিমধ্যে তিনিও জালালাবাদ পাহাড় থেকে নানা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম ক'রে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন) অপরপক্ষে প্রচুর অস্ত্রে সুসজ্জিত এক বিরাট টেগার্ট বাহিনী। অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এক ঝাঁক গুলীতে নিহত জীবন ঘোষালের দেহ পাশের পুকুরে গড়িয়ে পড়ল। আর অবশিষ্টদের ওপর চলল যূথবদ্ধ পুলিশের দুঃসহ নির্যাতন-লীলা। তারপর হুগলী জেল। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন ও-বাড়িরই শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী; অসহ্য নির্যাতনের যন্ত্রণায় ওঁরা সম-অংশীদার। তারপর হুগলী থেকে অনন্ত সিং (ইতিমধ্যে তিনি নিজেই ইলিসিয়াম রো-তে ধরা দিয়েছিলেন), গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, লোকনাথ বল চট্টগ্রাম চালান হয়ে গেলেন।

* লেখকের ছদ্মনাম সত্যানন্দ স্বামী লিখিত 'হে অতীত কথা কও', পৃপৃঃ ২৩৮-২৪০

প্রধান দল (মাস্টারদা) সূর্য সেন-এর মত নিয়ে পাহাড়ের দিকে সরে যাওয়ার পর শহরের অবস্থা দেখবার জন্য তিনি অমরেন্দ্র নন্দীকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পুলিশের নজরে পড়ে যান। আত্মগোপনের জন্য একটা কালভার্টের মধ্যে যান। সেখানেও আবিষ্কৃত হন। ঐ অবস্থায়ই দুই পক্ষে গুলী চলে (২৪ এপ্রিল)। কালভার্ট ভেঙে ফেলে অমরেন্দ্রকে উদ্ধার ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর তিনি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ময়নাতদন্তে অনুমান, অমরেন্দ্র নন্দী আত্মঘাতী গুলীও চালিয়েছিলেন।

৬ই মে ঘটল কালারপোলের সঙ্ঘর্ষ। বিদ্রোহী দলে ছিলেন স্বদেশ রায়, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরি। "পুলিশ যদি কালারপোলের স্থানীয় অধিবাসীদের এক অংশের সাহায্য না পেত তাহলে সেই বিদ্রোহী দলটির নাগাল পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না।......গ্রামবাসীদের কয়েকজন তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করল।......সুবোধ চৌধুরি ও ফণী নন্দী মাঝখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বাকী চারজন আহত হয়ে এক বাঁশঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিলেন।......তিন চার মিনিট ধরে উভয় পক্ষের গুলী বিনিময় চলল। তারপর বাঁশঝোপ থেকে আর কোন গুলীর শব্দ পাওয়া গেলনা।" ডি. আই. জি. গিয়ে দেখতে পেলেন রজত সেন (চট্টগ্রাম) মনোরঞ্জন সেন, (চট্টগ্রাম) স্বদেশ রায় (চট্টগ্রাম) মৃত; আহত দেবপ্রসাদ (চট্টগ্রাম) ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা গেলেন। *

১৯৩২-এর ১লা মার্চ জেলখানায় বেরোলো প্রথম "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার" রায়:

আনন্দপ্রসাদ গুপ্তের কাহিনীতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের তালিকায় ১১জনের নাম: অনন্ত সিং, আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত, গণেশচন্দ্র ঘোষ, ফণীন্দ্রলাল নন্দী, রণধীর দাশগুপ্ত, লালমোহন সেন, লোকনাথ বল, সহায়রাম দাস, সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার, সুবোধকুমার চৌধুরি, সুবোধচন্দ্র রায়। শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত "জাগরণ ও বিস্ফোরণ"এ আছে অতিরিক্ত দ্বাদশ নাম: ফকির সেন। ** আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত এই দ্বাদশ নামটি বাদ দিয়ে নন্দলাল সিং-এর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অনিলবন্ধু দাসের

* চট্টগ্রামের বিদ্রোহের কাহিনী, আঃ গুঃ, পৃপৃঃ ১১২-১১৪। সিভিল সার্জেনের রিপোর্টে আত্মঘাতী ক্ষতচিহ্নের উল্লেখ আছে।

** 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', পৃঃ ৫১৯।

তিন বৎসর বোরস্টাল কারাদণ্ড উল্লেখ করেছেন এবং পরিষ্কার বলেছেন, প্রমাণাভাবে বাকী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হ'ল (ও তৎক্ষণাৎ ডেটিনিউ করা হ'ল)। অথচ শ্রীফকির সেন ডেটিনিউ হন নি, আন্দামানে মেয়াদ খেটেছেন, তবু এই নামটি আনন্দপ্রসাদ গুপ্তের তালিকা থেকে বাদ পড়ল কেন? তিনি আজও জীবিত; কর্পোরেশনে লোকনাথ বলের সঙ্গে একই কালে উচ্চপদে কাজ করেছেন। তিনি আজও সেখানে কাজ করছেন। সম্প্রতি আন্দামান পরিদর্শনকালে যাঁরা গেছলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এ যদি নিছক ভুল হয়ে থাকে, তবে কথা নেই, কিন্তু তাই কি?

অস্ত্রাগার দখলের এ হ'ল প্রথম পর্ব। তার যবনিকপাতের আগে আরও কয়েকটি পর্ব আছে। সেই হিসেবে দ্বিতীয় পর্ব—চাঁদপুরে পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলকে হত্যার চেষ্টা, ভুলক্রমে রেলপুলিশের ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জির হত্যা। ধরা পড়েন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দ গুপ্তের হিসেবে ১৫ মাইল দূরে এক জায়গায়, কালীচরণ ঘোষের হিসেবে ২২ মাইল তফাতে, মেহেরকালী স্টেশনের কাছে। দারুণ অত্যাচারের পর রামকৃষ্ণের ফাঁসী ও কালীপদর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (আনন্দ গুপ্তের মতে সশ্রম কারাদণ্ড) হয়। ১৯৩১-এর ৪ঠা আগস্ট রামকৃষ্ণের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসী হয়; আনন্দ গুপ্ত বলেছেন, তখন রামকৃষ্ণের ১০২ ডিগ্রী জ্বর।

ইতিমধ্যে, আনন্দ গুপ্তের মতে, চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টর, কালীচরণ ঘোষের মতে ডেপুটি সুপার আসানুল্লা বেশ কুখ্যাতি অর্জন করেছেন; একে পুলিশ তায় সুয়োরানীর পো, সুতরাং হিন্দু যুবক হাতের টিপের সহজ লক্ষ্য। পনেরো বছর বয়স্ক হরিপদ ভট্টাচার্যও দণ্ডদাতারূপে হাতের টিপ ঠিক করে প্রস্তুত হলেন। খেলার মাঠে সুযোগও সহজে মিলল। ১৯৩১-এর ৩০-এ আগস্ট আসানুল্লা সাহেবের দল টাউন ক্লাব বনাম কোহিনুর ক্লাবের খেলা। আনন্দ গুপ্ত বলেছেন, ফাইনাল খেলা। তাঁর বর্ণনানুসারে "উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে একই পংক্তিতে চেয়ারে বসে তখনকার সব চাইতে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারী আসানুল্লা খেলা দেখছেন......এমন সময়......," কালীচরণ ঘোষ বলেছেন, "পুলিশ সাহেবের দল বিজয়ী, প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রেলওয়ে কাপ গ্রহণ করছেন......এমন সময়......একটা বুলেটও বৃথা যায়নি। রিভলভার নির্গত সব কটা গুলীই বিদ্ধ হল লক্ষ্যস্থলে। "ঘটনাস্থলের কিছু দূরে হরিপদ ধৃত হ'ল, গ্রেপ্তারের পর এই তরুণ বন্দীর উপর যে নিষ্ঠুর দৈহিক অত্যাচার হয়েছে তার তুলনা কমই মেলে।" (আনন্দ গুপ্ত, পৃঃ ১৬৭) "পালাবার মতলব ছিল

না, সুতরাং গ্রেপ্তার হতে কোন বাধা আসেনি। তারপর কি অকথ্য পীড়ন। মৃত সন্দেহে মার বন্ধ করে তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। (কালীচরণ ঘোষ, পৃঃ ৫৪৪) তারপরই বেঁধে গেল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। সাহেব মারলেই ওদের মাথায় খুন চাপে, তার ওপর স্বধর্মী। "হিন্দু পুরুষ, ১৩ থেকে ৫৫ বয়স্ক, একজনও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। নিজ বাড়ির মধ্যেই আর না হয় টেনে এনে —লাঠি, বেয়নেটের বাঁট প্রভৃতি দিয়ে মেরে অচৈতন্য বা চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়ে গেছে। বাকী সব টেনে হিঁচড়ে থানার নিকটবর্তী স্থানে হাজির করেছে। সারা পথ অবিশ্রান্ত প্রহার চলেছে। থানার ঘরের মধ্যে ফেলে অবিরাম প্রহারের রক্তস্রোত নর্দমা দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়েছে।'' *

"হরিপদর দরিদ্র পিতার সামান্য আবাসস্থলটুকু পর্য্যন্ত ধ্বংস করে তাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত রাখল না।"** এই নারকীয় তাণ্ডবের নাম-ভূমিকায় ছিলেন এডিসানাল পুলিশ সুপার সুটার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেম্প, বাছাই বাছাই দুর্দ্ধর্ষ শ্বেতাঙ্গ ও দেশী পুলিশ কর্মচারী, বিশেষ সম্প্রদায়ের সরকারাশ্রিত দাগী বদমাস ও নরঘাতকেরা। বিচারে হরিপদর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হ'ল (১৯৩১, ২২এ ডিসেম্বর)।

উন্মত্ত বৃটিশ প্রশাসকদের চরেরা ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রামের সর্বত্র ; কোথাও বিপ্লবীদের ভিড়োতে দিচ্ছে না। কাপ্তেন ক্যামারুণ, পটিয়া দারোগা মনোরঞ্জন বসু, একজন এস আই, একজন হাবিলদার, সাতজন সেপাই ধলঘাটের এক বাড়িতে দিল হানা। দোতলা কোঠাবাড়ি, দুটি করে ঘর। বাড়িটা নবীন চক্রবর্তীর, স্ত্রী ও দুই পুত্র কন্যা নিয়ে থাকেন। সিঁড়ি বেয়ে ক্যাপ্টেন উঠে যান ; শেষ ধাপে পা দেবামাত্র গুলী লাগে ; পড়ে যান ; সেপাইরাও পাল্টাগুলী ছোঁড়ে। গোর্খাদের পাহারায় রেখে দারোগা পটিয়া থানায় যান লোক ও অস্ত্রবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। পরদিন এসে পাওয়া যায়, একদিকে ক্যাপ্টেনের এবং অপর দিকে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের নিষ্প্রাণ দেহ। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কোন এক সুযোগে মই লাগিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যান। গৃহবাসীদের চার বছর করে জেল হয়—ফেরার বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য এই যে, যেমনই আক্রান্ত হয়েছে তেমনই আক্রমণ

* জাগরণ ও বিস্ফোরণ, কালীচরণ ঘোষ, পৃঃ ৫৪৪
** চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী, আনন্দ গুপ্ত, পৃঃ ১৬৭

চলেছে; যেমন আক্রমণ চলেছে তেমনই পাল্টা-আক্রমণ চলেছে। বৃটিশ প্রশাসনের জঘন্যতম অভিব্যক্তি ঘটেছে চট্টগ্রাম জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী সূর্য সেনের ফাঁসী বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত,কিন্তু সূর্যালোকিত চট্টগ্রাম প্রতিরোধও করেছে বিস্তর। ইতিহাসের এই এক রহস্য যে, সূর্যাস্তের পর অন্ধকারাচ্ছন্ন আর এক চট্টগ্রাম যেন বিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে একেবারে বেমানান, যার নীট ফল চট্টলবীরেরা নিজবাসভূমে পরবাসী। সেখানকার তুলসীতলায় আজও যদি কেউ প্রদীপ দেয় তো তার আলোক না এপার না ওপার উদ্ভাসিত করে।

অথচ সেদিন বীরই শুধু নয় বীরাঙ্গনারও আবির্ভাব ঘটেছিল। "চট্টগ্রামের উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের অন্যতম প্রমোদশালা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব।" এই ক্লাবটি আক্রমণের পরিকল্পনা সূচনায় পুরুষবেশী কল্পনা দত্ত ধরা পড়ে যান। জামিনের সুযোগে নিরুদ্দেশ হন। কিন্তু পরিকল্পনা পুলিশের অগোচর ছিল। "১৯৩২-এর ২৪এ সেপ্টেম্বর রাত্রে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে আট জন তরুণ কর্মীকে নিয়ে গঠিত এক বিদ্রোহী বাহিনী হঠাৎ পাহাড়তলীর সেই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করল—বিস্ফোরণ ও গুলীর প্রচণ্ড শব্দে পাহাড়তলীর সেই রমণীয় প্রমোদশালা রক্তাক্ত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। উভয়পক্ষ থেকে গুলী চললো।" মিসেস সলিভান হত ও ১১ জন আহত হয়। "প্রীতিলতা গুরুতররূপে আহত হয়ে অসমর্থ দেহে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে (ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে)। তাঁর জীবন্ত দেহ যাতে পুলিশের হাতে পড়ে অপমানিত হতে না পারে সে জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে নিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। * এই ক্লাব আক্রমণ এমনই সুনিপুণ হয়েছিল যে, পুলিশের পক্ষে কোন মামলা করা সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রামে সূর্যাস্তের আর সামান্যই বাকী। ১৯৩৩-এর ২৫এ মে আনোয়ারা থানা অন্তর্গত গোহিরা গ্রামে ধরা পড়ে গেলেন তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত। গ্রামটি পুলিশ মিলিটারিতে ঘিরে ফেলেছিল। পূর্ণচন্দ্র তালুকদারের বাড়ি ছিলেন ওঁরা দু'জন ছাড়াও স্বয়ং পূর্ণচন্দ্র, মনোরঞ্জন দাস ও সুধীন্দ্র দাস। পূর্ণচন্দ্র ও মনোরঞ্জন পুলিশের গুলীতে মারা গেলেন। সুধীন্দ্র আপাতত পালাতে পারলেন ; পরে ধরা পড়েছিলেন। কল্পনা ও তারকেশ্বরের মামলা হয়েছিল মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে। বিজয়া ও বিরহ একই সঙ্গে। এই দুই নামেই দুটি প্রবন্ধ পাওয়া গেছল মাস্টারদার কাছে। "বিজয়ায়" তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ থেকে শুরু করে সকল ঘটনার এবং তারই ফলে সাধারণের দুর্ভোগের সকল দায়িত্বের স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ

* চট্টগ্রামের বিদ্রোহের কাহিনী, আনন্দ গুপ্ত, পৃঃ ১৭২

করেছেন। সচরাচর যা হয়। কোন স্বদেশবাসী বিশ্বাসঘাতকই দেখিয়ে দিয়েছে মাস্টারদার শেষ আশ্রয়। এক গোর্খা রাইফেলস গৈরালা গ্রামের নিরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ি ঘিরে ফেলে। ১৯৩৩-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকেই। এক সময় বাড়ির ভেতর থেকে ওদের ওপর পড়ল টর্চের আলো ও গুলী। মিলিটারির পাল্টাগুলী। দু'জন গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরোন। একজন রক্তের রেখা রেখে পালাতে সমর্থ হন কিন্তু মাস্টারদা বাড়ির বেড়া টপকে একেবারে এক হাবিলদারের সামনে। *

১৯৩৩-এর ২৩ এ মে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত মহকুমা হাকিম এস এন রায়ের আদালতে পটিয়ার সাব-ইন্সপেক্টর শৈলেন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের বিবরণটা এইরকম ঃ ১৯৩৩-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি থানার বড় দারোগা হুকুম দিলেন গৈরালায় যেতে ; কেননা, খবর পাওয়া গেছে, সেখানে হরিনারায়ণ বিশ্বাসের বাড়িতে সূর্য সেন ও কল্পনা দত্ত পালিয়ে আছেন ; তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সাব-ইন্সপেক্টার পটিয়ার কম্যাণ্ডারকে তক্ষুণি খবর দেন। তাঁরা ৩০।৪০ জন সশস্ত্র গোর্খা নিয়ে রাত ৮-১০এ রওনা দিয়ে দশটায় পৌঁছোন। সাব-ইন্সপেক্টর কম্যাণ্ডারকে হরিনারায়ণের বাড়িটা দেখিয়ে দিলে,কম্যাণ্ডার বাড়িটা ঘিরে ফেলেন। হরিনারায়ণের লাগোয়া বাড়ি ক্ষীরোদাপ্রভা বিশ্বাসের। বলতে গেলে একই উঠোনে। ক্ষীরোদার বাড়ি আর সদর রাস্তার মাঝখানে ঘন জঙ্গল, রাস্তা থেকে বাড়ির লোকদের দেখা যায় না। সাধারণ পুলিশ বাড়ির সামনের রাস্তায় থাকে। রাত্রি ১১টা নাগাদ মিলিটারি গুলী চালায় এবং মিনিট ১৫।২০ পর একজন সেপাই ছুটতে ছুটতে ক্যাপটেনের কাছে আসে ও বলে বাড়ি থেকে গুলী চালাচ্ছে। সে ক্যাপটেনের কাছে আলোবোমা চায়। ক্যাপটেন সেপাইর সঙ্গে যান এবং রাত দুটোয় ফিরে আসেন ; তিনি জানান দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা সবাই ক্যাপটেনের সঙ্গে গিয়ে দেখেন, দুজনকে হাত-পা বেঁধে খড়ের গাদার কাছে ফেলে রাখা হয়েছে ; এ-এস-আই জি এন দত্ত এঁদের একজন সূর্য সেন আর একজনকে ব্রজেন্দ্র বলে সনাক্ত করেন। সূর্য সেনকে ধরেছিল মনবাহাদুর ক্ষেত্রী ; সে তার সাক্ষ্যে বলে, সূর্য সেনের কাছে পাওয়া যায়, গুলীভরতি একটা ছ'ঘরা পিস্তল, একটা থলেতে রাখা অতিরিক্ত তাজা গুলী ছয়। দেহ তল্লাসীতে চব্বিশটা জিনিস পাওয়া যায় একটা কাপড়ের বাণ্ডিলে ; কিছু লাল বিপ্লবী ইস্তাহার প্রীতিলতার ছবিসহ, পকেট ঘড়ি, লয়েন ক্লথ,

* জাগরণ ও বিস্ফোরণ, কালীচরণ ঘোষ, পৃঃ ৬০০

কিছু বিল, কিছু খাতা, "ইতি ফুলাটি" লেখা "দাদা"র নামে চিঠি, আর একখান চিঠি—যার শুরু "জীবন গেছে নিভে", আর একখানি—"আমার আত্মা শান্তি পাবে না" ইত্যাদি।

১৪ই জুনের কলকাতা গেজেটে ট্রাইবিউনালের নাম ছিল মিঃ ডবলিউ ম্যাক সার্পে আই-সি-এস,জেলা ও দায়রা জজ বাখরগঞ্জ ; রজনীকান্ত ঘোষ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, শ্রীহট্ট, কাছাড় ; চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের এস-ডি-ও এ এফ এম মহ্‌সীন আলি ; শেষোক্ত,অসুস্থ হয়ে পদত্যাগ করায় মৌলবী খন্দকার আলি তায়েব এ-এফ-এম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বিচার আরম্ভ হয় এস্তাকালি পাহাড়ের চূড়ায় কালেক্টরেট ভবনে, জেলের কাছেই। সূর্য সেনের পক্ষে দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার জে ঘোষাল। অভিযোগের ধারাগুলো ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ক, ৩০৭, ৩০২, ১০৯।

মনবাহাদুর ক্ষেত্রী তার সাক্ষ্যে বলে, উত্তর বেষ্টনীর ভার ছিল তার ওপর ; সেখানে সে একটা বড় গাছের আড়াল নিয়েছিল। সে দুদিক থেকে গুলীর আওয়াজ শোনে—গুলী পাল্টাগুলী। এমন সময় একটা খচ্‌খচ্‌ শব্দ শুনে সে সেদিকে যায় এবং একটি লোককে ধরে ফেলে। ধৃত লোকটির কোমর-বন্ধীতে ছিল একটি রিভলভার ও ১২টি কার্তুজ। লোকটির গায়ে গেঞ্জি ও সার্ট, হাতে একটা কাগজপত্রের পুঁটুলি। ক্যাপ্টেন এলেন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এবং টর্চের আলোয় চিনলেন লোকটি আর কেউ নন—সূর্য সেন। * ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে দেড় শতাধিক লোকের সাক্ষ্য হ'য়ে গেল ফরিয়াদী পক্ষে। তারপর অভিযোগের উত্তরে কি বলবার আছে জিজ্ঞাসা করলে ট্রাইবিউনাল বন্দীরা প্রত্যেকেই বলেন বললেন, নিরপরাধ। সূর্য সেন তাঁর বয়স বললেন ৩৯, পেশা বললেন, কংগ্রেস কর্মী। বললেন, আর যা বলবার বলবেন তাঁর কৌসুলি।

স্পেশাল ট্রাইবিউনালের রায় বেরোলো ১৪ই আগস্ট (১৯৩৩) দুপুর বারোটায়। নিদারুণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল ; খচ্চরের পিঠে মেসিনগান চাপিয়ে বহু গোর্খা প্রধান প্রধান রাস্তায় টহল দিয়ে ফেরে সকাল বেলা থেকে। ১৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী টাইপ করা রায় ; সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের হ'ল মৃত্যুদণ্ড সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার অপরাধে। বলা হ'ল, হাইকোর্টে আপীল যদি করতে চান তো সাতদিনের মধ্যে। কল্পনা দত্তের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। **

* অমৃত বাজার পত্রিকা, ৬ই জুলাই, ১৯৩৩।

** ঐ ঐ ১৫ই আগস্ট ১৯৩৩।

দু'টো আপীল হ'ল ; একটি সূর্য সেনের, একটি তারকেশ্বর দস্তিদারের। কল্পনা দত্তের তরফেও আর একটি আপীল হ'ল। আপীলের অন্যতম যুক্তি ছিল, কতকগুলো অগ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য গ্রহণ ক'রে বিচারকার্য ঘুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অভিযোগ-বর্ণিত অপরাধের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সাক্ষ্য নেই। দণ্ডও অযথা অতিকঠোর হয়েছে। *

স্থির হ'ল, ১লা নবেম্বর স্পেশ্যাল বেঞ্চ আপীল শুনবেন।

*অমৃত বাজার পত্রিকা, ২২এ আগস্ট, ১৯৩৩

"আরো, আরো, প্রভু, আরো আরো

আবার গোয়েন্দার ডায়েরীটা খুলি: "বরিশাল সম্মেলনের ব্যর্থতার পর প্রত্যেকটি ছোট দল আপন আপন শক্তি সামর্থ্যে সংগঠিত হতে লেগে যায়। বিপিন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র প্রমুখের নেতৃত্বে কলকাতার যুগান্তর দল; বরিশালের শঙ্কর মঠ মনোরঞ্জন গুপ্ত ও অরুণ গুহের নেতৃত্বে, তরুণ সঙ্ঘ শচীন সেনের নেতৃত্বে; মাদারিপুর যুগান্তর পূর্ণ দাস, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখের নেতৃত্বে; পূর্ণ দাস এক শান্তি সেনাও সংগঠিত করেন; মুন্সীগঞ্জ যুগান্তর জীবনলাল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে; কুমিল্লা যুগান্তর ললিত বর্মণ প্রমুখের নেতৃত্বে; চট্টগ্রাম সূর্য সেনের নেতৃত্বে; (সে কাহিনী বলেছি) ময়মনসিংহ সুরেন ঘোষের নেতৃত্বে; যশোর-খুলনা ভূপেন দত্ত, রসিক দাসের নেতৃত্বে। হুগলী যুগান্তর অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষের নেতৃত্বে। কলকাতা যুগান্তরের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু মিলে গেছলেন।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর সকল ছোট বড় দলের মধ্যেই একটা কিছু করার চাঞ্চল্য দেখা দেয়—এক অনুশীলন সমিতি ছাড়া, যার ফলে এই দলের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ধূমায়িত হতে থাকে; মেছুয়াবাজার বা কলাবাগান বস্তির প্রস্তুতি পর্বেই 'ষড়যন্ত্র মামলার' কথা বলেছি। বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারির ফলে অনুশীলন যুগান্তরে ঝেঁটিয়ে গ্রেপ্তারের পর মনোরঞ্জন গুপ্ত মাদ্রাজ কলকাতায় এসে সরস্বতী ও শঙ্কর মঠ দলের ভার নেন ও ঘোষণা করেন, যুগান্তর ভায়োলেন্স বা বলপ্রয়োগের পথ নেবে। ফলে শঙ্কর মঠের যাঁরা বিগড়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা ফিরে আসেন। ঢাকার সুরপতি চক্রবর্তী অগ্রসর দলের অসম্পূর্ণ কাজের সূত্র ধরে এসে মেলেন কলকাতার ডাঃ নারায়ণ রায়, অদ্বৈত দত্ত প্রমুখের সঙ্গে। তাঁরা কলকাতায় বোমা তৈরি ক'রে খুলনা, বরিশাল, মুন্সীগঞ্জ, মাদারিপুর, রংপুর, পাবনা, রাজসাহী পাঠাতে থাকেন। এঁদের প্রথম তৎপরতা প্রকাশ পায় ড্যালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টায়।

১৯৩০-এর ২৫এ আগস্ট বেলা এগারোটায় স্কোয়ারের পূব-দক্ষিণ কোণে টেগার্টের মোটর গাড়ির বামে ও দক্ষিণে দুটো বোমা ফাটল। গাড়ির গতি স্তব্ধ হ'ল বটে,

খুলনা-সেনহাটির বিপ্লবী অনুজাচরণ সেন গুপ্ত ছুটে গেলেন ড্যালহৌসি ইন্সটিটিউট অবধি, তার পরই রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন কলেবর, মৃত্যুর-স্পর্শে গাড়ির গতির মতই স্তব্ধ হয়ে গেল অনুজার নাড়ী। নিষ্ফল চেষ্টা, নিষ্ফল গ্রেপ্তার, পুলিশ কুড়োলো দুটো বোমা একটা রিভলভার। আর এক দিকে, ২৪ পরগণা বসিরহাটের, ল-কলেজের ছাত্র দীনেশচন্দ্র মজুমদার পলায়নপর জনতার ভিড়ে মিশে ছুটছেন, পেছনে ছুটছে এক কনস্টেবলও, ট্যাক্সিতে উঠে তাকে নিরস্ত করলেও নামতে হ'ল ট্যাক্সি থেকে, আবার ছুট, কিন্তু গবর্মেন্ট প্লেসে ধরা পড়ে গেল দু'জন কনস্টেবলের হাতে ; পুলিশ কুড়োল একটা কার্তুজভরা রিভলভার, একটা বোমা, সিগারেট বাক্স, কয়েকটা টাকা। টেগার্ট অক্ষত কিন্তু সন্ত্রস্ত এবং বিদায় নিলেন চাকুরী জীবন থেকে। *

আর দীনেশ? বাঙলার আদর্শ বিপ্লবীর অন্যতম দীনেশচন্দ্র মজুমদার? এবারের মত বিচার হ'ল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (১৮ই সেপ্টেম্বর) মেদিনীপুর জেল থেকে পালালেন ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের ৭।৮ই মাঝরাতে। আশ্রয় নিয়েছিলেন এসে চন্দননগরে ১৯৩৩এ। কিন্তু সেখানেও মানুষের গন্ধ পেয়েছে রাক্ষসেরা। পুলিস কমিশনার কুঁই এসে হাজির। বিপ্লবীদের একজন হোঁচট খেয়ে ধরা পড়ে যান। দুজন প্রাণপণে দৌড়তে থাকেন, দু'জনের একজন দীনেশ। এক যুবক বাধা দিতে এলে সে গুলীতে ধরাশায়ী হয়। এদিকে কুঁই এসে পড়েছেন। ওঁদের পার হ'য়ে দাঁড়ালেন পরিচয় নেবার জন্য। গুলী ছুটল, কুঁই মাটি নিলেন। দীনেশ এলেন কলকাতায়। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। আবার মানুষের গন্ধ: ২২এ মে একসঙ্গে খানকয়েক বাড়ি ঘেরাও। দুপক্ষেই চলল গুলী। বিপ্লবীদের একজন পাশের বাড়ি দিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন। ভোরের দিকে যুদ্ধ বিরতির সঙ্কেত বিপ্লবীদের দিক থেকে। দীনেশচন্দ্র মজুমদার অন্যতম। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ছাপিয়ে দীনেশের ফাঁসী হয় ১৯৩৪-এর ১৫ই জানুয়ারি। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। **

গোয়েন্দার ডায়েরীতে আছে, "ড্যালহৌসি স্কোয়ার বোমা বিস্ফোরণসূত্রে ১০ই সেপ্টেম্বর মদন চ্যাটার্জি লেনে সুরেন্দ্র দত্তর বাড়িতে পাওয়া যায় বোমার খোল। তাই নিয়ে ড্যালহৌসি বোমা ষড়যন্ত্র—নারায়ণ রায়, সুরেন্দ্র দত্ত ও আটজন হলেন বন্দী, গোবিন্দ রায় পলাতক।

ষড়যন্ত্র মামলা হ'ল স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে; শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে দণ্ড

* 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', পৃপৃঃ ৫২০-২১

** 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ', পৃপৃঃ ৬০৪-৬

দাঁড়ালো : নারায়ণচন্দ্র রায় ও ভূপালচন্দ্র বসু—১৫ বছর দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত—১২ বছর দ্বীপান্তর, রোহিণীকান্ত অধিকারী (বিমল চন্দ্র রায়)—পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। *

গোয়েন্দার ডায়েরীতে আছে : "এই সময় বাগবাজার দলের গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জি ছিলেন বাঙলাদেশে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মির (এইচ, এস, আর, এ) নেতা ; এর শাখা ছিল বর্ধমানে ফকির রায়, বিনয় রায় চৌধুরির নেতৃত্বে, বীরভূমে রজত দত্তের নেতৃত্বে। জলপাইগুড়িতেও ছিল। এই থেকেই "বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার" উৎপত্তি।

সুবলপুর ডাকাতি সূত্রে প্রথমে জনা তিনেকের কারাদণ্ড হলে পুলিশ আরও অনেক ডাকাতি ও মালমশলা সংগ্রহের এক বড় ফিরিস্তি যোগে ৪২ জনকে ধরে ; শেষ পর্যন্ত ২১ জনের নামে ঐ ষড়যন্ত্র মামলা দাঁড় করায় ; নিত্যগোপাল ভৌমিক নামে একজন রাজসাক্ষীর উদ্ভব হওয়ায় ঠাঁটটা পূর্ণ রূপ পায়। ১৯৩৪-এর ২৪এ সেপ্টেম্বর স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট যে রায় দেন হাইকোর্টে তাই বহাল থাকে। দণ্ড—রজতভূষণ দত্ত ও প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়—১২ বছর দ্বীপান্তর ; সমাধীশ রায় দশ, প্রভাতকুসুম সাত ; সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হারাণচন্দ্র খাঁড়ার, ধরণীধর রায়, উমাশঙ্কর কোঙার, বিজয় ঘোষ—ছ'বছর ; বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি, নৃত্যগোপাল ভৌমিক, কালীপ্রসন্ন চৌধুরি, বনবিহারী রায়, সত্যগোপাল চন্দ্র, হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল রায়, প্রদ্যোৎ কুমার চৌধুরি, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় —সাড়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ** "অবিস্মরণীয়"র বিবরণ কিছু পৃথক। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট নয়, তিনজন বিচারপতি—সর্বশ্রী কে সি চন্দ্র, বি কে গুহ, এস বি ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত ট্রাইবুনাল। ৪২ জনের মধ্যে ২১ জনের নামে অন্তরীণাদেশ হ'ল ; মামলার ২১ জনের তিনজন প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেন ; রাজসাক্ষী হওয়ায় নিত্যগোপাল ভৌমিকও মুক্তি পেল। 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'-এ যার কারাদণ্ড দেখানো হয়েছে তাঁর নাম নৃত্য (নিত্য নয়) গোপাল ভৌমিক। এখানে আছে মোট ১৮ জনের দণ্ডের কথা নৃত্যগোপালকে নিয়ে, ক'জন বেকসুর ছাড়া পেয়েছেন তা নেই। 'অবিস্মরণীয়'-তে আছে ১৭ জনের দণ্ডের কথা। বলা হয়েছে, প্রাণগোপাল, রজত, প্রভাতকুসুম, সমাধীশ, ধরণীধর, হারান খাঁড়ার'

* জাগরণ ও বিস্ফোরণ, পৃঃ ৫২২

** জাগরণ ও বিস্ফোরণ, পৃঃ ৫৯৯

উমাশঙ্কর কোঙার, বিজয় ঘোষ, প্রদ্যোৎ রায় চৌধুরি, হরিপদ ব্যানার্জি, কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরিকে পাঠানো হয় আন্দামান সেলুলার জেলে (কত বছর মেয়াদে তার উল্লেখ নেই) ; সত্যেন্দ্র গুপ্ত, বিনয়কুমার চৌধুরি, জয়গোপাল রায়, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, বনবিহারী রায় ও সত্যগোপাল চন্দ্রকে রাখা হ'ল বাঙলার বিভিন্ন জেলে (মেয়াদের উল্লেখ নেই)। * রাজসাক্ষীর দণ্ড হয় না এমন নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মুক্তি পায়। রাজসাক্ষী নিত্যগোপাল যদি নৃত্যগোপাল হয় তবে 'জাগরণ ও বিস্ফোরণে'র মতে তার হয়েছে দণ্ড (সাড়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড), 'অবিস্মরণীয়'-এর মতে সে পেয়েছে মুক্তি। তাই একের দণ্ডিতের সংখ্যা ১৮,অপরের ১৭ ; রাজসাক্ষীসহ চারজনের মুক্তি ধরলে মোট ২১ জনই দাঁড়ায়।

গোয়েন্দার ডায়েরী-মতে, ঐ যে দশটা ছোট ছোট দল স্বকীয় শক্তি ও সামর্থ্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে ললিত বর্মণ প্রমুখ চালিত কুমিল্লা যুগান্তরের কল্যাণ সঙ্ঘ কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সের হত্যা সম্পন্ন করেছিল এবং আততায়ী ছিলেন শান্তি ও সুনীতি নামে দুটি মেয়ে।

"কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর সি জি বি স্টিভেন্স (Stevens) বেলা ১০টা নাগাদ নিজের কোয়ার্টারে বসে কাজ করছেন ; সামনে রয়েছেন এস. ডি. ও। তারিখটা হচ্ছে ১৯৩১ ডিসেম্বর ১৪ই। 'ইলা সেন' ও 'মীরা দেবী' নাম-লেখা একখানি কার্ড" বেয়ারা এনে রাখল তাঁর কাছে। স্টিভেন্স ও এস. ডি.ও দরজার কাছে এগিয়ে এলে একখানা স্মারকলিপি। নিবেদন—ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুলের সন্তরণ প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করতে আজ্ঞা হয় ; মেয়ে দুটি ঐ স্কুলের অষ্টম মানের ছাত্রী। স্মারকলিপিতে স্টিভেন্স প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মন্তব্য জানতে চাইলেন। কাগজটা একটি মেয়ে ফেরত নিচ্ছে আর একটি মেয়ে খুব কাছে থেকে স্টিভেন্সকে গুলী করল। স্টিভেন্সের ওতেই জীবনাবসান ঘটল। অতি সহজেই ধৃত শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরির হাতে দুটি রিভলভার। ১৯৩২-এর ২৭এ জানুয়ারি কলকাতা হাই-কোর্টে'র দায়রায়। বয়সের বিচারে ও স্ত্রীলোক বলে ওঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। **

আমার মনে পড়ে, বন্দীপক্ষের কৌঁসুলি শান্তি-সুনীতির গ্রেপ্তারের সময় অশালীনতার অভিযোগ করলে সরকারপক্ষের কৌঁসুলি দুঃসাহসভরে বলেছিলেন, তাদের যে সঙ্গে সঙ্গে লিঞ্চ করা হয়নি এজন্য তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

---

* অবিস্মরণীয়, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬

** জাগরণ ও বিস্ফোরণ, পৃঃ ৫৪৭—৪৮

গোয়েন্দার ডায়েরীতে আছে : সেই ১৯২১-এ ঢাকায় একটি জনসেবক প্রতিষ্ঠান ছিল। হেম ঘোষ ছিলেন মুন্সীগঞ্জ যুগান্তরের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি এই সংস্থার মধ্যে আনেন সুস্পষ্ট এক বৈপ্লবিক প্রকৃতি। নাম হয় শ্রী সঙ্ঘ। অনিল রায়, বারীন রায়, কমল ঘোষ, রসময় সুর ও অনেকে এতে যোগ দেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গিরিশ নাগের মেয়ে লীলা নাগ ছিলেন অনিল রায়ের সহপাঠী। অনিল রায় তাঁকেও দলে ভেড়ান ও লীলা নাগের সাহায্যে মেয়েদের একটা সংস্থা গড়ে তোলেন ; নাম হয় দীপালি সংঙ্ঘ। হেম ঘোষ নেতা হিসেবে লীলা নাগ ও তাঁর নারী সংগঠন আয়ত্তে আনতে চান ; এতে অনিল রায় ও লীলা নাগ বিরক্ত হন। হেম ঘোষ তখন সদলে শ্রীসঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে বি, ভি, গ্রুপ গঠন করেন। তাতে যোগ দেন সত্য গুপ্ত, সত্য বক্সী, তেজোময় ঘোষ, রসময় সুর, রেবতী বর্মণ, ভূপেন রক্ষিত রায় এবং একটি স্বেচ্ছাবাহিনীও গড়ে ওঠে। ভূপেন রক্ষিত রায় কলকাতায় 'বেণু' নামে একটি মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন। এই সংস্থাটি অতি দ্রুত এক শক্তিশালী 'সন্ত্রাসবাদী' সংস্থায় পরিণত হয় এবং বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনার নায়করূপে দেখা যায়। সত্য গুপ্ত ছিলেন মেদিনীপুর জেলে আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী, মুক্তি পেলে দীনেশ গুপ্ত, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, বিমল দাশগুপ্ত প্রমুখের সহযোগে একটি দল গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এই মেদিনীপুর শাখারই কাজ —পেডী, ডগলাস, বার্জ হত্যা। ঢাকার শাখাটির তৎপরতা প্রকাশ পায়—মিঃ লোম্যানের হত্যায় ও মিঃ হডসনের প্রাণনাশ চেষ্টায়, কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে করিডর যুদ্ধে, নারায়ণগড় তার কাটা ও অনেক কটি ডাকাতিতে। এঁদের শেষ অভিব্যক্তি লেবং মাঠে 'হিজ একসেলেন্সি' স্যার জন এণ্ডার্সনের প্রাণনাশের চেষ্টা।

শ্রীসঙ্ঘ, দীপালি সঙ্ঘ, বি. ভি. গ্রুপ সম্পর্কে এই যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাতে কিছু তারতম্য দেখা যায়। এক জায়গায় আছে : শ্রীসঙ্ঘ হচ্ছে বাঙলার যুগান্তর পার্টির অন্যতম শাখা ; এর লক্ষ্য ছিল (১) দলসদস্যদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া ও দলের নেতৃবৃন্দের আদেশে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন এমন দুঃসাহসী যুবকদের দলে আনা ; (২) কিনে বা চুরি করে অস্ত্র সংগ্রহ ; (৩) দেশের স্বাধীনতার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করা। প্রথমে নেতা ছিলেন হেম ঘোষ, পরে অনিল রায়। আর এক জায়গায় আছে : ১৯২০-২১ এ অনিল রায় বক্সীবাজারে তাঁদের নতুন বাড়িতে উঠে এলেন। সোস্যাল ওয়েলফেয়ার লীগ এদ্দিন ছিল ধর্মপ্রতিষ্ঠান, এবার হ'ল এক মিশ্রিত প্রতিষ্ঠান ; মানবসেবা সমাজসেবা, এবং সমাজজড়িত রাজনীতি চর্চারও প্রতিষ্ঠান। ব্যায়ামাগার, পাঠগৃহ, নৈশ বিদ্যালয়, খেলাধুলার ক্লাব ছিল। আলাদা

কোন সেচ্ছাসেবকবাহিনী ছিল না, সবাই সেচ্ছাসেবক। প্রথম যখন অনিল রায় নেতৃত্বভার নেন তখন দলে অন্যান্য প্রথম সারির নেতা ছিলেনঃ সত্যভূষণ গুপ্ত, ভূপেন্দ্র রক্ষিত রায়, ভবেশ নন্দী, মণীন্দ্রকৃষ্ণ রায়, প্রতাপ গুহ মুস্তফী, বারীন্দ্র রায়, শচীশ সরকার, নেপাল নাগ, বঙ্কেশ্বর রায়, বীরেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। ১৯২৬এ ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লীগের নাম হল শ্রীসঙ্ঘ, নেতৃত্ব নিলেন অনিল রায়, আরও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করা হ'ল, সেচ্ছাসেবকদের কাজ হ'ল নিয়মিত এবং মুসলমান গুণ্ডাদের হাত থেকে গৃহ ও সম্মান রক্ষার উপযোগী করে তোলা হতে লাগল হিন্দু যুবকদের। বক্সীবাজারে অনিল রায়, তাঁতিবাজারে বারীন্দ্র রায়, কায়েতটুলিতে ভবেশ নন্দী, গেণ্ডারিয়ায় শচীশ সরকার, ওয়ারি ঠাটারি বাজারে বীরেন ঘোষ। দীপালি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে (১৯২৬), কুমারী লীলা নাগের নেতৃত্বে ; ১৯২৮-এ হ'ল শ্রীসঙ্ঘেরই শাখা। 'বেণু' পত্রিকার কল্পনাও আসে এসময় রেবতী বর্মণ প্রমুখের মাথায়। ১৯২৭ নাগাদ ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় কলকাতা আসেন, 'বেণু'র ভার নেন এবং ৯৩/১ এফ বৈঠকখানা রোডে অফিস বসান। পুরোমাত্রায় শ্রীসঙ্ঘের কাগজ হয়ে দাঁড়ালে রেবতী বর্মণ প্রমুখ বেণু গোষ্ঠিকে ছেড়ে যান। ১৯৩০-এ কাগজটা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসের সময় বিরাটএক স্বেচ্ছাবাহিনী গঠিত হয়। নাম হয়েছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স—মেজর সত্য গুপ্তের পরিচালনাধীন। ঢাকা ও কলকাতা শ্রীসঙ্ঘের অনেকে এতে যোগ দেন। কলকাতায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সফল হয়নি। বছরখানেক বিপন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখে বিলীন হ'য়ে যায়।

ঢাকায় কিন্তু তেজোময় ঘোষ ও জ্যোতিষ জোয়ারদারের পরিচর্যায় বিকশিত হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে সত্য গুপ্ত ও প্রতুল ভট্টাচার্য আনাগোনা করতেন।

১৯২৯-এর মাঝামাঝি দল হ'ল দ্বিধাভক্ত। কোন কোন দৈনিক কাগজে ভূপেন্দ্র রক্ষিত,সত্য গুপ্ত,প্রভাত নাগ ও আরও দুজনের স্বাক্ষরে এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি বেরোল যে, তাঁরা শ্রীসঙ্ঘ ও দীপালির সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন। গোলমালটা মূলত অনিল রায় ও ভূপেন রক্ষিত-সত্য গুপ্তের মধ্যে। অর্থাৎ 'বেণু'গোষ্ঠি অনিল রায় থেকে আলাদা হয়ে গেল। এই 'বেণু' গোষ্ঠি হেম ঘোষের মাধ্যমে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের যুগান্তর দলে ভিড়ল। সত্য গুপ্ত অবশ্য ভবানীপুরের এন-ভি-পি'র বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরির সঙ্গেও মিলেছিলেন। গোয়েন্দা মন্তব্য করেছে, নিছক ব্যক্তিগত ঝগড়া, নীতির বালাই সত্যি নয়, নইলে কি ঢাকায় এত সঙ্ঘর্ষ এত মাথা ফাটাফাটি অঙ্গহানি

হয়? শেষ পর্যন্ত পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অবৈধ সম্পর্কের খেউড়ও তুলেছিল। রেপরোয়া চলেছিল জঘন্য কুৎসা। তবে ঢাকায় অনিল রায়ের দলেই থাকলেন বেশির ভাগ সদস্য। রেবতী বর্মণও অনেক দিন ন যযৌ ন তস্থৌ করে সঙ্গীসাথী নিয়ে অনিল রায়ের দলে যোগ দিলেন। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ললিত বর্মণ ও মুন্সিগঞ্জে জীবনলাল চ্যাটার্জির সঙ্গেও অনিল রায়ের সংযোগ ছিল।

দলাদলি-শেষে শ্রীসঙ্ঘে অনিল রায়ের সঙ্গে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁরা হলেন: বারীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র সাহা পোদ্দার, বীরেন্দ্র ঘোষ, সনৎ দাস, অনিল দাস, অনিল ঘোষ, সুধীর নাগ, সুখেন্দুভূষণ দত্ত (জীবন) ও ক্ষিতীশ রায়। ১৯৩০-এর সংশোধিত ফৌজদারি আইনে ঢাকা শ্রীসঙ্ঘের ৫৮ এবং কলকাতা শ্রীসঙ্ঘের ৪৪ জন বন্দী হন।

দীপালী সঙ্ঘের কথা না বললে শ্রীসঙ্ঘের কথা শেষ হয় না। গোড়া থেকেই এর কাজ ছিল, স্বামী বা ভাইদের দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করা এবং আগ্নেয়াস্ত্র, গুলী ও পলাতক বিপ্লবীকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা ও গোপন চিঠিপত্র লেনদেন করা। কলকাতায় শকুন্তলা দেবী, রেণু সেন, ডাঃ অবনী দাশগুপ্তর এক আত্মীয়া ও বিভাবতী সেনকে নিয়ে এর আরম্ভ। রাজবন্দী হয়েছিলেন: কুমারী লীলাবতী নাগ, রেণুকা সেনগুপ্ত, সুরমা দাস (হাসি), অশ্রুকণা সেনগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত, সুশীলা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী হেলেনা বল, লাবণ্য দাশগুপ্ত।

শ্রীসঙ্ঘ ছেড়ে হেম ঘোষ, সত্য গুপ্তের সঙ্গে যাঁরা যোগ দিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন: জ্যোতিষ জোয়ারদার, ভবেশ নন্দী, তেজোময় ঘোষ, দীনেশ গুপ্ত, বিনয় বসু, রসময় সুর, সুরপতি রায় চৌধুরি, কামাখ্যা রায়, প্রভাত নাগ, দেবেন্দ্র ভৌমিক (ভুক্কু), রামপদ মিত্র, ভূপেন সরকার, তরণী রুদ্র, ফণীভূষণ চক্রবর্তী, হরিদাস সেন, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, সুপতি ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, সুরেন্দ্র দত্ত, হারাণ দত্ত, জিতেন্দ্র সেন, রবীন্দ্র সেন (মণি), অনুকূল দাস। কর্মকেন্দ্র ছিল ঢাকা শহরের ওয়াড়ি, টিকাটুলি, জিন্দাবাহার লেন, সদর মহকুমার জয়দেবপুর, সুভড্যা, দেওভোগ (নারায়ণগঞ্জ), মুন্সীগঞ্জ মহকুমার হাসাইল, হাসাড়া, বারসৈ, কলকাতা, মেদিনীপুর।

বি. ভি. গ্রুপের দীনেশ গুপ্ত ১৯২৮এ মেদিনীপুর এসে কলেজে ভর্তি হন এবং এখানে একটি গোপন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে যোগ দেন: পরিমল রায়, ফণীভূষণ কুণ্ডু, প্রফুল্ল ত্রিপাঠি, অমর চ্যাটার্জি, নবেন দাস, নির্মল অধিকারী, ফণী দাস, বিমল দাশগুপ্ত, সন্তোষ বেরা, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, অশোক দাস, কামাখ্যা ঘোষ, ক্ষিতিপ্রসন্ন সেন প্রমুখ। ১৯২৯এ দীনেশ গুপ্ত চলে যান কিন্তু

মাঝে মাঝে আনাগোনা করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবী দলের ভার থাকত প্রফুল্ল ত্রিপাঠির ওপর, সংগঠনের ভার পরিমল ও ফণীর ওপর। দীনেশ গুপ্তই এঁদের অনুপ্রাণিত করেন। দীনেশ গুপ্তর বি, ভি, গ্রুপ, শচীন মাইতির যুগান্তর ও ক্ষীরোদ দত্তর অনুশীলন গ্রুপ একই স্বার্থে সম্মিলিত হয় এবং আইন অমান্যকালে কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের প্রতিশোধ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। পেডী হত্যার পেছনে ছিলেন রসময় সেন ও সুপতি চৌধুরি এবং কাজ হাসিল করেন বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ। ডগলাস হত্যায় প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু শেখর পাল প্রত্যক্ষভাবে এলেও অনুশীলন, যুগান্তর গ্রুপও পেছনে ছিল। বার্জ হত্যাকালে আহত ও মৃত অনাথ পাঁজা ও মৃগেন্দ্র দত্ত ছিলেন বি. ভি. গ্রুপের। অর্থাৎ দীনেশ গুপ্তর ফাঁসীর পরও মেদিনীপুর দলে বি, ভি'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। ফণী কুণ্ডুর ভাই শৈলেন কুণ্ডু ছিলেন যোগসূত্র এবং সুপতি চৌধুরির হাত দিয়েই কলকাতা থেকে এসব কাজের রিভলভার পাচার হয়েছিল। এই বি. ভি. গ্রুপের কর্মকীর্তির মধ্যে আরও যা রয়েছে তা হ'ল লোম্যান হত্যা ও হডসনকে জখম করা, রাইটার্স'বিল্ডিংসে সিম্পসন হত্যা ও বিনয়, বাদলের আত্মবিসর্জন ও দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর মঞ্চারোহণ, ই, ভিলিয়াস'কে হত্যার চেষ্টা, দার্জিলিংয়ে গবর্ণর স্যার জন এন্ডাস'নকে হত্যার চেষ্টা ইত্যাদি। *

খবর পাওয়া গেল, ১৯৩০-এর ২৯এ আগস্ট, বাঙলার ইন্টেলিজ্যান্স ব্র্যাঞ্চের ইন্সপেক্টার জেনারেল লোম্যান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে সকাল ন'টায় আসছেন অসুস্থ জল-পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে দেখতে। সঙ্গে ঢাকার পুলিশ সুপার হডসন। আর্মানিটোলায় মেডিকাল মেস থেকে বেরিয়ে এলেন বিনয় বসু, গায়ে সার্ট, পায়ে স্যাণ্ডাল, পকেটে পাঁচঘরার ছোট্ট একটি পিস্তল। রোগী দেখে সোয়া ন'টা নাগাদ লোম্যান-হডসন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাপ করছেন। মেডিকাল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বসু হাসপাতালের গেট পেরিয়ে সোজা বারান্দার

---

* ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'বিপ্লবতীর্থে' শেষের দিকে বি, ভি'র ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে, মিলিয়ে দেখেছি, গোয়েন্দার ডায়েরীর সঙ্গে মৌলিক বিশেষ বিরোধ নেই।

দিকে এলেন। কোন কথা নেই। তিনটে আর দুটো গুলী গিয়ে লাগল লোম্যান-হডসনের দেহে। (১) অদূরেই ছিলেন গবর্মেণ্ট কনণ্ট্রাক্টর সত্যেন সেন, তিনি ধরতে আসতেই বিনয় এক ঝট্‌কায় ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়। (২)

কাউকে ধরা গেল না। "ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কতকগুলো য়্যাংলোইণ্ডিয়ান যুবকসহ সার্জেন্টের দল...ঝাঁপিয়ে পড়ল মেডিকেল মেসগুলোর ওপর।" (৩)

"অন্তত ৫১ জনকে গুরুতর আঘাতের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।"(৪)

১৯৩০এর ৮ই ডিসেম্বর শুশুকের মতো ভেসে উঠলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়াসে´র মেজর বিনয় বসু কলকাতার রাইটার্স´ বিল্ডিং-এ, একা নয়, ক্যাপ্টেন দীনেশ (নসু) গুপ্ত, লেফটেনাণ্ট সুধীর (বাদল) গুপ্তকে নিয়ে এবং সাহেবি পোষাকে। দোতলায় এলেন একেবারে কারাবিভাগের প্রধান কর্ণেল এন. জি. সিম্পসনের ঘরের সামনে, বেয়ারারের কাছে জেনে নিলেন সাহেব আছেন কিনা, তারপর বেয়ারারকে সরিয়ে দিয়ে সোজা সিংহগুহায়। সিম্পসন ফাইল দেখছেন, পাশে পাসে´নাল এসিস্ট্যাণ্ট। বিনয় মুহূর্তকাল বিলম্ব না ক'রে আদেশ দিলেন 'ফায়ার'। অব্যর্থ ছ'টা গুলী। এসিস্ট্যাণ্ট টেবিলের তলায়। বসু-গুপ্তরা বেরিয়ে এলেন। বড় কর্তাদের খোঁজ নিলেন তাঁরা আছেন কিনা। ইন্‌সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও তাঁর সহকারী আততায়ীদের লক্ষ্য ক'রে রিভলভার চালালেন। দুজনেই ব্যর্থ। পক্ষান্তরে, জুডিসিয়াল সেক্রেটারি নেলসন উরুতে গুলীবিদ্ধ হলেন। (৫) সেক্রেটারি টয়নাম

---

(১) ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'বিপ্লবতীর্থে'র ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন। —লোম্যানের বুকে ও পেটে দুটি, হডসনের দেহে তিনটি।

(২) বিপ্লবতীর্থে আছে: ছাড়িয়ে নিয়েই এক ঘুষি সেন মশায়ের মুখে—ছিটকে পড়লেন।...বিনয় দৌড়ে ডিসেক্‌শান-রুমের পেছনকার দেয়াল টপকে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। কাছেই ছিল মেডিকাল মেস। সেই মেসের পায়খানার ছাদে উঠে আর একটা দেয়াল টপকে সে পড়ল এক বাসায়। সে বাসার খোলা দরজা দিয়ে এল গ্রীক-চার্চের সুমুখের গলিটায়।...আরমানিটোলা এসেই একটু দম নিয়ে খুব শান্তভাবেই উঠল একখানা ঘোড়ার গাড়িতে।...যথাস্থানে এসে বিনয়ের মনে হ'ল সত্যেন সেনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় হাতের রিভলভার ও পায়ের স্যাণ্ডাল সে হাসপাতালেই ফেলে এসেছে।—পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)

(৩) ঐ, পৃঃ ৯৯

(৪) জাগরণ ও বিস্ফোরণ পৃঃ ৫২৪।

(৫) জাগরণ ও বিস্ফোরণ পৃঃ ৫২৪।

আহত হলেন।...আমেরিকান পাদ্রী জনসন। (৬) লোহার পাইপ বেয়ে একতলায় নেবে বাঁচলেন।

তারপর এল পুলিশবাহিনী—পুলিশ কমিশনার টেগার্ট, ডেঃ কঃ গর্ডন। স্বল্পকালস্থায়ী বারান্দা-যুদ্ধ। তারপরই সব চুপ। সুধীর নিষ্প্রাণ, বিনয়, দীনেশের বুলেট আঘাত সত্ত্বেও নাড়ী চলছে। গুলী, পটাশিয়াম সায়ানাইড সত্ত্বেও মৃত্যু ফিরে গেল কেন এঁদের কাছ থেকে? জানিনে এটা বৈজ্ঞানিক কারণ কিনা, ভূপেন্দ্রকিশোর তাঁর বিপ্লবতীর্থে বলেছেন :"বিনয় বসুর আদেশে তিনজনেই গ্রহণ করলো সায়ানাইড।...ক্যাপটেন দীনেশ এবং দলপতি বিনয় বিষ খাবার সাথে সাথেই স্বহস্তে নিজেদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ব্যবহার করল নিজেদের রিভলভারেরই শেষ গুলি। বিষ আর পাকস্থলীতে যেতে পারল না। গুলির আঘাতে উভয়েরই বমি হয়ে গেল।" (৭)

জেল হাসপাতালে দু'জনের চিকিৎসা চলছে। বিনয় সামান্য জ্ঞান ফিরে পেতেই আঙুল চালিয়ে ক্ষতস্থান দুষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। ১৩ই তারিখ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বেঁচে উঠলেন দীনেশ গুপ্ত। অন্তত একটি ক্ষেত্রে বৃটিশ-শাসনের বিচার ব্যর্থ হ'ল না, দীনেশকে প্রাণদণ্ড ও ফাঁসী দেওয়া গেল (১৯৩১, ৭ই জুলাই, রাত্রি শেষ-প্রহর, তিনটে পঁয়তাল্লিশ)।

দীনেশ মাকে লিখেছিলেন : মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে।...যে খবর না দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল ভুল। (৩০এ জুন ১৯৩১, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল) লিখেছেন মণিদিকে : "ভগবানের আশিস যারা পায়, অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কত জনের হয় জানি না তবে যার হয় তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।" (আলিপুর, সেন্ট্রাল জেল, ৩।৭।৩১) লিখেছেন বৌদিকে : "যে-দেশে দশ বছরের মেয়েকে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ করিতে পারে সে দেশে ধর্ম কোথায়?...যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত।...একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই ভাই-খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি।...যে দেশকে ইহজন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছি, যার ধূলিকণাটুকু

(৬) বিপ্লবতীর্থে, পৃঃ ১৪৮

(৭) বিপ্লবতীর্থে, পৃঃ ১৪৯।

পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তার সম্বন্ধে এসব কথা বলিতে হইল।" (আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল ১৮ই জুন)। (৮)

দীনেশ গুপ্তর বিচারক ছিলেন চরম দণ্ডদানে অভ্যস্ত আর আর গার্লিক। গার্লিকের চরম দণ্ডের বিচারক হলেন কানাই ভট্টাচার্য। প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ-রাজের সাহেব-জজ যেমন রোজ আসেন পরম নির্ভয়ে তেমনি এসে বসলেন আলিপুরের দায়রা আদালতে। পেছনে দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত বারান্দা। মরণ এসেছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঐ বারান্দায়। ক্যালেণ্ডারে লেখা ২৭এ জুলাই ১৯৩১; হাওয়ায় দুলছে; বেলা দুটো অকস্মাৎ সশব্দ হয়ে উঠল; গুলীর আওয়াজ; মরণ কখন উঠে এসেছে সকলের অলক্ষ্যে সাক্ষীর কাঠগড়ায়। পর পর দু'টো গুলী। প্রথমটা ব্যর্থ, দ্বিতীয়টা অব্যর্থ এবং শেষ। গার্লিকের দেহরক্ষীর গুলীও ছুটল মূর্তিমান মৃত্যুকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট। আগন্তুকের পাল্টা গুলী; দেহরক্ষীর কাঁধের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল। 'দরোয়াজা' সার্জেণ্টের রিভলভার থেকে দুটি গুলী। "বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।" (আনন্দমঠ)

পকেটে একখানি চিরকুট: "ধ্বংস হও, দীনেশ গুপ্তর অবিচারে ফাঁসী দেওয়ার পুরস্কার লও"—ইতি বিমল গুপ্ত। কোন পরিচয় নেই, পুরস্কার ঘোষণা—বৃথা। অনেকদিন পর জানা গেল, আত্মত্যাগী দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর মজিলপুরের অধিবাসী—সদ্য স্কুলোত্তীর্ণ কানাইলাল ভট্টাচার্য।

ঠিক যে-সময়ে অকারণে সব-কিছু থামিয়ে দিয়ে লবণ-সত্যাগ্রহী গান্ধীজী 'ইকোয়াল পার্ট'নারশিপের' আশায় জি ডি বিরলাকে সাথী করে লণ্ডনের দ্বিতীয় বৈঠকে পৌঁছে গেলেন (১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১) এবং ইংরাজ ও আমেরিকানদের আশ্বস্ত ক'রে বললেন, রক্তাক্ত পথে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার চাইতে তিনি বরং যুগ যুগ অপেক্ষা করতে রাজি আছেন (He would personally wait, if necessary, for ages rather than seek to attain freedom of India by bloody means.) সেই সময়ে (১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১) হিজলীতে তার নিঃসংশয় জবাব পাওয়া গেল। কংগ্রেস-মঞ্চে বারংবার-নিন্দিত বিপ্লবীদের এক বন্দীশালা ছিল হতভাগ্য বাঙলার হিজলীতে। বিপ্লবীদলে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে, চিত্তরঞ্জনের ভাষায়, সেখানে ছিল ইংরাজের নির্দয় হাতে চয়ন-করা বঙ্গ-পুষ্পরাজি—(Flowers of Bengal) গুলী চলেছিল সরকারী তরফেই; বন্দীদের মধ্যে সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে প্রাণ

(৮) চিঠি ক'খানা 'বিপ্লবতীর্থে' থেকে আহৃত। 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ'-এও আরও অনেক চিঠি আছে; পৃপৃঃ ৫২৬-৩২]।

দিতে হ'ল, আহত হলেন ২০ জন। সারা বাঙলার ক্ষুব্ধ দুঃখকে ভাষা দিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা টাউন হলের সভায় কবিকণ্ঠ [স্পর্ধিত জালিনওয়ালা-বাগের দুঃসহ জ্বালায় হৃদয়োৎসারিত সেই কণ্ঠ আবার] সিংহনাদ করে উঠল : "এই যে হিজলীর গুলি চালানো......তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।...ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর তখন ধরে নিতে হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমানে ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে সেই সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।"*

সেকালে 'স্টেটসম্যানে' মেদিনীপুর ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার বদলা নেবার জন্য ইউরোপীয় এসোসিয়েশন সমর্থকদের পক্ষ থেকে হিজলী-বন্দীদের 'হোস্টেজ' ক'রে রাখা ইত্যাদি-জাতীয় বহু প্ররোচনামূলক চিঠি বেরোয় ; হিজলীর বন্দীহত্যা ও পীড়ন তারই প্রত্যক্ষ ফল বলে আমরা সন্দেহ করেছি ; ঘটনার পর এবং রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী উচ্চারণের পরও 'স্টেটসম্যান' এই অপকার্যের সাফাই গাইলে রবীন্দ্রনাথ তারও প্রতিবাদে লেখেন : "হিজলী কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দুজন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোন একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃস্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে, নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশী অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই সব অত্যন্ত চড়া-নাড়ী-ওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে ; এদের বাসা আরামের, আহার বিহার স্বাস্থ্যকর ; এরাই একদা রাত্রির

---

* লেখকের ছদ্মনাম সত্যানন্দ স্বামী লিখিত 'হে অতীত কথা কও'-য়ে রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত, পৃপৃঃ ২৯৯-৩০০

অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন।"*

অথচ এটি সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ কখনো বিপ্লববাদীদের মত ও পথ সমর্থন করেন নি, বারংবার তাঁদের শক্তি অপচয়ের জন্য সস্নেহ তিরস্কার করেছেন, "চার অধ্যায়" তখনই লেখা যখন বাঙলার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড তুঙ্গে, কিন্তু তাই ব'লে শাসকপক্ষীয় নরঘাতকেরা সন্দেহবশে আটক হতভাগ্যদের ওপর পীড়ন ঘটালে নীরব থেকে অথবা 'বেশ হয়েছে' এই ধরণের মনোভাবে নিজের অহিংসার শুচিতা রক্ষা করেন নি। কেননা, বেনিয়াস্বার্থে ধর্ম-নীতির ন্যাকামি-মেশানো রাজনৈতিক চাতুর্য তাঁর চরিত্রকে কখনো কলুষিত করেনি। তিনি বীর বিপ্লবীদের উদ্দেশে অকপট স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বন্দীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সদুত্তর দিয়েছেন। রাজবন্দীরা কখনো ভুলতে পারেন না ১৩৩৮-এর (১৯৩১) ১৯এ জ্যৈষ্ঠ দার্জিলিং থেকে 'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতাটি—

"নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।

'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।"**

রবীন্দ্রনাথের এমনই একটি অকৃপণ প্রশস্ত হৃদয় ছিল যে, গান্ধীজী যখন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের নিষ্ফল ও বিষময় ব্যর্থতার পর হতাশচিত্তে কারারুদ্ধ হ'লেন ও কিছুকাল অন্তেই হরিজনদের সেবার সুযোগ পেতে কারামুক্তির জন্য অনশন সুরু করলেন, গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল তিনি, এত উদ্বিগ্ন হলেন যে, চিঠি লিখলেন,

* হিজলী ও চট্টগ্রাম (২), রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩

** রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৯৬

প্রবন্ধ লিখলেন, প্রার্থনা করলেন, শেষ পর্যন্ত নিরস্ত করতে বা আশ্বাস দিতে ঐ পরিণত বয়সে গান্ধীজীর কাছে চলে এলেন। তাঁর ঐ দরাজ বক্ষে "মহাত্মাজী" যেমন স্থান পেয়েছিলেন উত্তিন্ন "নেতাজী"ও তেমনি স্থান পেয়েছিলেন। কৌতুকের বিষয়, গান্ধীজীর অনশনকালে বাঙলায় সূর্য সেনের মামলা ও আন্দামানে প্রকৃতই মরণপণ অনশন চলছিল এবং মহাবীর সিং, রামকৃষ্ণ নমদাস, মোহিত মৈত্র প্রমুখেরা অপমান অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয়তর ব'লে বরণ করেন। তখন এ বেদনা ছিল যেন এক বাঙলারই ; পক্ষান্তরে, সারা ভারতবর্ষ গান্ধীজীর অনশন নিয়ে তোলপাড়! বিপ্লবীরা সারা ভারতীয় বেনিয়া নেতৃবৃন্দের এমনই ছিলেন অশ্রদ্ধেয় ও নগণ্য।

আজ বাঙলার অবশ্যই সে অপরূপ নেই, সেদিন ছিল। মেয়েরাও এসেছিলেন বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে। প্রীতিলতা গেছেন। শান্তি-সুনীতি যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ, অনেকে বন্দী, তবু আরও আছেন। এলেন বীণা দাস। "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ভীড় ভেদ করে সরকারী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে উত্থিত হলেন ; হাতে তাঁর রিভলভার। লক্ষ্যস্থল গবর্ণর স্যার স্টানালি জ্যাকসন। সমাবর্তন ভাষণ পড়ছিলেন ; পাঁচটি গুলীই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। জ্যাকসন পড়তে লাগলেন। অদূরে ব্যর্থকামা বন্দিনী। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার বেণীমাধব দাসের মেয়ে, ডায়োসিসান কলেজের ছাত্রী। বাড়ি অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রামে। বি-এ ডিগ্রী নিতে এসেছিলেন কনভোকেশন গাউন পরে। কলেজ হোস্টেলে তাঁর ঘরে খুঁজে পাওয়া গেল আরও পাঁচটা তাজা কার্তুজ।"

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে ন'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। অপরাধ স্বীকার ক'রে তিনি সেদিন যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বাগ্মী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সৌজন্যে তা ছাপা হয়ে হাতে হাতে বিলি হয়েছিল। বীণা দাস (ভৌমিক)-এর "শৃঙ্খল ঝঙ্কারে" সেটি নেই। এ এন মিত্রের অ্যানুয়াল রেজিস্টার-এ তার যে ইংরাজী ভাষ্য আছে, তার অনুবাদ এই :

"অবরুদ্ধ দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমি গবর্ণরকে গুলী করেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার দুঃখের নিবৃত্তি হবে যদি আমি দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ ক'রে মৃত্যু বরণ করি। ভারতীয় নারীত্বের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মধ্যে বড় হয়েছি আমি ; কিন্তু গবর্ণমেন্টের বেকানুন এমন এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি করছে যে, আমার মতো ক্ষীণশক্তি নারীকেও তার কোমল প্রকৃতি দিয়েছে ভুলিয়ে। আমি সকলের দৃষ্টি এদিকেই আকর্ষণ করতে চাই। তবে আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মানুষ হিসেবে স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত

কোন আক্রোশ নেই ; তিনি আমার পিতৃতুল্য ; লেডী জ্যাকসনও আমার মায়ের মতো। কিন্তু বাঙলার গবর্ণর একটা শাসন ব্যবস্থার প্রতিভূমাত্র ; এই শাসন ব্যবস্থা আমার স্বদেশের ত্রিশ কোটী নর-নারীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে।......"*

সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার হলেও সার্জেন ধরা পড়ে গেলেন। সার্জেন বিক্রমপুরের কালীপদ মুখার্জি—মুন্সীগঞ্জের স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যাপ্রসাদ সেনের অপারেশন। কামাখ্যা মাইনে নিতে এসে ঢাকার ওয়াড়িতে সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এস এন চ্যাটার্জির বাড়ি ঘুমোচ্ছিলেন। মশারী টাঙানোই ছিল ঢাকার মশা। মশারী তুলেই অস্ত্রোপচার হয়ে গেল। পরদিন টেলিগ্রাফ অফিসে মনোরঞ্জন দত্ত নিয়ে এল এক টেলিগ্রাম। প্রেরক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৭ পটুয়াটুলি ঢাকা ; প্রাপক ডাক্তার, সারদা মেডিকাল হল, ইছাপুরা—Kamakshya's operation successful, no anxiety—'কামাখ্যার অস্ত্রোপচার সফল, উদ্বেগের কারণ নেই'। পোষ্টমাস্টার কি বারুদের গন্ধ পেলেন ? পুলিশকে খবর দেওয়া হল টেলিগ্রাম-বাহক দর্জির দোকানে অপেক্ষমান কালীপদকে দেখিয়ে দিল। কালীপদ অপারেশনের সব দায়দায়িত্বই স্বীকার ক'রে নিলেন, আর কিছু ভাঙলেন না। পুলিশ কামাখ্যাকে ভাঙতে কসুর করেনি। ১৯৩৩-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসী হয়ে গেল কালীপদর।

কিন্তু ধরা পড়েনি এলিসনের আততায়ী। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, বি, এলিসন বাংলোয় ফিরছিলেন সাইকেলে। পটকা ফাটলো সাইকেলের পেছনে। ফিরে চেয়েছেন কি হাতে, পিঠে, পেটে লাগল এসে গুলী মুহূর্তে মৃত্যুদূত উধাও। এলিসনও সাইকেল থেমে নেমে কয়েকটি গুলী ছোঁড়েন। আততায়ীর মত একটাও অব্যর্থলক্ষ্য নয়। সাতদিন লড়াই করলেন যমের সঙ্গে তারপর আত্মসমর্পণ।

কয়েকটি ব্যার্থ প্রচেষ্টা

ঢাকা বিভাগের কমিশনার আলেকজাণ্ডার ক্যাসেল্স, মহকুমা হাকিম পৌরসভার চেয়ারম্যান যাচ্ছিলেন (অধুনা পররাষ্ট্র বাঙলাদেশান্তর্গত) টাঙ্গাইল শহরে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক দেখতে। ১৯৩১-এর ২১এ আগস্ট। একটি যুবক হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে ক্যাসেল্সকে গুলী করেই পালিয়ে যান। পেছনে ছুটে গিয়েও তাঁকে ধরতে পারা যায়নি। ক্যাসেলসের আঘাতও মারাত্মক নয়। নিয়মমাফিক

*লেখকের ছদ্মনাম সত্যানন্দ স্বামী লিখিত 'হে অতীত কথা কও।" পৃপৃঃ ৩১০—৩১

ক গুচ্ছের ছেলেকে ধরা হ'ল। শেষ পর্যন্ত ললিত চন্দ্র রাহা নামে এক যুবককে ত্র আইনে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সেকালে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন স্বভাবতই বাঙালী বিপ্লবীদের জাতিশত্রু য়ে উঠেছিল এবং সর্বদাই বাঙলা সরকারকে প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে প্ররোচিত রত। তার একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছি হিজলী বন্দীশিবিরের। এই এসোসিয়েশনের প্রসিডেন্ট ছিলেন ই ভিলিয়ার্স। ফলে, তিনি বিপ্লবীদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে পড়েন। ৯৩১-এর ২৯এ অক্টোবর তিনি ক্লাইভ বিল্ডিংসে তাঁর কক্ষে তিন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ রছিলেন, এমন সময় পা-জামা, কোট ও ফেজ পরা এক যুবক দরজা ঠেলেই ভিলিয়ার্সকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলী ছোঁড়েন। ভিলিয়ার্স নিজে টেবিলের তলায় গিয়ে াণে বাঁচলেন বটে কিন্তু আততায়ী বিমল দাশগুপ্ত ধরা পড়ে গেলেন। যে-তিন ্যক্তি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে গল্প করছিলেন তাঁরাই ধরে ফেলেন। বিমলের কাছে দুটি রিভলভার ছিল। বিচারে বিমলের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। (১৯৩১, ২ নবেম্বর)

ভিলিয়ার্সের মতই 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এলফ্রেড ওয়াটসন। দিনের র দিন বাঙলা সরকারকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছেন। এমনই একদিন মধ্যাহ্নভোজ সেরে ওয়াটসন আসছেন অফিসে। গেটের কাছে এসে গাড়িটা হয়েছে শ্লথগতি। কটি যুবক গাড়ির মধ্যে রিভলভারের ঘোড়া টিপলেন; গুলী গাড়ীর কাঁচ ভাঙল, ওয়াটসনের কোন ক্ষতি করতে পারল না। আততায়ী ঘাবড়ে যেতে রিভলভারটাও গাড়িতে পড়ে গেল। পত্রিকা অফিসের দারোয়ান ও উপস্থিত এক কনস্টেবল ধরে ফেলল যুবকটিকে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যুবকটি পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে দিলেন (১৯৩২, ৫ই আগস্ট)। অতুল চন্দ্র সেন ব্যর্থতার খাতায় নাম লিখে আত্মাহুতি দিলেন। অতুলের আদিনিবাস ছিল খুলনার সেনহাটি, হাল সাকিন ছিল নারকেলডাঙ্গা।

আবার ২৮এ সেপ্টেম্বর! ওয়াটসন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় মোটরে বেরিয়ে আসছেন অফিস থেকে। একই গাড়িতে লেডী সেক্রেটারি। গাড়ি বেরিয়ে এসে ক্রমে অক্টারলোনি রোডে পড়ল, ইডেন গার্ডেন ছাড়িয়ে গেল, স্ট্রাণ্ড, নেপিয়ার রোড। ক্লাইভ রোডের মোড়ে একটা গাড়ি থেকে তিন আরোহী ও ড্রাইভার ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন গুলী। দুটো গুলী মাত্র ওয়াটসনের কাঁধে আঁচড় কেটে গেল। একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি কাটিয়ে ওয়াটসনের গাড়ি ছুটল বেগে। আততায়ীদের গাড়িটাও এসে পড়ল ওয়াটসনের গাড়ির ওপর তেমনি বেগে। আর এক দফা ব্যর্থ

গুলীবর্ষণ হল। এক সার্জেণ্ট ছুটে এসে আততায়ীদের দিকে গুলী চালাল। আততায়ীরা কোন রকমে নিজেদের ছাড়িয়ে ছুটলেন দক্ষিণ পানে।

ওয়াটসনের কিছু হয়নি। কিন্তু এঁদের গাড়িখানা মাঝেরহাটে একটি গরুর গাড়ি ও একটি ঘোড়ার গাড়ি পাশ কাটাতে গিয়ে পড়ল এক লাইটপোষ্টে। তখন গাড়ি থেকে নেমে ছুট। মোটরে রইল পড়ে একটি ছ'ঘরা রিভলভার, পাঁচটা কার্তুজ। ছুটতে ছুটতে একজন সরে পড়লেন একদিকে। তিনজন ধরা পড়ে গেলেন। দু'জন কোন এক সুযোগে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মবলি দেন। তৃতীয় ব্যক্তি থাকেন আটক পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর প্রতীক্ষায়। আর পলাতক যে-ভদ্রলোক গাড়িতে বেহালা ছেড়ে ঝামাপুকুর অবধি আসতে পেরেছিলেন তাঁরই বিবৃতি মতো পুলিশ তাঁকে ৯০/৩ নং মেছোবাজার স্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার করে। নাম সুনীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আত্মদানীদের নাম—ননী লাহিড়ী, অনিল ভাদুড়ী, বিচার হ'ল—সুনীলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, প্রমোদের দশ বছর ও আর একজনের (?) দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড, তিনজনের মুক্তি (১৯৩২, ১৭ নবেম্বর)।

সি, এ, ডবলিউ লিউক (Luke) ছিলেন রাজসাহী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। নিজের মোটরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে। তারিখটা ছিল ১৮ই নবেম্বর ১৯৩২। 'একটু দূরে গোটা তিনেক লোক দাঁড়িয়ে কি কথা কইছে। একজনের হাত রয়েছে একটা সাইকেলে। লিউকের গাড়িটা কাছাকাছি আসতেই সাইকেলটা পড়ে গেল গাড়ির সামনে। বাকী দু'জন ছুটে এসে করল গুলী। গুলী যারা করল তারা পালিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু ধরা পড়ে গেল সাইকেলওলা ভোলানাথ রায় কর্মকার। দণ্ড হ'ল সাত বছর দ্বীপান্তর (১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩)। হাইকোর্টে আপীল সরাসরি খারিজ হয়ে গেল (২৩এ মার্চ)।

১৯৩২-এর ২২এ আগস্ট, বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ঢাকার রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সি জি গ্রাসবি মোটরে ফিরছিলেন নিজের কোয়ার্টারে, সঙ্গে দেহরক্ষী; মোটর সাইকেলে এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টও সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। নবাবপুর রেল-ক্রশিংটা এসে গেল। গেট বন্ধ। কেন? ট্রেন যাবার সময় তো এ নয়। দেহরক্ষী গেল ব্যাপারটা কি জানতে। অকস্মাৎ এক যুবক বাঁ দিক থেকে এসে ছুঁড়লেন গুলী গ্রাসবিকে লক্ষ্য করে। গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু আততায়ী বিনয়ভূষণ দেব রায়ের ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়াল গুরুতর। যখন ছুটছেন পুলিশের গুলী এসে লেগেছে দুই উরু ও ডানহাতের আঙ্গুলে। কোনমতে রেল

খালাসির কোয়ার্টার অবধি, তারপরই পড়ে গেলেন। খালাসি ও দেহরক্ষী দু'জনে মিলে ধরে ফেলে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হ'ল ১৮ই নবেম্বর।

রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্র (বা জ্যোতীন্দ্র) নাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাপক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর আরও একটা তেমনি অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। বাঙলার বিপ্লব সাধনার ইতিহাসে তারই নাম, 'আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা'। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সার্থকতার বিচারে এ সব প্রচেষ্টাই ম্লান। কার্যত এসব ষড়যন্ত্র আরম্ভেই শেষ। যে-ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা 'বক্সা বন্দী শিবিরে' প্রণয়ণ করা হয়েছিল তার জাল ছড়িয়েছিল যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ইত্যাদি জায়গায়ও। কিন্তু বন্দীদের তালিকায় সবই বাঙালী। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তালিকায় যে ডাকাতির কথা আছে তার অধিকাংশই বাঙলাদেশের ময়মনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে, মাদ্রাজে একটা সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ ও উতকামণ্ডে একটা ব্যাঙ্ক লুটের অভিযোগও আছে। রাজসাক্ষী দাঁড়িয়েছিল দু'জন। ১৯৩৩-এর ৭ই আগস্ট মামলা সুরু হয় এক স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালে। ট্রাইবিউনালের দণ্ড হাইকোর্টে এসে দাঁড়াল (৩০, ৭, ৩৬): যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী, জিতেন্দ্র নাথ গুপ্ত, সীতানাথ দে ; ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড—নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; সাত বছর—কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র চৌধুরি, পরেশ গুহ, যতীন চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্র তলাপাত্র, প্রভাতকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্র মজুমদার, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, অমূল্যচরণ সেনগুপ্ত, অমিয়কুমার পাল ; ছয় বছর—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিমল ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র ধর চৌধুরি, জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার ; পাঁচ বছর—অবনী ভট্টাচার্য ; তিন বছর—সুধীর ভট্টাচার্য, অজিত কুমার বসু।

চাঞ্চল্যের দিক থেকে হিলি মেল ডাকাতি অনেক গভীর দাগ কেটেছে ; তেমনি এ উদ্ঘাটিত করেছে বাঙলার বিপ্লবীরা সাধারণ স্বদেশবাসী থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের লোকেরাই এঁদের শত্রুতাচরণ করে ও ধরিয়ে দেয়। হিলি স্টেশনে পিয়ন কালীচরণ মাহালি দার্জিলিং মেল থেকে বালুরঘাটের ডাক নামিয়ে নিচ্ছিল। একদল যুবক এসে ব্যাগ ছিনিয়ে নিতে পিয়ন বাধা দেয় ; গুলীতে তার প্রাণ যায়। ১৯৩৩-এর ২৮এ অক্টোবর। অস্ত্রোপচার সফলই হ'ল। গ্রামের ভেতর দিয়ে পালাবার সময় ধরা পড়ে গেলেন। তিনজন রাজসাক্ষী দাঁড়িয়ে গেল—অলোকরঞ্জন দাস, শশধর সরকার, লালু পাণ্ডে। তবু তাদের কারাদণ্ড হয়। ট্রাইবিউনাল প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন-চারজনকে—প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য,

সরোজকুমার বসু, সত্যব্রত চক্রবর্তী ; হাইকোর্ট দিলেন প্রথম দু'জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ; বাকী দু'জনের সশ্রম কারাদণ্ড। মামলাটা প্রিভি কাউন্সিল অবধি গড়িয়েছিল এবং হাইকোর্টের রায়ই চূড়ান্ত হয়। একজনের মৃত্যুর জন্য চার জনের মৃত্যুদণ্ড—বড্ড বাড়া বাড়ি করেছিল ট্রাইবিউনাল। প্রফুল্লকুমার সান্যাল, আবদুল কাদের চৌধুরি,কিরণ চন্দ্র দে'র ট্রাইবিউনালে হয়েছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, হাইকোর্ট করলেন প্রথম দুজনের ১০ বছর, তৃতীয় জনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আর দশ বছরের জায়গায় হরিপদ বসু ও রামকৃষ্ণ সরকার (মণ্ডল)-এর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড। মূল মামলায় বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে পাওয়া যায়নি ; পরে ঢাকায় ধরা পড়েন, (১৯৩৪, ৪ঠা ডিসেম্বর) স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনাল দণ্ড দেন দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, হাইকোর্টে সে দণ্ড বহাল থাকে।

এই অবস্থায় হঠাৎ একটি সার্থকতার ঝিলিক দিয়েই বাঙলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সে ঝিলিকটিও চট্টগ্রামে। মনে হয়েছিল, সূর্য সেনের পর অগ্নিনালিকার উদ্গীরণও শেষ। না। পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মাখনলাল দীক্ষিতের প্রাণের বিনিময়ে তা প্রতিপন্ন হ'ল। লোকে জানে, মাস্টারদার ধরা পড়বার মূলে এই দারোগামশাই। নিশ্চিন্ত মাখনলাল ১৯৩৩-এর ২৬এ মার্চ রাত সাতটায় বাড়ি ফিরে এসেছেন। অকস্মাৎ দুটি যুবক আবির্ভূত হ'ল আবছা অন্ধকার কাটিয়ে। অগ্নিনালিকার উদ্গীরণ হ'ল। আততায়ী দু'জন নিমেষে হাওয়া। মাখনের দেহ তখন মাটিতে লুটোচ্ছে। বাড়ির লোকেরা নাড়ী টিপে দেখে—শেষ।

এরপর আবার একটি ব্যর্থতা। চট্টগ্রামেরই পল্টনের মাঠে ক্রিকেট খেলা ভাঙল। পুলিশ সুপার ইংরাজ ; ক্লাবঘর থেকে বাংলোয় ফিরছেন মোটরে। নজরে পড়ল ক্লাব ঘরের কাছেই দুটি মানুষ। খোঁজ নেবেন বলে গাড়ি থামালেন। পড়ল বোমা—নিষ্ফল ; আরও দু'টো—এবং নিষ্ফল। পুলিশ সাহেব ধরলেন এসে একজনকে, দুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তির সুযোগে ড্রাইভার চালালো গুলী ; অব্যর্থ, বিপ্লবী নিত্যরঞ্জন সেনের প্রাণ উড়িয়ে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় জন পালাচ্ছিলেন, তাঁকেও লক্ষ্য করে ছুটল গুলী, বিপ্লবী বিমল চক্রবর্তী নিষ্প্রাণ দেহে দেশের মাটি চুম্বন করলেন। এঁদেরই সঙ্গী কৃষ্ণকুমার চৌধুরি ও হরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ক্লাবের তাঁবু ও টাউন ইন্স-পেক্টরের বাংলোয় বোমা ফেলেন। ব্যর্থ। তখন চালান রিভলভার, কারও গায়ে লাগল না। ধরা পড়ে গেলেন। দু'জনেরই মৃত্যুদণ্ড, হাইকোর্ট বহাল রাখলেন

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের রায়, ১৯৩৪-এর ৫ই জুন মেদিনীপুর জেলে ফাঁসী হয়ে গেল দু'জনের।

এমনিতর এক ঘটনায় প্রাণ বলি হ'ল মতি মল্লিকের। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় তাঁর "বিপ্লবতীর্থে" (পৃঃ ১৭৮) লিখেছেনঃ "ভিলেজ গার্ড নামে এগুার্সনী চর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত যাবতীয় ইয়ুথ মুভমেণ্ট দমন করার কুটিল অভিপ্রায়ে। একদিন নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামের কাছে ঘটলো সেই ভিলেজ-গার্ডদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সঙ্ঘর্ষ। রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীদের গুলীর ঘায়ে মরলো এক ভিলেজ-গার্ড, জখম হলো তাদের একাধিক। পালিয়ে গেলেন সুকুমার (লণ্টু) ঘোষ। ধরা পড়লেন মতি মল্লিক। ফাঁসীর রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন সর্ব্বত্যাগী সে বীর।"

কাহিনীটি অন্যরকম আছে "জাগরণ ও বিস্ফোরণ"-এ (পৃঃ ৬২৯): "নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে ১৯৩৪ এপ্রিল ১০ই একটা বাড়ীর বাইরের দাওয়ায় বসে রাত্রি দুটো পর্যন্ত কয়েকজন গল্প করছে। সে সময় ঝরঝরে পোশাক-পরা, খালি পায়ে কয়েকটি যুবককে তারা সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখতে পায়।...পথচারীদের পরিচয় জিজ্ঞাসার সময়, একা দাঁড়ালেন মতি মল্লিক। তাঁর সঙ্গীরা সরে পড়তে চেষ্টা করেন। প্রশ্নের উত্তর হ'লঃ নিমন্ত্রণ খেয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরছেন। মতির বগলে একটা পুঁটুলি...হঠাৎ টান মারতে তিনটে বালা ক্লাভা ক্যাপ পড়ে যায় ...গ্রামবাসীরা সকলকে ঘিরে ফেলে। তখন প্রতিপক্ষ রিভলভার থেকে গুলী ছোঁড়েন...তিনজন কতকটা পথ পালাতে সক্ষম হন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং অন্যান্য বাড়ি থেকে লোক বেরিয়ে পড়ে ঐ তিনজনকে ধরে ফেলে। গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন মারা যায় এবং দ্বিতীয় জনের ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে।...

"সেপ্টেম্বর ২৭এ মতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সনাক্ত করার গোলযোগে মতির সঙ্গীরা মুক্তিলাভ করেন। ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে" মতিলাল মল্লিকের ফাঁসী হয়।

ডাকাতির পরবর্তী ব্যর্থতার দিক থেকে চট্টগ্রামে বাথুয়ার ডাকাতি হিলির মতই উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪-এর ২৪এ ফেব্রুয়ারি প্রসন্নকুমার মালাকার ও ত্রিপুরা মালাকারের বাড়িতে ডাকাতি হয়ে যায়। পুলিশ সুকৌশলে বহুদূর পর্যন্ত ঘিরে ফেলে। পরদিন সকালে প্রথম দফায় ধরা পড়েন প্রিয়দারঞ্জন চক্রবর্তী, মহেশচন্দ্র বড়ুয়া, মনোরঞ্জন সাহা, নীরেন্দ্রলাল দে, হরিহর দত্ত, জীবেন্দ্র কুমার দাস ও শরদিন্দু দত্ত।

তাঁদের হেফাজতে পাওয়া গেল প্রচুর কার্তুজ, কয়েকখানা ছোরা, কয়েকটা টর্চ, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি। তারপর ক্রমশ ধরা পড়লেন মোক্ষদারঞ্জন চক্রবর্তী, কীর্তি মজুমদার, নীরেন্দ্রলাল দে, মনোরঞ্জন চৌধুরি, গগন চন্দ্র দে, অরবিন্দ দে।

স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায় (১৯৩৪, আগস্ট ২৭) হাইকোর্ট বহাল রাখেন: যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—প্রিয়দা, মোক্ষদা, মহেশ, মনোমোহন, গগন, মণীন্দ্র, হরিহর; দশবছর দ্বীপান্তর—জীবেন, শরদিন্দু; দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড—নগেন, অরবিন্দ, নীরেন; সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড—কীর্তি, মনোরঞ্জন।

কিন্তু সব চাইতে মারাত্মক ব্যর্থতা ঘটে দার্জিলিংয়ের লেবং ঘোড়দৌড় মাঠে। আয়র্ল্যাণ্ডে দমননীতির কুখ্যাত নায়ক স্যার জন এণ্ডার্সনকে চরম চণ্ডনীতির গবর্ণর হিসেবে বাঙলাদেশে আনা হয়েছিল। স্বভাবতই বাঙলার বিপ্লবীদেরও তিনি লক্ষ্য হয়েছিলেন। গবর্ণরের পেছন পেছন ওঁরাও এলেন একজন দুজন ক'রে সন্দেহের ছায়া এড়িয়ে এড়িয়ে। কালটা ১৯৩০-এর মতো সংশয়মুক্ত ছিল না; উত্তরতিরিশে অনেক জট জটিলতা বিপত্তি জমেছে বাঙলার সর্বাঙ্গে। পুষ্প প্রদর্শনীতে গবর্ণর-মোলাকাৎ মুলতুবি রাখা হল; দিন পড়ল ঘোড়দৌড় দেখার দিন ৮ই মে। লাটের আসনের ডাইনে বাঁয়ে দুটি আসন পেলেন ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। দৌড় শেষ হয়েছে। লাটসাহেব উঠে আবার বসতে যাচ্ছেন, ভবানী খুব কাছে এসে চালালেন গুলী—নিষ্ফল। ভবানীকে পর্যুদস্ত করে ফেললেন একজন। ছুটে এলেন রবীন, গুলীও ছুটল, কিন্তু সেও নিষ্ফল, রবীনও জনতার হাতে ভূপাতিত হলেন। দুজনের হাতের দুটো রিভলভারে ন'টা গুলী থাকতেও আর ছোটানো যায়নি একটাও। বরং ভবানীর দেহই গুলীবিদ্ধ হয়েছে চার জায়গায়, রবীনের কপাল ফেটে চৌচির।

ধরা পড়লেন আরও অনেকে। কি সূত্রে? বলা মুস্কিল। দণ্ডদানের পর রবীন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়; হয় সশ্রম কারাদণ্ড। তাও মকুব, রবীন্দ্র ইংলণ্ড যাবার অনুমতি পান।

কিন্তু ভবানীপ্রসাদই একক শহীদ হ'য়ে রইলেন এই মামলায়। * ট্রাইবিউনাল-হাইকোর্ট মিলিয়ে দণ্ড দাঁড়াল: মৃত্যু—ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য; যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; চোদ্দ বছর—উজ্জ্বলা মজুমদার, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ; বারো বছর—সুশীলকুমার চক্রবর্তী। মনোরঞ্জনকে

---

* আলিপুর এণ্ডার্সন হাউসের নাম আজ ভবানী হাউস (কেউ বলে কি?)।

ধরা হয়েছিল কলকাতায় জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র রোড থেকে; উজ্জ্বলাকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড থেকে, সুশীলকে মীরজাপুর (সূর্য সেন) স্ট্রীট থেকে, সুকুমার ঘোষকে গার্ডেনরীচ থেকে। স্পেশাল ট্রাইবিউনাল বসে ১৪ই আগস্ট, রায় বেরোয় ১২ই সেপ্টেম্বর, হাইকোর্টের রায় বেরোয় ৩ ডিসেম্বর। ভবানীপ্রসাদের ফাঁসী হয় ১৯৩৫-এর ৩রা ফেব্রুয়ারি।

রোহিণী বরুয়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত

ফরিদপুরের গোয়ালন্দ ঘাট থানার এক গ্রামে অন্তরীণ চট্টগ্রাম রাওজান থানার ১৯ বছর বয়স্ক বঙ্গসন্তান রোহিণী বরুয়া সুয়োরানী পরিপোষিত হিন্দুবিদ্বেষী নিপীড়ক সৈয়দ এরসাদ আলি দারোগাকে যোগ্য শাস্তি দিয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন (১৯৩৫ ডিসেম্বর ১৮ই)।

বারে বারে অকারণে লাঞ্ছিত অপমানিত হ'তে হ'তে রোহিণী একদিন মনঃস্থির ক'রে ফেললেন; তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন:

"মনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। কেবল ভাবতে লাগলাম, বারে বারে এই দারুণ অপমানের আঘাত আর কতদিন সইতে পারবো? স্থির করলাম, যখন কোন প্রতিকার নেই, আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করি।......"

তারপর স্থির করলেন, তিনি মরবেনই, সঙ্গে করে দারোগাকে নিয়ে যেতে পারলে—

"দুপুর হ'তেই প্রতিহিংসা-চিন্তা আমার মনকে দখল ক'রে বসলো। আমার এ ব্যর্থ দুর্বহ জীবনে আর কোনও কাজ নেই। রান্নাঘরে গিয়ে দা-খানা সংগ্রহ করে এনে কাছে রেখে দিলাম। তিন বছর ডেটেন্যু-জীবন কাটালাম, আর কতকাল এভাবে থাকতে হবে তার কোনও স্থিরতা নেই।......

"সন্ধ্যা হয়ে এল; ঘর থেকে আমি বাইরে এলাম দা-খানাকে নিয়ে।...কোঁচার কাপড়ের মধ্যে দা-খানা লুকোনো রইল।...আমি ঘরের মধ্যে গেলাম। তখন দারোগাসাহেব চেয়ারে বসে লিখছিলেন।......আমি বৃথা কালক্ষেপ না করে এরসাদের ঘাড়ে দু'কোপ বসিয়ে দিলাম। বঙ্কিমবাবু...আমাকে ধরবার জন্য এগিয়ে এলেন। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁকে এক-ঘা কষাবার উদ্যোগ করছি দেখে তিনি পিছু হটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালালেন।"

রোহিণীর মনে সংশয় হয়েছিল যে দারোগার আঘাত যথেষ্ট মারাত্মক হয়নি,...

তাই ফিরে এসে দারোগার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে থানার কাছেই এক নালার মধ্যে দা ফেলে দিলেন। ফিরে এসে সকলকে ডেকে বললেন যে, তাঁর কাছে কোনও অস্ত্র নেই, যে-কেউ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। এই বলে তিনি দৃঢ়পদে থানাঘরে এসে প্রবেশ করলেন।...

এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি বাক্যও তাঁর মুখ থেকে কেউ শোনে নি। ট্রাইবিউনাল (১৯৩৫, জুলাই ১৮), হাইকোর্ট (নবেম্বর ২৫), নির্বিকার রোহিণী ফরিদপুর জেলে তেমনি দৃঢ়পদে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করলেন।*

* "জাগরণ ও বিস্ফোরণ", পৃপৃঃ ৬৪৭—৫০

"রক্ত দাও, স্বাধীনতা দেব"

'বাঙলার বিপ্লব সাধনা'র যে বৃত্ত আঁকছিলাম তার শেষ বিন্দুতে প্রায় এসে গেছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম কলঙ্কময় অধ্যায় ত্রিপুরী কংগ্রেসে ক্ষমতা-লোলুপ-অসুর-নিপীড়িত বাঙলার বিপ্লবী দুলাল সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের হীন চক্রান্তের শেষে কংগ্রেস থেকে অপসারিত হ'লে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকেই 'দেশনায়কের' পদে বরণ করেন। কবির সেই প্রাণময়, বিষণ্ণ অথচ ক্লৈব্য-পরিহার-আহ্বানে সতেজ কথাগুলো আজও কানে বীণার ঝঙ্কারের মত বাজে: "সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাঙলাদেশের হ'য়ে তোমাকে 'দেশনায়কের' পদে বরণ করি। ...রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি।"

এবং আরও:

"সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি।(১) সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে...আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য-দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।......"*

"জন্মাবধি সংগ্রামী", লিখেছেন লাহোরের দুর্লভ সিং তাঁর "দি রিবেল প্রেসিডেন্ট"-এ (পৃঃ ১৩৭), "তাই তিনি মুহূর্তের জন্যও জাতীয় অসম্মান বরদাস্ত করতে রাজি নন। কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট ছিল ভারতবর্ষীয়দের এক কলঙ্কের বস্তু।... বসু স্থির করলেন, এই মনুমেন্ট অপসারণের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করবেন।" (২)

---

(১) সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস ছেড়ে যে-জাহাজে স্বদেশে ফিরছিলেন সেই জাহাজেই রবীন্দ্রনাথ আসছিলেন। দেশে গান্ধীজীর আন্দোলন চলছিল; সি আর দাশ যোগ দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে আলাপ হয়। এ অসহযোগ আন্দোলন কবির মনঃপূত ছিল না। সুভাষ দেশে ফিরে তাতে যোগ দেন।

* দেশনায়ক, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃপৃঃ ৩৮৭-৩৯০, রচনাকাল ১৯৩৯। ক্ষুদ্রস্বার্থ-লোভী বশম্বদ পত্রিকাগুলো তখন চিঠিটি ছাপে নি।

(২) দি রিবেল প্রেসিডেন্ট, দুর্লভ সিং, হীরো পাব্লিকেশন্স, লাহোর, ১৯৪১।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যাই করুন, বারে বারে ইংরাজ-শাসন-লাঞ্ছিত সুভাষচন্দ্র নিশ্চেষ্ট থাকবার:মানুষ নন। নিশ্চেষ্ট থাকেনও নি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গাব্দ ১৩০৯-এর কার্তিক মাসে (খৃষ্টাব্দ ১৯০২) লিখেছিলেন: "ঠিক খাঁটি :বিলাতি অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেণ্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সামনে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়িভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা অন্ধকূপ হত্যার অত্যুক্তি।...

"হলওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কত রূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা-গ্রন্থে ভালোরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপন করিয়াছে।" (৩)

আরও বলেছিলেন: "যে-সকল সমূলক অমূলক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিয়া প্রাচ্য-চরিত্রের নির্দয় বর্বরতায় ইংরাজ সন্তানগণ বংশানুক্রমে কণ্টকিত হইয়া আসিতেছেন.........অন্ধকূপহত্যা তাহার মধ্যে একটা প্রধান। সেই আঘাতের একটা প্রতিঘাত না করিতে পারিলে আত্মাবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। (৪)

সেই প্রতিঘাত দেবার শক্তি ছিল কার? কবি যাঁকে দেশনায়ক-পদে বরণ করেছেন, একমাত্র সেই সুভাষচন্দ্রেরই।

"সুভাষচন্দ্র...কলিকাতায় ডালহৌসি স্কোয়ারে [উত্তর-পশ্চিম কোণে] অন্ধকূপ-হত্যার-স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। বহু স্বেচ্ছাসেবক নির্যাতিত এবং অন্তরীণ হতে থাকল।" (৫) [উল্লেখযোগ্য, এই নির্যাতিতদের মধ্যে স্বাধীনোত্তরকালে একদল দেশীয় নির্বোধ আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হেমন্তকুমার বসুও ছিলেন; যিনি নিজেকে এবং অপরেও যাঁকে 'অজাতশত্রু' বলে জানতেন]। আন্দোলনের ফলে, সঙ্গে সঙ্গে না হ'লেও, আমলাতান্ত্রিক ঢিমে চালে এ কলঙ্ক অপসারিত হয়। আমলটা ১৯৩৫-এর শাসন-সংস্কারজাত-মুসলিম-শাসন হ'লেও মাথার ওপর :সার্বভৌম বৃটিশ সূর্য প্রচণ্ড তেজে বিরাজমান। সুভাষচন্দ্রকে

(৩) অত্যুক্তি, দিল্লী-দরবারের উদ্‌যোগকালে লিখিত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃপৃ: ১০৭৪-১০৮৫।

(৪) সিরাজদ্দৌলা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ:পৃ: ৪৭২-৭৬; অক্ষয় মৈত্রেয়ের সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থ আলোচনা।

(৫) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাশ পৃ: ১৩৪

অপসারণকারী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বৃটিশ শাসকমণ্ডলীর একটা জায়গায় মিল ছিল : তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে জানতেন। সুতরাং, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সর্বভারতীয় সংগঠন যেখানে নিষ্ক্রিয় ও আপোষকামী সেখানে সুভাষচন্দ্র সক্রিয় হ'য়ে উঠবেন এ বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না। সুভাষচন্দ্রকে আটকাবার একটা ব্যবস্থাও বাঙলা সরকারের মাধ্যমে হ'য়ে গেল। তাঁর বিস্তারিত পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের আগেই, তিনি বন্দী হ'য়ে গেলেন।

"১৯৪০ সালের ২৯শে জুন সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট বিলোপ সাধনের দাবী উত্থাপন করেন এবং ২রা জুলাই তারিখে তিনি ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। সরকার সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ৩০শে আগস্ট এবং এই মামলা চলাকালেই ২৮এ অক্টোবরের তারিখে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন।" (৬) বলা বাহুল্য, তাঁর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের যোগদানের অধিকার স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মনঃপূত ছিল না।

তাঁকে যে-কোনক্রমে আটক রেখে মামলার অজুহাত সৃষ্টি করা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বাংলার গবর্ণর ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে লেখেন : "১৯৪০ সালের ২রা জুলাই ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুযায়ী বাংলা সরকারের নির্দেশে কোন কারণ না দেখিয়েই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করার প্রথম কারণ পরে ব্যাখ্যা করেন ভারতসচিব মাননীয় মিঃ আমেরী। কমন্স সভায় তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্ট বিলোপ আন্দোলন সম্পর্কেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কার্যতঃ বাংলার বিধানসভায় এই উক্তিরই অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহের জন্যই আমাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরকার এই মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর এই আন্দোলন উপলক্ষে বিনাবিচারে আটক সকল বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী এম, এল, এ এবং মুক্তি আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ১৯৪০-এর আগস্ট মাসের শেষদিকে এই বন্দীদের দেওয়া হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুযায়ী আমাকে সাময়িকভাবে আটক রাখার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে ২৬ ধারা অনুযায়ী স্থায়ীভাবে আটক রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, ২৬ ধারা অনুযায়ী নতুন আদেশ জারি হবার পর সংবাদ আসে যে,ভারতরক্ষা আইনের ৩৮

(৬) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাশ, পৃঃ ১৩৬

ধারা অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আমার মামলা দায়ের করা হয়েছে—মামলার কারণ আমার তিনটি বক্তৃতা এবং আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় লিখিত আমার একটি প্রবন্ধ। দুটি বক্তৃতা আমি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিয়েছিলাম, তৃতীয়টি এপ্রিলের গোড়ার দিকে। আগস্ট মাসের শেষ দিকে ভারতরক্ষা আইনের একটি ধারাবলে সরকার আমাকে স্থায়ীভাবে আটকের ব্যবস্থা করলেন এবং উক্ত আইনেরই অপর একটি ধারাবলে বিচারবিভাগীয় ট্রাইবিউনালে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ক'রে এক অভিনব এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন। শাসনবিভাগীয় হুকুম এবং বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার এইরূপ সম্মেলন ইতিপূর্বে আমি দেখি নাই। এই নীতি সুস্পষ্টরূপে বে-আইনী, অন্যায় এবং সরল ভাষায়, প্রতিহিংসাপরায়ণ। ইহা কাহারও দৃষ্টি এড়াবে না যে, তথাকথিত অপরাধ অনুষ্ঠানের অনেক পরে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।" (৭)

কোন প্রকৃত বিপ্লবীর পক্ষেই এইভাবে নিরুপায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আটক থাকা দুঃসহ। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন বন্দীদশা কখনো তাঁর কাম্য হতে পারে না, কবিগুরু যাঁকে দেশনায়ক বলেছিলেন তাঁর পক্ষে তো নয়ই। হয় মরণ নয় জীবন। সুভাষচন্দ্র অনশনের সঙ্কল্প জানিয়ে চিঠি লিখলেন গবর্ণরকে, মুখ্যমন্ত্রীকে, মন্ত্রিসভাকে: "বর্তমান অবস্থায় জীবন আমার নিকট অসহনীয়। অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে বেঁচে থাকা আমার জীবনের মূল সত্তার বিরোধী।..." (৮)

১৯৪০ এর, ২৯-এ নবেম্বর সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন শুরু করলেন। সরকার জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, ছয়দিনের দিন এলগিন রোডের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, অর্থাৎ গৃহান্তরীণ। চারিদিকে পুলিশ প্রহরা। মামলা যেমন ছিল তেমনই রইল।

এবার শুরু হ'ল বিপ্লবীর নিগড় ছিঁড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রস্তুতি। তিনি বুঝে নিয়েছেন, নিষ্ক্রিয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, লক্ষ্যহীন বামপন্থা, যুদ্ধবাজ বৃটিশরাজের সহস্রচক্ষু প্রহরা, দেশীয় চরের অরণ্য, বৃটিশানুচর লীগ সরকার তাঁর আদর্শোপলব্ধির পরিপন্থী। এদের বেড়াজাল ভেদ করতেই হবে। নিপুণ পরিকল্পনা—কলকাতার প্রহরীবেষ্টিত

(৭) শিশির দাশের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র-এ উদ্ধৃত, পৃপৃঃ ১৩৫-৩৬।
(৮) শিশির দাসের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃঃ ১৫৭।

লগিন রোডের বাড়ি থেকে কাটতে হবে অবাধ পথ : মস্কো ? সাড়া নেই। তালী ? জার্মানী ?—অনিশ্চিত। কিন্তু যেতে হবেই ; "বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" ক অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন—মৌলবী জিয়াউদ্দীন—সুভাষচন্দ্র বসু নন। বেরোলেন ৭ই জানুয়ারি, (৯) ২৬এর আগে জানাই গেল না—সার্থক স্বাধীনতা দিবস—পিঞ্জরাবদ্ধ রয়াল বেঙ্গল টাইগার মুক্ত। অবশ্যই দুর্গম পথ। সাধনা ও সাধকের থ চির দুর্গমই।

চলেছেন মৌলবী জিয়াউদ্দীন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লকের নতা আকবর শা'র যোগাযোগের দায়িত্ব। পাঞ্জাবের শহীদ হরকিষণের ভাই ভগৎরাম পূর্ণ দায়িত্ব নেন। [বিপ্লবী রাসবিহারীর কথা মনে পড়ে] ভগৎরাম পেশোয়ার স্টেশন থেকে জিয়াউদ্দীনকে নিয়ে যান এবং সেখানে দুদিন একটা হোটেলে থাকেন।

আবার নাম বদল, পোষাক বদল। উত্তমচাঁদ বলেছেন, জিয়াউদ্দীন এবার শেরওয়ানী ও ফেজ ছেড়ে নিলেন পাঠানের বেশ, ভগৎরাম হলেন রহমৎ খাঁ—ভাষা পুস্ত। সুতরাং, অতঃপর জিয়াউদ্দীনের মূক বধিরের ভূমিকা। এবার ভগৎরাম, মহম্মদ খাঁ ও একজন গাইডের সঙ্গে মোটরে কাবুল যাত্রা। ড্রাইভার আব্বাস খাঁ অসাধারণ সতর্কতার সঙ্গে এগোন। তারপর গাড়ি চলবার আর পথ নেই। হাঁটা পথ—জিয়াউদ্দীন, রহমৎ—সুভাষ, ভগৎরাম—চলেছেন। উপজাতি অধ্যুষিত একখানি গ্রাম, জোয়ারের রুটি আর চায়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও রাত্রিযাপন। জুটল দুই সশস্ত্র পাঠানও। সকালবেলা চার সঙ্গী আফগান সীমান্ত-লক্ষ্যে চললেন। দ্বিতীয় রাত কাটল এক মসজিদে। তৃতীয় দিন আড্ডাশরীফ গ্রাম। সম্মুখে কাবুল নদ হাঁটাপথ রোধ করে আছে। (১০)

উত্তমচাঁদ বলেছেন, "নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা পাওয়া গেল না, কতগুলি চামড়ার ব্যাগ জেলেদের জালে বেঁধে—সেই অদ্ভুত ভাসমান বাহনে চেপে তাঁরা নদী পার হয়ে গেলেন। কাবুলের উন্মুক্ত আকাশতলে যদি কোন যানবাহন পাওয়া যায় তারই আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।...পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র গাছের তলায়" ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভগৎরাম ওরফে রহমৎ একটা বাক্সে বোঝাই লরী ঠিক করে ডাকতেই সুভাষচন্দ্র ওরফে জিয়াউদ্দীন উঠে পড়লেন এবং

(৯) শিশির বসুর বিবৃতি, ইউ পি'র সংবাদ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র", পৃঃ ১৬১

(১০) শিশির দাসের বই থেকে ভাষান্তরিত, পৃপৃঃ ১৬২-৬৪

"তুষারাবৃত শীতের রাত্রে বিনা গরম পোষাকে তিনি একটা বাক্সের উপর কোনো রকমে বসে রইলেন। মুক্ত প্রান্তর দিয়ে লরীখানি ছুটতে লাগল। মাঝে মাঝে লম্বিত শাখা প্রশাখার আঘাত লাগতে লাগল দেহে, বার বার মাথা নীচু করে সে আঘাত সামলাতে হচ্ছিল।" (১১)

কাবুলে "প্রথমে লরী ড্রাইভারদের হোটেলেই স্থান মিলল। সুভাষচন্দ্রের নিজের ভাষায়—'সারারাত্রি বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া। দরজা খোলা রাখবার উপায় নাই—দরজা বন্ধ করলেই ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়। অবশেষে কতকগুলি শুকনো কাঠ জুটল, আগুন জ্বালিয়ে শরীরটা গরম করা গেল। সন্ধ্যেবেলা ভগৎরাম বাজার থেকে কয়েকটি মোমবাতি এবং কিছু শুকনো রুটি ও কাবাব নিয়ে এল। শুকনো রুটি চিবুতে পারছি না দেখে ভগৎরাম এক কাপ চা নিয়ে এল—চায়ে ভিজিয়ে শুকনো রুটিই খেলাম। এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যেই তিনদিন কেটে গেল।" (১২)

গোয়েন্দাদের উৎপাতও ছিল উত্তমচাঁদ বলেছেন। তবু কাবুলে এসে যোগাযোগের চেষ্টা হ'ল। রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন লাভ হ'ল না, বৃটেনকে তারা চটাতে রাজি নয়। দুবারের চেষ্টাই নিষ্ফল।

এরপর ইতালীয়ান দূতাবাস এবং এই প্রথম সাদর অভ্যর্থনা পাওয়া গেল। তাঁদেরই সাহায্যে জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু বার্লিনের নির্দেশ ছাড়া তাঁদের কিছু করবার নেই। গোয়েন্দাদের তৎপরতা কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তমচাঁদের বাড়িতে এলেন কিন্তু নিশ্চিন্ত হলেন না। অবশেষে বার্লিন থেকে খবর এল; জার্মান দূতাবাসে এলেন। তাঁদেরই পরামর্শে আবার ইতালীয়ান দূতাবাস। তাঁরা একজন কুরিয়ারের অপেক্ষায় আছেন। তারপর ১৯৪১-এর ১৮ই মার্চ এক পাশ-পোর্টসূত্রে সুভাষচন্দ্র-জিয়াউদ্দীন হলেন সিনর অর্লাণ্ডো মাসোটা। নিয়ে যাবার লোকও এল। এল রুশ সীমান্ত, মস্কোর ট্রেন। স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যর্থ চেষ্টা। তারপর মস্কো থেকে বার্লিন ট্রেন। সিনর অর্লাণ্ডো মাসোটা--বাঙলা মায়ের দুলাল সুভাষ—১৯৪১-এর মার্চের শেষেই বার্লিন পৌঁছোলেন এবং হিটলার তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। (১৩)

শপথ করে বলতে পারি, সেকালে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি প্রতিপদে এই পরিশ্রম স্বীকার, অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নেবার, সর্বোপরি,

---

(১১) সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পৃপৃঃ ১৬৪-৬৫
(১২) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাস, পৃঃ ১৬৫
(১৩) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাশ, পৃঃ ১৬৮

চরম দণ্ডের সম্মুখীন হবার যোগ্য ছিলেন ; একাধিকবার স্বল্পকালস্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্যময় বন্দীজীবন যাপনে বাধ্য হয়ে তাঁরা এই স্বদেশের মাটিতেই এমন হাঁফিয়ে উঠেছিলেন যে, একজন বিদেশী লেখক, মসলের কাছে বলতে দ্বিধা করেন নি, উই ওয়্যার টু টায়ার্ড (ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম)। কিন্তু বিপ্লবীর জীবনের প্রকৃতি আলাদা, তার ধাত আলাদা, সেখানে ক্লান্তি নেই। সুভাষচন্দ্র ছিলেন নিখাদ নিরলস অক্লান্ত সর্বক্ষণের বিপ্লবী। তাঁর এই যে বিপজ্জনক পথ পরিক্রমা এ কি শুধু পলায়ন, দেশের আইন, ফাঁসীমঞ্চ, শত্রুপক্ষের ক্রুর দৃষ্টি, যূথবদ্ধ ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা মাত্র ? নিরন্তর বিপ্লবে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সুভাষের পক্ষে তাই কি শেষ কথা ? না, দৃষ্টিসম্মুখে সতত-প্রলম্বিত বন্দী বিষণ্ণ দেশমাতৃকার মুক্তিসাধক সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

কণ্ঠ শোনা গেল। আজাদ হিন্দ্ স্টেশন ডাকছে : "আমি সুভাষ।...অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য যদি ব্রিটেন আজ আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায়—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অপর কোন জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়ও নয় অপরাধও হতে পারে না।" (১৪) [১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধকালে ভারতীয়দের জার্মান সাহায্য সম্পর্কে (ডঃ) ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ~~মন্তব্য~~ স্মরণ করা যেতে পারে।]

হের ফন রিবেনট্রপের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সুভাষচন্দ্র বললেন, 'আমাকে যেন এখান থেকেই বৃটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি 'স্বাধীন ভারত বাহিনী' গড়ে তোলবার সুযোগ দেওয়া হয়।' যুদ্ধ-শেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দাবী করেন। রিবেনট্রপ প্রথম দুটি কাজের সহায়তার আশ্বাস দিলেও স্বাধীনতার প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব দেন না। হিটলার অবশ্য ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তিকে আঘাত হানবার কথা ভাবছিলেন, সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি তাঁকে উৎসাহিতও করল। কিন্তু শেষ প্রশ্নটা অস্পষ্ট থাকলেও সুভাষচন্দ্র প্রথম কাজ প্রথম আরম্ভ করলেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, রুশসাম্রাজ্যবাদীরা, ভারতীয় নেতারা ও ভারতীয় কম্যুনিস্টরা দীর্ঘকাল একতরফা হীন ও জঘন্য নিন্দাবাদে মেতে উঠেছিলেন বটে এবং আজ তার ধার কমলেও একেবারে নির্মূল হয় নি বটে কিন্তু এখন ভারত-বন্ধু জার্মানীর ও জাপানের প্রবক্তারাই লিখিতভাবে স্বীকার করছেন যে, ভারতবর্ষের

(১৪) সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৭

(ভারতের নয়) স্বাধীনতার প্রশ্নে চির-আপোষবিরোধী সুভাষচন্দ্র কখনও জার্মানী, ইতালী অথবা জাপানের সঙ্গে লেশমাত্র আপোষ করেন নি। প্রথমাবধি সমুন্নত শিরে মহাআহবে সম-অংশীদারের দাবী রেখে চলেছেন। জানতেন, প্রথম কাজ প্রথম, প্রথম কাজ—আজাদ বাহিনী গঠন ও প্রচার।

"সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে পৌঁছানর কয়েক দিন পরেই—১৯৪১-এর ২০শে মে কাবুলে অবস্থিত জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে রহমৎ খাঁর নিকট এক জরুরী-বার্তা প্রেরণ করে বলেন,...এক পক্ষ কালের মধ্যেই আমি অক্ষ-শক্তির নিকট থেকে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা আশা করছি। উক্ত ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে আমি বেতারযোগে প্রচারকার্য আরম্ভ করব স্থির করেছি। আমি আশা করি যে, অক্ষ-শক্তি স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ভারতীয় জনগণের অধিকার ঘোষণা করবেন।" (১৫)

দীর্ঘ এই পত্রখানিতে সুভাষচন্দ্র আরও বহু কার্যক্রমের নির্দেশ ও আভাষ দিয়েছেন।

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি জার্মানী কেন তখন দেয়নি তার একটা কারণ যুদ্ধকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এই দিয়েছেন যে, '১৯৪০-এর শেষে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যে চুক্তি হয় [নন-এগ্রেশন প্যাক্ট ও ট্রেড প্যাক্ট] তদনুসারে হিটলার স্ট্যালিনকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, বৃটেন পরাজিত হ'লে ভারতবর্ষে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার জার্মানী মেনে নেবে। সুভাষচন্দ্র হিটলারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতির দাবী জানান ১৯৪১-এর মার্চ মাসে, আর হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন ১৯৪১-এর ২১ জুন।' চার্চিলের মতে এই কারণেই তখন হিটলারের পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। (১৬)

কিন্তু ১৯৪১-এর ২১এ জুন জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণে সম্পূর্ণ অবস্থান্তর ঘটে গেল; রুশো-জার্মান চুক্তি ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল এবং সুভাষচন্দ্রকেই যে কেবল ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্যলাভের আশা ত্যাগ করতে হ'ল তাই নয়, ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্টদেরও 'বদলে গেল মতটা', বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহচররূপে কম্যুনিষ্টরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বুক লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরলেন, নিরস্ত্র আস্ফালনে বদ্ধমুষ্ঠি তুললেন আকাশে,

(১৫) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাশ, পৃপৃঃ ২০২-৩
(১৬) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাশ, পৃঃ ২১০

বিভীষণবাহিনীর ভূমিকায় গৌরবান্বিত ওঁরা বিপ্লবী সুভাষকে বললেন, 'কুইসলিং'। কার্ল মার্কসের নয়, হেগেলের ডায়লেকটিক্স। কোমিণ্টার্ণ আঁকলো শূন্য। ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপানও ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবতীর্ণ হ'লে বিপ্লবের দাবীদার ওঁরা ক'লকাতায় ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর ব্যভিচারের পরিবেশে ওয়াকাই ঘুগিয়ে জাপানকে রুখতে লাগলেন, তারে-বেতারে দিস্তা দিস্তা অপপ্রচারে কণ্ঠভগ্ন করলেন এবং আরও কিছু পরে, ১৯৪৩-এ যুদ্ধোদ্যমের বলিস্বরূপ ডিনায়াল-পলিসির ফল দূর্ভিক্ষের কঙ্কালগুলো সযত্নে শহর-সীমান্তে ঠেকিয়ে রেখে রঙ্গমঞ্চের রঙিন আলোয় গণ-নাট্টাভিনয় করতে লাগলেন ঐ কঙ্কালগুলোকে ব্যঙ্গ করেই।

১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট অবধি যখন একদিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিষ্ক্রিয়তা এবং অপর দিকে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর নৃত্যের তালে তালে কম্যুনিষ্টদের নির্বীর্য আর্তনাদ চলেছে তখন সুভাষচন্দ্র কি করলেন? সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতিটির সিংহাবলোকন করে দুটি কার্যক্রম সামনে রাখলেন (১) বার্লিন বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতবাসীদের উদ্দেশে প্রচার; (২) ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সংগ্রহ ক'রে একটি স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন। আর জার্মানীতে প্রবাসী ভারতীয়দের সহযোগিতায় জার্মান সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে "ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার" বা "স্বাধীন ভারত কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করলেন। এর জন্য যে অর্থব্যয় হবে 'ঋণ' হিসেবে তা জার্মান সরকার বইতে রাজি হ'লেন; ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে ঐ ঋণ পরিশোধ করা হবে। জার্মান সরকার সুভাষচন্দ্রকে টাইগার্টেন (Tiegarten)-এ একটি বাড়ি ও ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি দিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ভাতা ৮০০, সেণ্টার বা কেন্দ্রবাবদ ১২০০, পরে ৩২০০ পাউণ্ড বরাদ্দ হয়। স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী গঠন বাবদ ব্যয় আলাদা। ১৯৪১-এ ২রা নবেম্বর এরই এক সভায় এর নীতি ও সদস্যদের অবশ্য পালনীয় নিয়মকানুন গৃহীত হয়, পরস্পরকে সম্বোধন জ্ঞাপনে 'জয়হিন্দ্' ধ্বনি দেওয়া স্থির হয় এবং সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যে-বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হ'ল তা যাতে ভারতের শ্রোতারাও শুনতে পান এজন্য জার্মান সরকার একটি বিশেষ তরঙ্গের মাধ্যমে 'আজাদ হিন্দ্ রেডিও' প্রবর্তন করেন। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু, ফারসী, পুস্তু, বাংলা, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি ও মারাঠি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ত। এর প্রচার সময় শেষ পর্যন্ত তিন ঘণ্টা হয়েছিল। ১৮ বৎসর ইউরোপ-প্রবাসী সাংবাদিক এ সি এন নাম্বিয়ার এই প্রচারকার্য সংগঠন করেন। (১৭)

(১৭) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাস, পৃঃ ২১৩-১৪

সুভাষচন্দ্র-জিয়াউদ্দীন-অর্লাণ্ডো মাসোটা-নেতাজী সাবমেরিনে সিঙ্গাপুরে পৌঁছোনো পর্যন্ত এই বেতার-প্রচার সমানে চলেছে। নেতাজীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বক্তৃতার রেকর্ড চালিয়ে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

মিশর ও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে বহু ভারতীয় সেনা জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁরা স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীতে (আজাদ হিন্দ্ ফৌজে) ভর্তি হবার জন্ত আগ্রহান্বিত হ'য়ে ওঠেন। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন এই বাহিনীতে যাঁরা স্বেচ্ছায় যোগ দেবেন তাঁদের সংখ্যা হবে ৪০০ ; এলেন ৪০০০ ; এঁদের মধ্যে কটি ভাগ হ'ল : প্যারাসুটিস্ট (ছত্রাবতরক), ইনফ্যান্ট্রি (পদাতিক), ক্যাভালরি (সওয়ার), মেকানাইজড কোর (যান্ত্রিক রণসম্ভারবাহী যান)। তাদের সমরশিক্ষা দেওয়া হয়েছিল মেসার্ৎস (Mesertz) শিবিরে অথবা কোনিসবার্গ (koenigsburg) শহর শিবিরে। কোন অস্ত্রশিক্ষাই বাদ ছিল না। এঁদের পাঠ্যের মধ্যে ছিল ভারতের ও বিশ্বের ইতিহাস, ভারতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ও তার পরবর্তীকালের সংগ্রামেতিহাস, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের জীবন-কথা, বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের গাঁথা। (১৮)

সুভাষচন্দ্র নিজে রণবিজ্ঞান শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে হিটলার তাঁকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে গিয়েও সেনাপতিদের কাছ থেকে পাঠ নেন। তারপর ইউরোপে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে মনোনিবেশ করেন। লাম্সডর্ফ ক্যাম্পে অথবা আফ্রিকার সাইরেনিকায় বহু ভারতীয় সৈন্ত বন্দী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাঁদের কাছে যান। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধেই কিছু বাছাই সৈন্য জার্মানীর আনাবুর্গ ক্যাম্পে আনা হ'ল। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল জার্মানবাহিনী যেমন স্ট্যালিনগ্রাদ জয় করে উজবেকিস্থান ও আফগানিস্থানে এগোবে ভারতীয় বাহিনী তেমনি আরও একটু এগিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ ঘাঁটি বিপর্যস্ত করে দেবে। কিন্তু ভারতীয় বন্দীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা স্ব স্ব পদ-মর্যাদা নিয়ে ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে দিলে সুভাষচন্দ্রের পরামর্শক্রমে তাঁদের, অন্তত্র অপসারণ করা হয় এবং সাধারণ সেনাদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় বাহিনী গড়ে তুললেন। প্রথম সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হ'ল ফ্রাঙ্কেনবার্গে। সৈন্ত সংখ্যা ৬০০। সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনায় সদর দপ্তর এল কোনিসবার্গে।

এই সময় জার্মানবাহিনী একদিকে রুশ দেশে অন্য দিকে আফ্রিকায় প্রবল বেগে এগোচ্ছে, একই সময় পূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডে জাপানও তেমন বেগে এগিয়ে চলেছে। নেতাজীর মাথায় নতুন পরিকল্পনা এল। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, কলকাতা এই তিন

(১৮) সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পৃপৃঃ ১৭২-৭৪

জায়গার ওপরই এই অঞ্চলে বৃটিশ শক্তির অস্তিত্ব নির্ভর। তিনি এই অঞ্চলে যোগা-যোগ স্থাপনে সচেষ্ট হ'লেন। এই অঞ্চলে রাসবিহারী বসু, সত্যানন্দ পুরী, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, আনন্দ মোহন সহায়, জ্ঞানী প্রীতম সিং প্রমুখ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন ও সুযোগ খুঁজছিলেন। জাপান যখন প্রশান্ত মহাসাগরে চমকের পর চমক সৃষ্টি করে চলেছে জার্মানী থেকে সুভাষচন্দ্র এবং টোকিও থেকে রাসবিহারী ভারতবাসীকে ক্রিপ্‌স মিশন বয়কটের আহ্বান জানালেন।

দুই বাঙালী বিপ্লবী—দুই বসুর কণ্ঠ মিলল ব্যোম দেশে এবং আঘাত করল ভারতবর্ষের আকাশকে। দুটি হৃদয় এখনও দূরে দূরে। মিলনের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করলেন, "ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ।" সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ঘোষণা করলেন, "স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খোলাখুলি ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'ভারতবাসীর জন্যই ভারতবর্ষ' এই উক্তি যে তিনি করেছেন তা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিদের ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবেই লিখিত থাকবে।

"১৯৪২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর গুপ্ত বেতার স্টেশন থেকে ঘোষণা করলেন—'আমি এতদিন ধৈর্য্যের সঙ্গে ঘটনা-পরম্পরা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এইবার আঘাত করবার সময় এসেছে। আমাদের সকলের সাধারণ শত্রুকে ধ্বংস করতে যারা আমাদের সাহায্য করবে, এই সংগ্রামে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে, আমরা তাদের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করব।' এর পরই নেতাজী সুভাষচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।" জাপান শুনে খুশি হয়। বৃটেন শুনে ক্ষেপে যায়। অমনি ভারতের ভেতরে-বাইরে বৃটিশচরেরা নেতাজীকে জার্মানীর চর ব'লে প্রচারের ঝড় তুলল। সুভাষচন্দ্র বেতারে এর জবাব দিলেন হেসে।

জাপান প্রস্তাব করল—জার্মানী, ইতালী ও জাপান একসঙ্গে মিলে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। জাপান নেতাজীকে জাপানে আসবার আমন্ত্রণও জানালো। নেতাজী আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং হিটলার ও মুসোলিনীও যাতে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন সে-চেষ্টা আরম্ভ করেন। হিটলার ও মুসোলিনী তখনও জাপানের প্রস্তাবে সায় দিলেন না। নেতাজী রোমে কাউন্ট চানোর সঙ্গে দেখা ক'রে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করলেন। মুসোলিনী রাজি হ'লেন। গোয়েবেলসের কথায় সায় দিয়ে হিটলার রাজি হলেন না।

"নেতাজী হিসাব করে দেখলেন, এখন এশিয়াতে গেলেই আশা অনেক বেশী—কারণ, পূর্ব এশিয়ায় ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্য তিনি পাবেন। ইতিমধ্যেই রাসবিহারী বসু ভারতীয়দের সেখানে অনেকটা সংগঠিত করেছেন এবং তাঁরাও সেখানে যাবার জন্তই তাঁকে ডাক দিয়েছেন।" (১৯)

এরপর নেতাজীর সংগ্রাম-সহচর মেজর জেনারেল শাহ্‌ নওয়াজ খানের [অতি সংক্ষিপ্তাকার] বয়ানে আমার বৃত্তটা টেনে শেষ করি : (২০)

"আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হ'বার পর 'ইয়াকুরো কিকন' নামক জাপানী মিলন সঙ্ঘের [মানে, লিয়েজঁ বা যোগাযোগ বিভাগের] (Liaison Department) অধ্যক্ষ জেনারেল ইয়াকুরো জাপ গবর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে বলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাহায্য ও নেতৃত্ব ছাড়া সত্যিকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা সম্ভব নয়। নেতাজীকে বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুরে আনবার ব্যবস্থা করতে তিনিই তাঁর গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে বলেন—এই বিপদসঙ্কুল পথে সুদূর বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুরে আসা নেতাজীর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আসতে গেলে জীবিতাবস্থায় পৌছানর সম্ভাবনা মাত্র পাঁচ।...এ কথা শুন্‌বার পরও ইয়াকুরো লিখে পাঠান...পূর্ব এশিয়ায় তাঁর নেতৃত্ব ব্যতিরেকে জাপানীদের ভারতীয় স্বাধীনতার জন্ত কোন কিছু করা একেবারে অসম্ভব।...বার্লিনের জাপানী রাজদূত নেতাজীর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা তাঁকে খুলে বললেন।...তিনি [নেতাজী] বললেন এরূপ করতে গিয়ে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহ'লে তিনি ভারতের মুক্তির জন্ত প্রাণ দিলেন এই তৃপ্তি নিয়ে সেই মৃত্যুবরণ করবেন। (পৃপৃঃ ১৩৬-৩৭)

"বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়—এরপর তিনি একটা জার্মান সাবমেরিণে চড়ে ম্যাডাগ্যাস্‌কার উপকূল পর্যন্ত আসেন। এদিকে একখানা জাপানী সাবমেরিণ পেনাং (মালয়) থেকে ভারত মহাসাগরের পথে ওখানে গিয়ে হাজির হয় তাঁকে আনতে। সেখান থেকে এই জাপানী সাবমেরিণে চড়ে তিনি পেনাং-এ এসে পৌছান, সেখান থেকে বিমানযোগে যান টোকিওতে।" (পৃ ১৩৭)

মৃত্যুকে তুচ্ছ করে অপরিসীম আস্থায় কে এই ঝুঁকি নিতে পারেন বা নিয়েছেন বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ছাড়া? বাক্যবাগীশদের খণ্ডে খণ্ডে বই আছে অনেক, এমনতর একটিও কাজের আখর নেই;

"মিঃ রাসবিহারী বসু এই সময়ে সিঙ্গাপুরে ছিলেন। ১৯৪৩ সালের ৩রা জুন

(১৯) মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শিশির দাশ, পৃঃ ২২৭।
(২০) আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ ও নেতাজী ১৩৫ পৃঃ থেকে।

তিনি টোকিওয় নেতাজীর সঙ্গে দেখা ক'রে সিঙ্গাপুরে আনার জন্য যাত্রা করেন। যাওয়ার আগের দিন রাত্রে মিঃ বোস কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারকে বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করেন। যখন মিঃ বোসের টোকিও যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তখন তিনি তার উত্তরে বললেন,—'আমি আপনাদের জন্য একটি উপহার আনতে যাচ্ছি।'

"১৯৪৩ সালের ২০শে জুন তারিখে টোকিও রেডিও ঘোষণা করে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র এখানে এসে গেছেন।" (পৃঃ ১৩৭)

টোকিওয় এক প্রেস বিবৃতিতে সুভাষ বলেন,…"বহুযুগ ধরে আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে যে শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় বসে ছিলাম—আজ তাই এসে গেছে।…এখন হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে।… যে শত্রু আমাদের অস্ত্রাঘাত করেছে—অস্ত্রাঘাতই তার প্রত্যুত্তর। অহিংস অসহযোগকে আজ হিংসাত্মক সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

"১৯৪৩ সালের ২১শে জুন নেতাজী প্রথম টোকিও থেকে বেতারে বক্তৃতা করেন।" (পৃঃ ১৩৮)

ঐ বক্তৃতায় তিনি ভারতবাসীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আমাদের স্বাধীনতায় আপোষের কোন স্থান নেই।" (পৃঃ ১৪১)

"নেতাজী ঠিক কোন সময় সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছবেন সে কথা সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট অসামরিক ব্যক্তিগণকে অবশ্য সে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

"১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দুই এঞ্জিন বিশিষ্ট একখানি জাপানী বিমান এসে আমাদের সামনে বিমানঘাঁটিতে নামল।…কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্লেনের দরজা খোলা হ'ল, নেতাজী বেরিয়ে এলেন।…মিঃ রাসবিহারী বোস, কর্ণেল ইয়ামামোটা…এই বিমানে এসেছিলেন। (পৃঃ ১৪২)

"গৌরবব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে খাড়া হয়ে মাথা তুলে মধুর স্মিতমুখে নেতাজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন।…আমরা তাঁর দিকে চেয়ে ভাবছিলাম—হাঁ, এইবার আমরা আমাদের ঠিক নেতা পেয়েছি—ইনিই আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে পারবেন। (পৃঃ ১৪৩)

"পরদিন ১৯৪৩ সালের ৩রা জুলাই নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবৃন্দ এবং হংকং, ব্রহ্মদেশ, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশ থেকে আগত ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্যদের নিয়ে একটা সভা করলেন।" (পৃপৃঃ ১৪৩-৪৪)

"১৯৪৩-এর ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে ক্যাথে সিনেমা ময়দানে (শাহ্ নওয়াজ

বলেছেন বিল্ডিংয়ে) পঞ্চাশ হাজার ভারতীয়ের সমক্ষে (শাহ্‌ নওয়াজের মতে এক বিরাট্‌ সভায়) শ্রীরাসবিহারী বসু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সম্পদ "ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ' ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র সম্পূর্ণ নেতৃত্ব দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়ে বলেন ঃ "আমি আপনাদের জন্য এই উপহার নিয়ে এসেছি। এই আমাদের নেতাজী। ভারতের যা শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম সম্পদ, তারই প্রতিভূ সুভাষচন্দ্র। যা প্রিয়তম,যা পরম গতিশীল, তিনি তার প্রতীক।

"বন্ধুগণ আজ আমার জীবনে এক পরম আনন্দ-মুহূর্ত। আজ আপনাদের কাছে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে উপস্থিত করেছি। পূর্ব-এশিয়ার বিশ লক্ষ ভারতীয় যে স্বতঃস্ফূর্ত ও উদ্দীপনাময় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন তা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এক নিঃশর্ত আশ্বাস স্বরূপ ; আর আমার এবং ভারতের পক্ষেও এ এক আনন্দক্ষণ যে পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়গণ সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন।...আমি বিশ্বাস করি, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আপনারা সংগ্রাম ও জয়ের পথে এগিয়ে যাবেন। আর আমি প্রতি মুহূর্ত আপনাদের পাশে থেকে সংগ্রামের দুঃখকষ্ট ও গৌরবের সমভাগী হবো ও জয়ের আনন্দ বোধ করবো। আপনারা জানেন, নিজের স্বল্প সামর্থ্যানুযায়ী আমি মাতৃভূমির সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। জীবনে এই-ই আমার পরম উদ্দেশ্য। যতদিন পর্যন্ত আমার এই এই দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমি ভারতীয় আজাদীর সৈনিক থাকবো। আমাদের আসন্ন সংগ্রামে আমি সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দেবো, সেজন্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না।...আগামী যে সংগ্রামে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা, বিজয় ও গৌরব অর্জিত হবে, সে সংগ্রামে নিজেদের বিলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হোন। (২১)

বাঙলার বিপ্লব সাধনার যে বৃত্ত তার শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর হাত থেকে সসম্ভ্রমে দায়িত্ব গ্রহণ করে নানা কথার মধ্যে বললেন, "স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আপনাদের অনেক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণা, অনিদ্রার কষ্ট, দুর্গম পথে অভিযান, এমন কি মৃত্যু বরণ করতে হতে পারে। এই সব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই মিলবে আপনাদের স্বাধীনতা। আমি জানি—আপনারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আপনাদের দরিদ্রা পরাধীনা দেশমাতার উদ্ধার সাধন করবেন।" (২২)

---

(২১) বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, শ্রীশান্তিকুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃপৃঃ ৫২-৫৩

(২২) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী, পৃঃ ১৪৫-৪৬

১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা চারদিকে ঘোষণা করা হ'ল। আনুষ্ঠানিক প্যারেডে নেতাজী বললেন,"যে সিঙ্গাপুর একদিন ব্রিটিশের গর্ব্বের বস্তু ছিল—সেইখানে—সেই সিঙ্গাপুরে আমাদের ফৌজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

"বন্ধুগণ, সৈন্যগণ,—আপনাদের রণধ্বনি হবে—দিল্লী চলো, চলো দিল্লী।... ব্রিটিশ শাসনের অপর মহাশ্মশান পুরাতন দিল্লীর লাল কেল্লায় গিয়ে বিজয়-প্রদর্শনী না করা পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে না।" (২৩)

৬ই জুলাই জেনারেল তোজো নেতাজীকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং এই আশ্বাস দেন যে, জাপানীরা সর্বপ্রকারে তাঁদের সাহায্য করবে।

১৯৪৩-এর ২৫এ আগস্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪৩-এর ২১এ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা হ'ল। রাসবিহারী বসু সবাইকে স্বাগত জানালেন, কর্ণেল চ্যাটার্জি সেক্রেটারির রিপোর্ট পাঠ করলেন। নেতাজী আনুগত্যের শপথে বললেন, "আমি, সুভাষচন্দ্র বসু, ভগবানের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করব।"

আরও সবাই আনুগত্যের শপথ নিলে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা পাঠ করলেন। (২৪)

এইভাবে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হ'ল: প্রধান পরামর্শদাতা রাসবিহারী বসু; রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী—সুভাষচন্দ্র বসু, অর্থসচিব—লেঃ কঃ এ সি চ্যাটার্জি; আইন পরামর্শদাতা—এ এন সরকার; নারী সংগঠন বিভাগের মন্ত্রী—ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন; প্রচারমন্ত্রী—এস এ আয়ার; সশস্ত্রবাহিনী প্রতিনিধি—লেঃ কঃ এন এস ভগত, লেঃ কঃ জে কে ভোঁসলা, লেঃ কঃ গুলজারা সিং, লেঃ কঃ এম জেড কিয়ানি, লেঃ কঃ এ ডি লোগনাথন, লেঃ কঃ ইশান কাদের এবং লেঃ কঃ শাহ্ নওয়াজ; পরামর্শদাতৃমণ্ডলী—করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি এম খান, ওয়াই এলেপ্পা, জে থিবি এবং সর্দার ঈশ্বর সিং। (২৫)

---

(২৩) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী, পৃঃ ১৪৭
(২৪) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃপৃঃ ১৫৯-৬০
(২৫) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃপৃঃ ১৬৩-৬৪

১৯৪৩-এর ২৫এ অক্টোবর বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল।

জাপানের ফিল্ড মার্শাল তেরায়ুচি কতকগুলো যুক্তি দেখিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধে নিবৃত্ত রেখে জাপানীদের যুদ্ধ করবার পরামর্শ দেন; নেতাজী এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেন, "জাপানীদের সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ হলে সে হবে পরাধীনতার চেয়েও অধিকতর ঘৃণ্য। মণিপুরের যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতারই যুদ্ধ—সুতরাং, এ যুদ্ধে জাপানীদের আগে যেতে দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের পিছনে থাকার কোন মানে হয় না—এ জাতীয় মর্যাদার হানিকর। আসন্ন যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজই আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর অগ্রণী হ'য়ে প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে—ভারতের পবিত্র ভূমিতে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম রক্তবিন্দু দেবে ভারতীয়রা।" (২৬)

তেরায়ুচি রাজি হলেন। ১নং গেরিলা রেজিমেণ্ট গঠিত হ'ল। শাহ্ নওয়াজ হ'লেন কম্যাণ্ডার। সুভাষচন্দ্রের বার বার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সৈন্যেরা এর নাম রাখলে 'সুভাষ ব্রিগেড'। পরে ব্রিগেডটিকে নতুন ক'রে গড়া হয়।

মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ খান তাঁর বইয়ে বলেছেন, নেতাজী ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, "তাতে তিনি আজাদ হিন্দ দলের উর্দ্ধতন কর্মচারী ও সৈনিকদের বলেন যে, তিনি হচ্ছেন ফকির—সৈনিকদের সাজিয়ে দেবার মত বন্দুক, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন প্রভৃতি রণসরঞ্জাম তাঁর কিছু নেই, সৈন্যদের আরামে, বিলাসে রাখবার মত টাকা পয়সাও তাঁর নেই। বলেছেন—'দিল্লী অভিযানে আমি তোমাদের দিতে পারি—শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্টসাধ্য অগ্রগতি, অবশেষে হয়ত মৃত্যু······তোমরা দেশের জন্য রক্ত দাও, তবেই দিতে পারব দেশের স্বাধীনতা।

"সেনারা জবাব দিয়েছিলেন, 'নেতাজী, আমরা রক্ত দিলে যদি দেশ স্বাধীন হয় তবে সে রক্ত আমরা দেব, এত রক্ত দেব যে তাতে সমতল-ভূমি প্লাবিত হয়ে যাবে।'

"১৯৪৪ সালের এপ্রিল ও মে মাসে তাঁরা তাঁদের সে সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন; আজাদ হিন্দের প্রায় ৪০০০ সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সর্ব শ্রেণীর লোক একই উদ্দেশ্যে, একই অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেদের দেহের শোণিতে মণিপুরের রণক্ষেত্রে রক্তগঙ্গার সৃষ্টি করেছেন।

(২৬) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী, পৃঃ ১৬৮

"আই-এন-এ হিপ্‌নটিজম"

বাঙলার বিপ্লব সাধনা ইম্ফল রণাঙ্গনে ব্যর্থ হবার পরও ইতিহাসের এই এক কৌতুক যে, তারই কয়েকটা তড়িৎ ঝিলিক দেখে স্বয়ং গান্ধীজী বলেছিলেন, ও হচ্ছে 'আই-এন-এ হিপ্‌নটিজম'—'আই-এন-এ স্পিরিট'।

লেখনী আর চলে না, মাথায় সর্বক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণা—হৃদয়ে—তবু লিখে যাই।

প্রণাম জানাই চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল গোলন্দাজ বাহিনীর মনকুমার বসু ঠাকুর, নন্দকুমার দে, দুর্গাদাস রায় চৌধুরি, নিরঞ্জন বড়ুয়া, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ফণীভূষণ চক্রবর্তী, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কালিপদ আইচ ও নীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। বিচার হ'ল বাঙ্গালোরে ১৯৪৩, ৫।৬ আগস্ট, ফাঁসী হ'ল মাদ্রাজ পেনিটেনসিয়ারি বধ্যভূমিতে (১৯৪৩, সেপ্টেম্বর ২৭); ইতিপূর্বে আরও ছ'জনের ফাঁসীতে পবিত্র বধ্যভূমি।

মনকুমারদের অপরাধ ছিল রাজানুগত্যের খেলাপ, সেনাবাহিনী ছেড়ে যাবার প্ররোচনা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রচার, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিনাশ ইত্যাদি। এঁদের সঙ্গী আরও তিনজনের।

বধ্যভূমি কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল মৃত্যুঞ্জয়ীদের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ও 'জয়হিন্দ' ধ্বনিতে।

কেঁপে উঠেছিল বোম্বে কলকাতার ডকগুলোও। প্রথমে কৃপণ সংবাদ: লস্করেরা নাকি ধর্মঘট করেছেন। এই কার্পণ্যের কারণ, লণ্ডনে ঘোষণা হয়েছে তিনজন বৃটিশ মন্ত্রী নাকি আসছেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করতে, তখনকার দিনের এই ছিল মস্ত খবর। তবু গোপন করা গেল না। বে-সরকারী সংবাদমতে 'তলোয়ার' জাহাজের লস্কর ধর্মঘট অন্যত্রও ছড়িয়ে গিয়ে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি ধর্মঘটীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০০০। কেবল তাই নয়, বন্দরের 'রইনে'র (রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির) জাহাজগুলোও তীরবর্তী সংস্থাগুলোর ধর্মঘটীদের প্রতি সমর্থনের সঙ্কেত জানিয়েছে। রিয়াল এডমিরাল র‍্যাটরে ধর্মঘটী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন, ধর্মঘটীরা অফিসার কম্যাণ্ডিংএর পদচ্যুতি দাবী করেন, তাঁর অবমাননাকর আচরণই ধর্মঘটের আশু কারণ। মূলে রয়েছে অখাদ্য খাবার পরিবেশন ও দুর্ব্যবহার; 'রইনে'র ২০,০০০ লোকেরই রয়েছে এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন। কাউকে কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বোম্বের প্রধান প্রধান রাস্তায় মিছিল বেরোয় (১৯৪৬,

১৮ ফেব্রুয়ারি)। ১৯এ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিকটবর্তী মাঝেরহাটে রাজকীয় 'হুগলী' জাহাজে যে ৫০০ লস্কর শিক্ষানবিশী করছিলেন তাঁরাও এই দাবীতে ধর্মঘট করেন যে, বোম্বের ধৃত লস্করকে মুক্তি দিতে হবে; তাঁর অপরাধ—তিনি শিবিরে 'জয় হিন্দ' 'কুইট ইণ্ডিয়া' লিখেছিলেন। তাঁর নাম বি সি দত্ত বা বলাইচন্দ্র দত্ত, 'তলোয়ার' জাহাজের। 'ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং' যখন 'স্যালিউটিং বেস' (সেলাম বেদী) দেখতে এসেছিলেন তখন দত্ত ঐ বেদীতে 'জয় হিন্দ' ও 'কুইট ইণ্ডিয়া' লিখছিলেন। দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর কে সিং নামে আরও একজনের মুক্তির দাবী ছিল কিন্তু তিনি জেলেই থাকেন। তবে যাঁর জন্য এক্ষুণি ধর্মঘট হয়েছিল তাঁকে বদলি ক'রে আর একজন বৃটিশ অফিসার আনা হ'ল।

কোলাবায় ছিল 'রইনে'র ভারতে বৃহত্তম বেতার কেন্দ্র, ধর্মঘটের ফলে সেখানে কাজের ব্যাঘাত ঘটলই, ক্যাসল ব্যারাক এবং ফোর্ট ব্যারাক বন্দরের অনেক জাহাজেও ধর্মঘট বিস্তারলাভ করেছিল। ব্যারাক দুটো ছিল সংবাদগ্রহণ কেন্দ্র।

ধর্মঘটীরা মেসে খাবার খেতে অস্বীকার করলেন এবং রিয়াল এডমিরাল র‍্যাটরেকে বললেন, তাঁদের দাবী না মেটা পর্যন্ত তাঁরা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। ধর্মঘটীদের কেউ কেউ 'তলোয়ারের' পরিচিতি চিহ্ন পতাকাদণ্ড থেকে নামিয়ে ত্রিবর্ণ পতাকা তুললেন। তারপর স্থির হয়, ধর্মঘট প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত কোন পতাকাই থাকবে না। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এলেন; ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ থাকবে শুনে চলে গেলেন।

কিন্তু বিক্ষোভ চলতেই থাকল। ২০এ ফেব্রুয়ারি ভরোসা ও বোম্বে শহরতলীর নানা নৌ সংস্থা থেকে লোকাল ট্রেনে লস্করেরা এত সংখ্যায় আসতে লাগলেন যে চার্চগেট স্টেশনের সামনে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ালো ২০০০, হাতে হাতে ত্রিবর্ণ কংগ্রেস পতাকা, কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনি। আন্ধেরি থেকে ট্রেনে আসতে সারা পথ ধ্বনি দিয়েছেন, বৃটিশ সেনাদের টিট্‌কারি দিয়েছেন। স্টেশনে জমায়েত ধর্মঘটীরা মিছিল ক'রে ওভাল গেলেন, বক্তৃতা হ'ল; তেমনি শান্তভাবে 'তলোয়ারে' এসে জমলেন। কেন্দ্রীয় ধর্মঘটী কমিটির প্রেসিডেন্ট সবাইকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বললেন। ধর্মঘটীরা আরও দাবী রাখলেন, 'রইনে' ভারতীয় আড্ডাগুলোয় উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করতে হবে, আই-এন-এর লোকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য তুলে আনতে হবে।

অবস্থাটা ঘোরালো ক'রে তোলবার জন্য 'তলোয়ার'-এর নৌ-সেনাধ্যক্ষ

ঘোষণা করলেন, বিকেল সাড়ে তিনটের মধ্যে সব লস্করকে ব্যারাকে ফিরে আসতে হবে, না এলে বা কাউকে বাইরে পাওয়া গেলে গ্রেপ্তার করা হবে। ঠিক সাড়ে তিনটায় গেটও বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। "তলোয়ার" অফিসের সামনে ১৮ মারাঠা রেজিমেণ্ট তলব করা হ'ল। লস্করদের যাঁর যাঁর ব্যারাকে যেতে বলা হ'ল। বেশীর ভাগই মেনে নিলেন, যাঁরা মানলেন না তাঁদের লরীতে তুলে নিয়ে অফিসে আনা হল। ছয় লরী ভারতীয় সেনা জায়গাটা টহল দিয়ে ফিরতে লাগল ও যাঁরা রাস্তায় ঘুরছিলেন তাঁদেরও তুলে নিয়ে গেল।

পরদিন ধর্মঘট চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ২২এ ফেব্রুয়ারি প্রথম পৃষ্ঠায় ধর্মঘট সম্পর্কে তিন তিনটি বড় সংবাদ বেরোলো :

(১) করাচীতে গুলী চালনা : কামানের গর্জনে লস্করদের পাল্টা জবাব।

(২) বোম্বেতে বৃটিশ সেনাদের সঙ্গে গুলী-পাল্টাগুলী ; ধরপাকড় এলাকায় বিমান ও নৌশক্তি বৃদ্ধি ; বোম্বে অভিমুখে রাজকীয় নৌবাহিনী রওনা দিয়েছে বলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।

(৩) কলকাতায় লস্কর-ধর্মঘট ; অবস্থা অপরিবর্তিত ; আরও দাবী উত্থাপন ; মাদ্রাজী লস্করদের সমব্যথী বিক্ষোভ। দ্বিতীয় সংবাদটি ছিল তিন কলামব্যাপী ; আবার এই তিনটি সংবাদের মাথায় ছিল সাতকলামব্যাপী : লস্করদের দখলে কুড়িটি জাহাজ ও অস্ত্রাগার।

এছাড়া, আরও তিনটি 'টপ' সংবাদ ছিল : আর-আই-এ-এফ (রাজকীয় ভারত বিমান বহর)-এর কর্মীদের সমব্যথী ধর্মঘট ; লস্কর ধর্মঘট দিল্লীতে বিস্তৃত ; বোম্বে জনতার ওপর পুলীশের গুলী : এযাবৎ ছ'জন হতাহত।

মোদ্দা সংবাদ হ'ল, "হিন্দুস্থান" জাহাজের ধর্মঘটীদের ওপর মিলিটারি পুলিশের গুলী চালনা ; ভারতীয় লস্করেরা দুটি নৌ-কামান থেকে পাল্টা জবাব দেন ; ন'জন আহত হয় ; লস্করেরা চরম সতর্কবাণী দেন : "আমাদের দাবী যদি ছ'টার মধ্যে না পূরণ করা হয় আমরা মিলিটারির ওপর গুলী চালাবো। তাঁদের প্রধান দাবী : মিলিটারী হটাও। ধর্মঘটীরা জাহাজে কংগ্রেস ও লীগ পতাকা ওঠান।

করাচীতে 'চমক' 'হিমালয়' ও 'বাহাদুর' জাহাজের ১৫০০ লস্কর ২১এ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট করেন। কয়েকশত ধর্মঘটী কিয়ামারি থেকে রাস্তা বরাবর বিক্ষোভ ক'রে যান। 'চমকে' ভারতীয় ভাষায় লেখা : বিদ্রোহ নয়, ভারতীয় সেনাদের ঐক্য। সশস্ত্র লস্করেরা জাহাজ থেকে নামতে গেলে মিলিটারি পুলিশ গুলী চালায়। হাসপাতালে ভর্তি আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪। সর্বত্র বৃটিশ প্যারাট্রুপ (ছত্রাবতরক)

মোতায়েন করা হয়; অসামরিক পুলিশের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। মিলিটারির গুলীতে দু'জন লস্কর মারা যান। করাচীর সদর-দপ্তর মিউলস ম্যানসন্স ও 'রইনে' জাহাজগুলোর পতাকাগুলো অর্ধনমিত করা হয়। লস্করেরা যাঁর যাঁর আস্তানায় ফিরে এলে 'হিন্দুস্থান' তাঁদের সম্পূর্ণ দখলে আসে এবং কোন অফিসারকে কাছে ঘেঁষতে দেন না। তবে সামরিক ও অসামরিক পুলিশ বন্দরের সব লঞ্চগুলোর দখল নেয়। ত্রিবাঙ্কুর জাহাজের লস্করেরাও ধর্মঘটে যোগ দেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী কমন্স সভায় (২১এ ফেব্রুয়ারি) ঘোষণা করেন, রাজকীয় নৌবহর (রয়াল নেভির) কিছু জাহাজ বোম্বে রওনা দিয়েছে; পক্ষান্তরে, বোম্বে বন্দরে ফ্ল্যাগশিপ 'নর্মদা'সহ ২০টি জাহাজ রয়েছে ধর্মঘটীদের দখলে; ক্যাসল ব্যারাকে যে প্রচুর পরিমাণ গুলীগোলা ছিল তাও ধর্মঘটীরা হস্তগত করেছেন। মিলিটারি এ ব্যাপারে বাধা দিতে গেলে অবাধ গুলী পাল্টা গুলী চলে। এক শান্তি মিশনের সৌজন্যে তার বিরতি হয়। ভারতীয় ডোগরা রেজিমেণ্টের জায়গায় আসে গোরা সৈন্য এবং আরও নতুন সৈন্য। ভারতীয় লস্করদের হাতেও ছিল প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, পাকা ঘাঁটি গেড়েছেন ক্যাসল ব্যারাকে; গোরা সৈন্যেরা প্রস্তুত রয়েছে প্রধান ফটকে এবং দু' একটি মোক্ষম জায়গায়। মাঝে মাঝে উভয় পক্ষে গোলা-গুলী চলেছে। ক্যাসল ব্যারাকে যখন এই রকম যুদ্ধাবস্থা তখন আন্যান্য অস্তানায় লস্করেরা শান্ত রইলেন। অবশ্য মিলিটারি পাহারা অপসারণ না করা অবধি তলোয়ারের ১৫০০ লস্কর খাবার খেতে অস্বীকার করলেন। গোরা সৈন্যেরা সে কথায় কর্ণপাত করল না। দ্বিপ্রহরে দুই পক্ষে দারুণ গুলীবর্ষণ হ'ল। লস্করেরা বৃটিশ সেনাদের লক্ষ্য ক'রে হাত বোমা ছুঁড়লেন, বৃটিশ সেনারা মেসিনগানের গুলী। ৩০ মিনিট ধরে প্রবল বর্ষণ; গোলাগুলীর রকমে অনুমান, হতাহতের সংখ্যা বেশ বেশি রকমই হয়েছে; কিন্তু কোন হিসেব পাওয়া যায় নি। লস্করদের হস্তগত জাহাজ থেকে এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হ'ল, বৃটিশ সেনা অপসারণ না করলে গুলী চলবে।

আবার "শান্তি মিশনের" হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বিরতি—শান্তি মিশনে একজন কংগ্রেসীও ছিলেন, কে জানা যায় নি। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। ওঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির খান সাহেব ধর্মঘটীদের সতর্ক ক'রে দিলেন, বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিলে তাঁরা সাধারণের সহানুভূতি হারাবেন। গুলীগোলা ঘরে আবদ্ধ রাখা হ'ল বটে, ধর্মঘটের বিরতি হ'ল না।

বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুর হ'য়ে ইম্ফল রণাঙ্গন অবধি নেতাজীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম

সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্পষ্টতই সম্পূর্ণ নীরবতার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দও তাই,কেবল দু'একজন মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্রকে তলোয়ার নিয়ে প্রতিরোধ করবার অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন,ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রকে যথাসাধ্য কলঙ্কিত করে সীমান্ত থেকে বহুদূরে মুষ্টিবলে জাপানকে রুখেছিল। বোম্বে, করাচী, কলকাতা,মাদ্রাজ বন্দরে লস্করদের ধর্মঘট সম্পর্কে নিয়ন্ত্রিত খবর পরিবেশন ক'রে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বিলাত থেকে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছিলেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বৃটিশ মন্ত্রীত্রয়ের আগমন-বার্তায় আপোষে আশান্বিত হয়ে লস্কর ধর্মঘটকে এক বিঘ্ন গণ্য করছিলেন, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিও ঐ ধর্মঘট থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলছিলেন। তিন দিন কেটে যাবার পর সর্বগ্রাসী শিখা যখন ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত তখন কংগ্রেসের নামে কেউ কেউ এলেন শান্তির ললিতবাণী নিয়ে। গবর্ণরকে সেক্রেটারি মারফৎ এই সদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হ'ল। অন্য দিকে সশস্ত্র বৃটিশ সেনারা ইস্পাতের টুপি মাথায় ধর্মঘট-অঞ্চলে টহল দিতে লাগল ; রাজকীয় নৌসেনা ক্যাসল ব্যারাকের প্রবেশমুখ ও ভারতের প্রবেশদ্বার সম্মুখে বিস্তারিত মহাসাগর পাহারা দিতে লাগল।

কারা নাকি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে একটা আপোষ-মীমাংসার জন্য ধরেছিলেন। আসফ আলির মধ্যস্থতায় প্যাটেল বোম্বের গবর্ণরের ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ স্যার অকিনলেকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কর্তৃপক্ষ নাকি প্যাটেলকে আশ্বস্ত করলেন। সর্দার প্যাটেল এক দিকে লস্করদের শান্ত থাকতে বললেন, আর এক দিকে জনসাধারণকে হরতাল করতে নিষেধ করলেন (২২এ ফেব্রুয়ারি)।

কলকাতার খবর, "হুগলীর" ৪০০ লস্করের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটে তিন দিনে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। "হুগলী" ধর্মঘটীদের দাবী ছিল রাজকীয় নৌবহর ও রাজকীয় ভারত নৌবহর এবং সেনাদের মধ্যে বৈষম্য কেন থাকবে। যেখানেই যখন লড়াই হয়েছে সেখানেই তাঁরা সমান দক্ষতায় লড়েছেন। সুতরাং, খাবার ঘরে হোক, খেলামাঠে হোক, রেস্তোরাঁ বা অন্যত্র হোক, বৈষম্য চলবে না ; (২) "তলোয়ারের" বি সি দত্তের দণ্ড নিঃশর্তে হ্রাস করতে হবে ; (৩) বোম্বে, করাচী ও অন্যত্র নৌ-আস্তানাগুলো থেকে সান্ত্রী ও সৈন্য হটিয়ে নিতে হবে ; (৪) বোম্বেতে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে হবে (৫) ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না, (৬) সবাইকে এক বেতন, এক ভাতা, এক সফরখরচ দিতে হবে ; (৭) নৌসেনাদল দ্রুত ভেঙে দিয়ে সম্মান সুযোগে সকলের পুনর্বাসন করতে হবে ; (৮) সুখাদ্য পরিবেশন করতে হবে।

মাদ্রাজে 'আদিয়ার' জাহাজের লস্করেরা সম্যবধী ধর্মঘট করলেন। তাঁরা কতক

গুলো দাবীও পেশ করলেন। আন্ধেরীর রাজকীয় বৈমানিক ও শিবিরের মেরিন ড্রাইভের এক হাজার বিমান কর্মী ধর্মঘট করে বসলেন এবং আটক থাকতে চাইলেন না ; ফলে লাঠিচালনা হ'ল, ছ'জন শিবিরবাসী আহত হলেন ; তবু তাঁরা মিছিল করে বৃটিশ-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে হর্ণবি রোড ও অন্যান্য এলাকা দিয়ে ঘুরে এলেন। নয়াদিল্লীতে "ইণ্ডিয়া" জাহাজের ও ব্যারাকের লস্করেরা ধর্মঘট করলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'ল।

কিন্তু এত যে কাণ্ড, নিদারুণ বৈপ্লবিক-সম্ভাবনাপূর্ণ এই অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ, কাণ্ডারীহীন নৌকোর মত, সব কিছুর শোচনীয় ভরাডুবি হয়ে গেল। সমস্ত সংগঠিত দলগুলো বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রগড় দেখল এবং "আক্কেল" দেখল। বৃটিশ সেনারা সক্রিয় হয়ে উঠল। গুলী চলল। মৃত্যু—৪০ ; পুলিশও নিক্রিয় রইল না, হতাহতের সংখ্যা অজ্ঞাত। মিলগুলোর শ্রমিকেরা বেরিয়ে এলেন ; মিছিল করলেন ; যানবাহন বিপর্যস্ত ; ছাত্রেরা হরতাল করলেন ; ১৪৪ ধারা জারি হ'ল, এবং কারফ্যু। কিন্তু 'কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত ?'

(বৃটিশ) রয়াল নেভি (রাজকীয় নৌবহর), বিমান বহর বোম্বেতে এসে গেল, ইস্পাতের টুপি মাথায় বৃটিশ সেনারা বেয়নেট খুলে হর্ণবি রোড, ফোর্ট এলাকায় তৎপর হয়ে উঠল। জি আই পি, বি বি এণ্ড সি আই রেল কারখানা ও অন্যান্য, কারখানার শ্রমিকেরাও বেরিয়ে এলেন। শহরের পুলিশ বার বার গুলী চালালো, কমসেকম ২০ বার—কলবাদেবী, ভুলেশ্বর, গিরগাঁও, ফোর্ট এলাকার মাটি আকাশ কেঁপে উঠলো। বিপ্লব ? বিপ্লব কাকে বলে ?

—কিন্তু না, নিরুপায় ভারতীয় লস্করেরা সর্দার প্যাটেলকে জানালেন. তাঁরা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করবেন। ধর্মঘটীরা কংগ্রেস, লীগ, কম্যুনিষ্ট পার্টি —সকলের কাছে আবেদন রাখলেন।

সর্দার প্যাটেল বললেন, অস্ত্র সম্বরণ কর, হাতের অস্ত্র ফেলে দাও, আত্ম-সমর্পণের সব বিধি মেনে চলো। প্রতি-বিপ্লব ? প্রতি-বিপ্লব কাকে বলে ?

ধর্মঘটীরা তাঁদের আবেদনে বলেছিলেন, পাঁচদিন ধরে আমরা শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট চালিয়েছি, কর্তৃপক্ষ লেশমাত্র কর্ণপাত করেননি। পক্ষান্তরে, তাঁরা সৈন্ত এনেছেন, গোরা সৈন্য, কেন না, তাঁরা আর ভারতীয় সৈন্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা ক্যাসল ব্যারাকে আমাদের ওপর গুলী চালিয়েছেন, আমাদের আত্মরক্ষায় অস্ত্র ব্যবহারে বাধ্য করেছেন ; ফ্ল্যাগ অফিসার এখন সমূহ ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছেন, সাম্রাজ্যের অমিত শক্তি তিনি সমবেত করেছেন। কোন দেশপ্রেমিক ভারতীয়

নিশ্চয়ই আমাদের এই অবমাননাকর শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বলবেন না অথবা বলবেন না আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের সামনে নতজানু হই। হ্যাঁ, আপোষ-আলোচনায় রাজি আছি। ভারতের জনসাধারণ এবং আমাদের সম্মানিত নেতারা যদি আমাদের সাহায্যে না আসেন তবে ফ্ল্যাগ অফিসার তাঁর হুমকি কার্যে পরিণত করবেন। হে জাতীয় কংগ্রেস, হে মুসলিম লীগ, হে কম্যুনিস্ট পার্টি। বোম্বের রক্তস্নান থেকে রক্ষার জন্য আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করুন, নৌ-কর্তৃপক্ষকে গুলী চালনা বন্ধ রেখে আমাদের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় বসান।

এক মহাভারতীয় বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কি করুণ পরিণতি। ইম্ফলের আশ্চর্য পুনরাবৃত্তি।

সর্দার প্যাটেল বললেন, কে যে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তাতো জানিনে, সুতরাং, কি হবে ওসব কথা তুলে? চাই শান্তি। কেউ হরতাল ডাকবেন না। মিলের শ্রমিকেরা। তোমরা কাজে ফিরে যাও। ছাত্রেরা। স্কুল কলেজে গিয়ে বোসো (ফেব্রুয়ারি ২৩)। মিঃ জিন্নাও এই কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করলেন।

তারপর? করাচীতে দুই পক্ষে গুলীচালনার মধ্যেই "হিন্দুস্থান" জাহাজের লস্করেরা আত্মসমর্পণ করলেন। বৃটিশ ছত্রাবতরকেরা (প্যারাট্রুপার্স) জাহাজ দখল করল। বন্দর এলাকা দখল করল। শহর হরতালে নিঝ্‌ঝুম। মহাশ্মশানের নিস্তব্ধতা।

কলকাতার বৈমানিকেরা বোম্বের বৈমানিকদের ওপর লাঠিচালনার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করলেন ২২-এ ফেব্রুয়ারি। ছাত্রেরা বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলী কমন্স সভায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কমে কিছু গ্রাহ্য নয়। কংগ্রেস, লীগ, কম্যুনিষ্টরা সাহায্য করছেন।

বোম্বে ও করাচীতে তখন মিলিটারি-রাজ, সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে; ২৫০ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১৩০০; ২৩ ফেব্রুয়ারি তিন লক্ষ শ্রমিক বেকার; বোম্বের রেল অচল আর শহরতলীময় অগ্নিদাহ। করাচীর ইদগা ময়দানে জনতার ওপর পুলিশ গুলী চালালো; ব্রিটিশ প্যারাসৈন্য প্রস্তুত; ২৩ তারিখেই 'হিমালয়', 'বাহাদুর', 'চমকে' অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

ভারত-ভাগ্য-বিধাতার কপালে বিজয়ী প্রতিবিপ্লব শবাধারের শেষ পেরেক ঠুকে দিল।

আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ। ধর্মঘট কমিটি সঙ্কেত দিলেন, জাহাজে জাহাজে এবং রাজকীয় নৌবহরের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং-এর "শর্ত" মতই-আত্মসমর্পণ। ক্যাসল ব্যারাকের ভেতরে যাঁরা অবরোধ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা একই সঙ্গে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

২৩-এ ফেব্রুয়ারির প্রত্যূষে বন্দরের জাহাজে জাহাজে কা-লো আ-ত্ম-স-ম-র্প-ণে-র পতাকা। বৃটিশ জয়ধ্বনির মধ্যে ভাইস-এডমিরালের ফ্ল্যাগশিপ 'নর্মদায়' ভাইস-এডমিরাল গডফ্রের পতাকা উত্তোলিত হ'ল।

এই শ্মশানের শান্তিতে অবশেষে মহাত্মা উৎকীর্ণ করলেন তাঁর স্বাক্ষরিত ছি-ছি বাণী: [অনবদ্য ইংরাজিটা দিতে পারলেই ভাল হ'ত]

"অত্যন্ত বেদনাময় উৎকণ্ঠায় আমি ভারতের চলমান ঘটনাগুলো লক্ষ্য করেছি। এই নৌ বিদ্রোহ (মিউটিনি) * এবং তার জের, কোন অর্থেই অহিংস কাজ নয়। একজনকেও যদি 'জয় হিন্দ্' অথবা লোক-প্রচলিত কোন ধ্বনি দিতে বাধ্য করা হয় তো ভারতবর্ষের কোটি কোটি মূক জনসাধারণের স্বরাজের সমাধি রচনা করা হয় (ঠিক ইংরাজিটা আছে কফিনে বা শবাধারে পেরেক ঠোকা হয়)। গীর্জার বিনাশসাধন বা অনুরূপ কাজ কংগ্রেসের সংজ্ঞামত স্বরাজের পথ নয়। লুণ্ঠন, ট্রাম-গাড়ি কি অন্য কোন সম্পত্তির অগ্নিদাহ, ইউরোপীয়ানদের অবমাননা ও আঘাত করা কংগ্রেসী ধরণের অহিংসা নয় আমার অহিংসা তো দূরের কথা—যদি আমার অহিংসা থেকে কংগ্রেসের অহিংসা কিছু পৃথক হয়েও থাকে। এই বিবেচনাহীন হিংসোন্মত্ততার জানা অজানা চালকেরা কি করছেন তা আগে জানুন এবং তারপর সে পন্থানুসরণ করুন। একথা যেন না কেউ বলে যে, কংগ্রেস মুখে পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেছে অহিংসপথে স্বরাজ অর্জনের কথা কিন্তু কাজ করেছে অন্য রকম। এবং তাও কোন সময়? জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটক্ষণে। আমি ইচ্ছে করেই বিবেচনাহীন শব্দটা ব্যবহার করেছি। কেননা, বিবেচনা-প্রসূত হিংস কাজও আছে। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা বিবেচনাপ্রসূত নয়। নৌ-বহরের ভারতীয় কর্মীরা যদি অহিংসা কি তা জানেন ও উপলব্ধি করে থাকেন তবে অহিংস প্রতিরোধ মর্যাদাপূর্ণ, পুরুষোচিত ও ফলপ্রসূ হতে পারে—যদি তা সংহত হয়। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে এ সর্বদাই তাই। নিজেদের ও ভারতবর্ষের পক্ষে যদি অবমাননাকরই হয় তবে তাঁরা সে কাজে রয়েছেন কেন? আমি ঐ রকম কাজই অহিংস অসহযোগ বলেছি। যা হচ্ছে তা করে তাঁরা ভারতবর্ষে এক কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন।

"হিংসার উদ্দেশ্যে হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্যের জোটবাঁধা অধার্মিকতা—সম্ভবত এ পারস্পরিক হিংসোন্মত্ততার প্রস্তুতি এবং সেদিকেই নিয়ে যাবে। এ ভারতবর্ষের পক্ষে বিশ্বের পক্ষে, অকল্যাণ।"[c]

এ ভূমিকা মাত্র, কিন্তু পটভূমিকাটা কি?

---

* 'মিউটিনি' শব্দটি মহাত্মাই প্রথম ব্যবহার করলেন।

"বর্তমান শাসকেরা ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূলে অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। বুকের ভেতর যে দুঃসহ অসন্তোষ সংগুপ্ত রয়েছে তার অভিব্যক্তি যেন ঐ অভিলাষের প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। তাঁদের শক্তি প্রশ্নাতীত। নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে-শক্তির ব্যবহার অসমীচীন এবং এ যদি জনদমনের জন্য হয় তবে তা খলবুদ্ধিও। এই জনগণ বহুকাল বিদেশী পদানত রয়েছে।" (ফেব্রুয়ারি ২৪)

তথাপি ভারতবর্ষ জুড়ে সংগুপ্ত অসন্তোষের অভিব্যক্তি ঘটতেই লাগল। লাহোরে ৪০০ বৈমানিক কর্মে বিরতি দিলেন। মাদ্রাজ মীনামবাকাম বিমানঘাঁটিতে ২০০ বৈমানিক ধর্মঘট করলেন। 'সারকাস্‌স' জাহাজের ৬০০ লস্কর ধর্মঘট করলেন, কংগ্রেস পতাকা নিয়ে মিছিল করলেন, ধ্বনি দিলেন 'জয় হিন্দ', 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' [এবং মারাত্মক।] 'নেতাজী কী জয়'। আম্বালার ৬০০ নন-কমিশন্‌ড অফিসার বৈমানিক বৃটিশ-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে গেলেন, বললেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কথা।

মিলিটারি পুলিশ তাই বলে হাত গুটিয়ে নেই। বোম্বেতে মিলিটারি ও পুলিশের গুলীতে সাকুল্যে মৃতের সংখ্যা হ'ল ২১০, আহতের সংখ্যা ১০১৭, ধৃতের ১০০০।

সর্দার প্যাটেল ছাত্রদের আবার হরতালে নিবৃত্ত থাকতে বললেন, গান্ধীজী আবার নিন্দাবাণী উচ্চারণ করলেন, নেহরুজী যুক্তপ্রদেশে নির্বাচন-সফরে বেরিয়ে ছিলেন, বিঘ্নসৃষ্টিতে বোম্বে এসে গেলেন (ফেব্রুয়ারি ২৫)। মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ২৭০।

মহাত্মা দ্বিতীয় ফরিয়াদ করলেন :

"আই-এন-এ'র সম্মোহন (হিপনটিজম) আমাদের ওপর পড়েছে। নেতাজীর নামে যাদু আছে। তাঁর দেশপ্রেম কারও চেয়ে কম নয় (আমি ইচ্ছে করেই বর্তমান কাল ব্যবহার করলাম)। * তাঁর সমস্ত কাজ বীর্যবত্তায় উজ্জ্বল। তিনি উচ্চাশা করেছিলেন, আশাহত হয়েছেন। কে না আশাহত হয়েছেন? আমাদের লক্ষ্য উঁচুই হবে, ভাল লক্ষ্য। সবারই কপালে সাফল্যোদয় হয় না। আমার প্রশংসা ও বিস্ময় এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কারণ আমি জানি, তাঁর কাজের মধ্যেই ব্যর্থতা নিহিত ছিল। তিনি যদি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিজয়ীবেশেও ভারতবর্ষে আনতেন আমি একথাই বলতাম; কেননা, জনসাধারণ এই পদ্ধতিতে তাদের সত্তা উপলব্ধি করতে পারত না।

* কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট-পদে সুভাষের জয়ে ও পট্টভি সীতারামায়ার পরাজয়ে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন, আর যাই হোক, তিনি দেশের শত্রু নন। তারপর একদিন সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেছিলেন; বহিষ্কার-প্রস্তাব তাঁরই রচনা।

"নেতাজী ও তাঁর ফৌজ আমাদের সামনে যে পাঠ নিয়ে এসেছেন তা আত্মত্যাগ, শ্রেণী-সম্প্রদায়নির্বিশেষে ঐক্য ও শৃঙ্খলা। আমাদের শ্রদ্ধা যদি শুভ ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন হয় আমরা এই ত্রি-গুণ নিষ্ঠার সঙ্গে লালন করব কিন্তু তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে বলপ্রয়োগ (হিংসা) পরিহার করব।" (ফেব্রুয়ারি ২৫)

আর ঘটনা-বিবৃতির ইচ্ছা আমার নেই; অতঃপর যে বিচার-প্রহসন হয়েছিল এই অতি সংক্ষেপিত বইখানিতে তার গ্লানিকর উল্লেখে প্রবৃত্তিও নেই। একজন হোক, বহু জন হোক, বৃটিশ ফরিয়াদের প্লেণ্ট, চার্জশীট, আমাদের এক স্বদেশবাসী বা দেশ-বাসীরাই তুলে দিয়েছেন—কেননা, নমস্য তাঁরা, বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিলাষ প্রকাশে উল্লসিত হয়েছেন। সুতরাং, নিজের হাতে গড়া হাতকড়ি নিয়ে আমরা কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ স্যার ক্লড অকিনলেকের বেতার-প্রচার মর্মে গেঁথে ব্যর্থতার ইতিহাস শেষ করি:

২৫এ ফেব্রুয়ারি রাত: "পাইকারীভাবে শাস্তি হবে না, প্রতিহিংসা নয়। অথবা নির্বিচার প্রতিশোধ নয় কিন্তু মূল পাণ্ডাদের ও অন্যান্তের (?) শাস্তি পেতে হবে। যেখানে শাস্তি প্রাপ্য সেখানে শাস্তি না দেওয়া অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া।" মহাত্মার ভাষ্যে এ যে মিউটিনি।

কোন রকম দ্ব্যর্থ না রেখে বৃটিশ-সেনা-সর্বাধিনায়ক বললেন, "আমি এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে, সেনাবাহিনীতে সাম্প্রতিক পরিতাপজনক ঘটনাবলীর পশ্চাতে ছিল রাজনীতি। কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ হিসেবে, কোন অবস্থাতেই, রাজনীতির সঙ্গে আমার লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই; আমি ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক কুচক্র বরদাস্ত করব না।"

না, অন্তত একজন বলেছিলেন, না, এ ঠিক হচ্ছে না, বেছে বেছে লোক নিয়ে দল-সর্দার (রিং লিডার) বলা আর তাদের শাস্তি দেওয়া—এ কেন? সেই একমাত্র ব্যক্তি হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। 'তিনি বলেছিলেন, কতকগুলো আশু ঘটনা অবশ্য অবস্থাটা এমন চরম পর্যায়ে এনেছে, কিন্তু এর মূল অনেক গভীরে। ভারতীয় লস্করেরা কোনক্রমেই নিকৃষ্ট না হয়েও বৃটিশ নাবিকদের সমমর্যাদা ও ব্যবহার পায়নি; ১৫০ বছর ধরে এই চলে আসছে। তাঁরা জাতীয় অপমানবোধেই ধর্মঘট করেছেন (ফেব্রুয়ারি, ২৭)।

না, না, না, সর্দার প্যাটেল বললেন, যারা জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব ও রাজনৈতিক চেতনার সুযোগ নিয়ে ভ্রান্তপথে নিয়ে যেতে চায় ভারত-বর্ষের মানুষ যেন তাদের কথায় বিপথগামী না হন। তিনদিন ধরে অরাজকতা

চলেছে, তারপর চলেছে মিলিটারির গুলী, নিরীহ লোক মরেছে। এখন আত্মানুসন্ধান দরকার। যারা হাঙ্গামার সময় বীভৎস অপরাধ ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি পেতেই হবে। ৩০০ লোক মারা গেছে ১০০০ আহত হয়েছে। কিসের জন্ম এই লোকক্ষয়? কংগ্রেস যেখানে বিদ্রোহের আহ্বান জানায়নি সেখানে লোকে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের কথা ভাবে কি করে? কংগ্রেসসেবী বলে পরিচয় দিলেও কেউ যেন তার কথায় কর্ণপাত না করে। একমাত্র কংগ্রেসই পারে নেতৃত্ব দিতে (ফেব্রুয়ারি ২৭)।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বললেন' হ্যাঁ, তাই তো। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বলপ্রয়োগের (মহাত্মার ভাষায়=হিংসার) কোন প্রয়োজন নেই। তবে সেনা-সর্বাধিনায়কের একথাটাও যথার্থ নয় যে, সেনানীদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কোন আগ্রহ থাকবে না। মানি, তারা রাজনীতির উর্ধে থাকবেন। কিন্তু এ তো তা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন আসছেন। চাই, শান্তিপূর্ণ মীমাংসা (ফেব্রুয়ারি ২৮)।

এই "হাঙ্গামার" জন্য কারা দায়ী সর্দার প্যাটেল তাও আবিষ্কার করলেন; ৪২-এ যাঁদের ওঁরা সাম্রাজ্যবাদী-সহচর বলে অপাঙ্‌ক্তেয় করেছিলেন, সেই "কম্যুনিষ্টদের"ই হঠাৎ এই অভ্যুত্থানের নায়ক করে দিলেন।

লাহোরের ছাত্রেরা বললেন, অত কথা জানি নে, আই-এন-এ'র ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দীনের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, আমরা তার প্রতিবাদ করি। পাঞ্জাব গবর্ণরের গাড়ির গতিরোধ করা হ'ল, বনেট থেকে ইউনিয়ান জ্যাক উধাও হয়ে গেল (ফেব্রুয়ারি ২৮)। কলকাতার কাছে যে বিমান বহরের ১০ নং স্কোয়াড্রন (দল) টি ছিল, তাঁরা বললেন, আমাদের আনুগত্য বৃটিশ সরকারের প্রতি নয়, ভারতবর্ষীয় জনগণের প্রতি। সুতরাং, দেশের মৌলিক স্বার্থ-বিষয়ে অভিমত প্রকাশের অধিকার তাঁদের আছে (ফেব্রুয়ারি ২৮)।

কিন্তু সব প্রবক্তার মাথার মণি তখনও কোহিনূরের অধিকারী বৃটিশ-রাজ (অস্তাচলগামী, তবু, সর্বময়)। সবার ওপর তারই কণ্ঠস্বর। সুতরাং, ঝেঁটিয়ে গ্রেপ্তার করা হ'ল কমসেকম ৩৯৬ জন লস্করকে (রিং-লিডার)। সোজা মুলান্দ ক্যাম্পে বন্দী।

আরও কাউকে কাউকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা হ'ল; কত, সে সংখ্যা অপরিজ্ঞাত।

সাতটি তদন্ত পর্ষদ গঠিত হ'ল।

অনেক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'; তার একটিতে ছিল ঃ বংশপরম্পরাক্রমে সযত্নে যে প্রাচীর গড়া হয়েছিল মহাকাল সেসব ধ্বসিয়ে দিচ্ছে; তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বিচারপতি স্যার সৈয়দ ফজল আলি তদন্তে বসলে প্রথম সাক্ষী লেঃ কঃ মালিক বললেন, "লস্করদের বিক্ষোভের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ঃ আই-এন-এ সমর্থন-প্রবণতা, রাজনৈতিক প্রচার, কবে সেনাদল ভেঙ্গে দেওয়া হবে তার অনিশ্চয়তা ও অফিসারদের নেতৃত্বাভাব। ১৯৪৫-এই অসন্তোষের বাতাস বইতে সুরু করে। হিন্দু লস্করেরা ছিলেন কংগ্রেসের প্রবল সমর্থক; 'তলোয়ারে' কম্যুনিকেসান (যোগা-যোগ) শাখায় অধিকাংশ লস্করই ছিলেন শিক্ষিত যুবক।" তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন তাঁরা ছিলেন আই-এন-এ-সমর্থক; কেননা, তাঁদের ধারণা ছিল, কংগ্রেস ও সারা দেশ আই-এন-এ সমর্থক। কি রকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের প্রতি ব্যবহার করা হ'ত লস্করেরা অশ্রু-সজল চোখে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

'রইন'-এর ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং ভাইস এডামিরাল জে এইচ গডফ্রেও বলেছিলেন, এই বৈষম্য উড়িয়ে দেবার নয়।

"হুগলী"র মাস্টার-অ্যাট-আর্মস শাহ্ নওয়াজ লস্করদের বর্তমান দুরবস্থা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ স্বীকার করে বললেন, কে বললে, এ মিউটিনি? মিউটিনি হচ্ছে রাজদ্রোহ, আর এ হচ্ছে অভিযোগ জানানোর ধর্মঘট, ষড়যন্ত্র করে নয়, স্বতস্ফূর্ত।

পেটি অফিসার পি সি পি নায়ারও বললেন, মিউটিনি তো নয়, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট।

কমোডোর জেফোর্ড অবশ্য বললেন, অর্ধশিক্ষিত (মানে, ম্যাট্রিক পাশ) লস্করেরা নির্বিবেচক রাজনীতিকদের সহজ শিকার। এরাই মিউটিনির শক্ত আশ্রয়। কিন্তু যারা ম্যাট্রিক নয়, তারা সংবাদপত্র পড়ে' ধোঁকায় পড়ে না। তাঁর ধারণা কম্যুনিষ্টরা ঢোকবার প্রয়াস করেছে। এক সি, আই, ডির লোক তাঁকে বলেছেন, তিনি যখন আকবরে তখন জনা-ত্রিশেক কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন লোক ঢুকে পড়েছিল। এ মিউটিনি এবং পূর্বপরিকল্পিত। একই সঙ্গে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ পতাকা তুলে ধরায়ই তার আভাষ পাওয়া যায়।

"হুগলীর" কম্যাণ্ডিং অফিসার লেঃ কম্যাণ্ডার ওয়েবষ্টারের মতেও রাজনীতিই মিউটিনির কারণ।

পূর্বোপকূলের স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার লেঃ কম্যাণ্ডার বি জে পিনার মনে করেন, কাগজে যদি 'তলোয়ার'-এর মিউটিনি সংবাদ না বেরোতো "হুগলীর" লস্করেরা বিদ্রোহ করতেন না।

পক্ষান্তরে, "কলাবতীর"-প্রাক্তন কম্যাণ্ডার লেঃ কম্যাণ্ডার এ কে মুখার্জি বলেন, বৃটিশ লস্করেরা ভারতীয় চীফ ও পেটি অফিসারদের গালমন্দ করত, রয়াল নেভির লোকেদের রক্ষিতাদের বা তাদের জারজদেরও চিকিৎসার সুযোগ থাক্‌লেও ভারতীয় লস্করদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই।

তদন্ত যে পর্যায়েই থাক্, দণ্ডদান আরম্ভ হ'য়ে গেল! মূলান্দে আটক ৩৬২ জনের মধ্যে ৩১২ জনের বিচার হ'ল; ৪২ জনকে অযোগ্য ব'লে কার্ড ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ৬০ জনকে সরাসরি বরখাস্ত করা হ'ল, ৮৪ জনকে ১৪ দিন থেকে তিন মাস অবধি কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল; কারাদণ্ড মানে, চাকরীও খতম। একজন লস্করকে অবমাননার মধ্যে পদচ্যুত করা হ'ল। ৫০ জনের মামলা মুলতুবি রইল।

এ কিন্তু ফজল আলি কমিশনের তদন্ত ফল নয়; ও এক উদ্ভট জিনিস। কমিশন চলা-অবস্থায়ই ঐ কাণ্ড।

কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে "তলোয়ারের" ধর্মঘটকালীন ভারপ্রাপ্ত অফিসার লেঃ সুরেন্দ্রনাথ কোহ্‌লি বলেন, "তলোয়ারেই" প্রথম ধর্মঘট হয়, তারপর তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। (তিনি কিন্তু মিউটিনি বললেন না, বললেন, স্ট্রাইক) তলোয়ারে ধর্মঘটের সদ্য কারণ দত্ত নামে এক টেলিগ্রাফিস্টের গ্রেপ্তার ও মুক্তি। রাজনৈতিক শ্লোগান লেখা ও ইস্তাহার বিলির জন্য তাঁকে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধর্মঘটের প্রথম দিন লস্করেরা খাবার খেতে অস্বীকার করেন। দত্তকে গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়। দত্তর অপরাধ ছিল, তিনি দেওয়ালে 'জয় হিন্দ' লিখেছিলেন।

এই "তলোয়ারেই" ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এক ভারতীয় লস্কর জীবনে বিতৃষ্ণ হ'য়ে আত্মহত্যা করেন। কী সে জীবন? টেলিগ্রাফিস্ট হেলমেস তার অনেক বর্ণনা দিলেন। একজনকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার দরুণ বার বার শাস্তি দেওয়া হ'ল; পীড়ার ভাণ করছেন এই অজুহাতে জনৈক ব্যানার্জিকে দুমাস সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল; বার বার জেল খেটে জ্যাকসন নামে এক লস্কর পাগল হ'য়ে গেল; অন্তত হাজারো নিরীহ লস্করকে অকারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে; একজন কম্যাণ্ডার এমনই নির্দয় ছিল যে তাকে সবাই কসাই ব'লে ডাকত; সইতে না পেরে কম্‌সেকম ৩০ জন পালিয়ে গেছে, যারা যায়নি তাদের জেলে যেতে হয়েছে; একজন লস্কর কঠোর দণ্ডের মুখোমুখি হয়ে মাস্তলে উঠে যান প্রাণ বিসর্জন দেবেন ব'লে; আর একজন সত্যিই আত্মহত্যা করলেন; লেঃ ম্যাকটাভিস লস্করদের 'জারজ' (বাস্টার্ড) ব'লে ডাকতেন। কম্যাণ্ডার কিং তাঁদের বলতেন, কুকুরের বাচ্চা, কুলি, জংলি।

আশ্চর্য নয়, বঞ্চিত বুকের বহু সঞ্চিত ব্যথা 'আই-এন-এ'র সম্মোহনে বা নেতাজী-প্রেরণায় উৎপীড়িত লস্করদের মধ্যে ফেনিয়ে উঠেছিল এবং দত্তের হাতে দেওয়ালে লিখন পড়েছে,'কুইট-ইণ্ডিয়া','জয়হিন্দ'। তাঁর সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন, যেখানে পনেরো কি কুড়ি জন থাকতে পারেন সেখানে তাঁদের ৫০ জনকে ঠাসাঠাসি রাখা হয়েছিল। টেলিগ্রাফিস্ট রহমত খাঁ বলেছেন, পেটে যন্ত্রণা সারাবার জন্য একজন ইংরাজ ডাক্তার গোলাম হোসেনকে সারাটা অঙ্গন ছুটিয়েছেন ; ফলে হোসেন যখন পড়ে যান তখন তাঁর দেহে প্রাণ নেই। পাঁচ জন লস্কর বলেছেন, একজনকে হাতকড়ি দিয়ে স্টীম চেম্বারে চার ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল, তিনি অচেতন হয়ে পড়েন।

বি সি দত্তকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। 'তলোয়ারে' তাঁর লকারে পাওয়া যায় কিছু ইস্তাহার ও কাগজপত্র। এগুলো কমিশনের সামনে দাখিল করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল অশোক মেহতা লিখিত "১৮৫৭-এর ভারতীয় বিদ্রোহ (মিউটিনি)", আই-এন-এ রিলিফ ফণ্ড নামে ২০৬ টাকার রসিদ, আজাদ হিন্দ প্রতিজ্ঞাপত্রের একটি কপি এবং 'থট্ ফর দি ডে' (আজকের ভাবনা) শিরোনামায় একটি ইস্তাহার। তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় ইংরাজিতে লেখা ছিল 'হুইস-ক্যাম', মানে কি ? কমিশন জানতে চেয়েছিলেন, দত্ত বলেছিলেন, হুইসপারিং ক্যাম্পেন (কানে কানে কথা)।

তিনি বলেছেন, যখন আগস্ট আন্দোলন সুরু হয়, তিনি ভারতে ছিলেন না, কিন্তু কাগজে পড়েছিলেন এবং খুশি হয়েছিলেন।

সশস্ত্র সেনাবাহিনী যদি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিত তিনি খুশি হ'তেন। সিঙ্গাপুরে থেকেও তিনি যদি আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিতে না পারতেন বিষণ্ণ হতেন। লেঃ পাওয়ার তাঁকে এসব প্রশ্ন করছিলেন। নৌ-দিবসে সারা 'তলোয়ার' জুড়ে এই সব ধ্বনি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল : বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, কুইট ইণ্ডিয়া ; শ্বেত কুকুরগুলোকে হত্যা করো। খাবার সম্পর্কে নালিশ ছিল ; কিন্তু সে সব তুচ্ছ, দরকার রাজনীতির, সুতরাং রাজনৈতিক ধ্বনির (শ্লোগানের)। "তিনি কম্যুনিস্টদের প্রশংসা করতে পারেন নি ; কেন না, তারা দেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। সাক্ষ্যের তারিখ ১৭ই মে।

কম্যাণ্ডার কিং কি বললেন ? বললেন, সব ঝুটা। আসল হচ্ছে, রাজনৈতিক, হ্যাঁ, বৈপ্লবিক প্রচার। আমি করেছিটা কি ? দত্তকে গ্রেপ্তার করেছি ; গ্রেপ্তারের ফলেই যত সব উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

তলোয়ারের ডিভিসানাল অফিসার লেঃ এস.এম নন্দা বলেন, 'মিউটিনি'র যখন অবসান ঘটানো হ'ল তখন, তিনি ও কয়েকজন লস্কর সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা

করেন। সর্দার প্যাটেল তাঁদের বলেন. লস্করেরা ধর্মঘট করে প্রকাণ্ড ভুল করেছে। তাঁদের কোন মঙ্গলই এতে হয়নি। নন্দ বললেন, কংগ্রেসের নামে লস্করদের আত্মসমর্পণ করতে বলায় তিনি অত্যন্ত লাঞ্ছিত বোধ করেন—কংগ্রেস তার দীর্ঘ ইতিহাসে কখনো তো বৃটিশ রাজের কাছে আত্মসমর্পণের কথা ভাবে নি।

এ সাক্ষ্যের তারিখ ২২এ মে;

ধর্মঘটের পর কিয়ামারি বন্দরে ৩০০ লস্করকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; ৩০ জনের নানা মেয়াদে কারাদণ্ড হয়। বেশীর ভাগ ছাড়া পান। ১১ জনকে বিচারে খাড়া করা হয়; তাঁরা আটক থাকেন। ১১ জনের মধ্যে তিনজনকে কোর্ট মার্শালের জন্য বেছে রাখা হয়।

২৪এ মে কমিশনের বোম্বে তদন্ত শেষ হল। তিন সপ্তাহ ধরে ১৪৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। কমিশনে ছিলেন স্যার সৈয়দ ফজল আলি চেয়ারম্যান হিসেবে, বিচারপতি এম সি মহাজন, বিচারপতি কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার; মেঃ জেঃ টি ডবলিউ রীস ও ভাইস-এডমিরাল ডবলিউ আর প্যাটার্সন সদস্য হিসেবে।

বোম্বে তদন্ত শেষে ওঁরা এলেন করাচীতে। কম্যাণ্ডার সন্ত সিং গিল বললেন, 'মিউটিনি'র মূল কারণ রাজনৈতিক প্রচার এবং সেনাদলে ভারত-বিরোধী প্রবণতা, আই-এন-এ'র প্রকাশ্য বিচার, ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর স্ব স্ব স্বার্থে তার ভাষ্য লস্করদের আনুগত্য দিয়েছে শিথিল করে।

অনেকের শাস্তি হয়ে গেল। কম্যাণ্ডার কিং-এরও, কিন্তু এজন্য নয় যে, তিনি ভারতীয় লস্করদের উদ্দেশে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তাতে তিনি খালাস, তিনি লস্করদের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখতে পারেন নি এই দ্বিতীয় অভিযোগে তিরস্কার করে তাঁকে বরখাস্ত করার সুপারিশ হ'ল।

কমিশনের রিপোর্ট বেরোলো আগস্টের ৩০ তারিখে। ৫৯৯ পৃষ্ঠা টাইপ-করা। রিপোর্ট গেল---কার কাছে?—রণ-দপ্তরে। খুঁটিয়ে দেখবেন তাঁরাই। নৌ-সদরগুলো তাদের ভাষ্য দেবে। ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করবে। তারপর তা বিবেচনা করবেন —কে?—কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ (সর্বাধিনায়ক) এবং তিনি যিনি শিগগিরই যুদ্ধমন্ত্রী হবেন। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কমিটি তা খতিয়ে দেখবেন। সবাইকার ভাষ্য, টীকা, মন্তব্যসহ রিপোর্ট যাবে সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

ইতিহাসের পরিহাস, কেন্দ্রে ১৯৪৬এ ইণ্টারিম গবর্ণমেণ্ট—তাঁদের ঘোষণা—সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এ কার কণ্ঠস্বর?

বিষয়-সূচী